আকবর আলি খান

# অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি

রাজনৈতিক দিক থেকে জন্মলগ্নে বাংলাদেশ ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দুর্বার, উচ্ছল ও প্রাণবন্ত একটি দেশ। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিল একটি দারিদ্র্যপীড়িত ও সমস্যা-জর্জরিত রাষ্ট্র। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। অথচ আন্তর্জাতিক মানে দেশটিতে সুশাসনের প্রকট ঘাটতি রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমাপে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপন্ন। এই বইয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের বিশ্লেষণ এবং তা থেকে উত্তরণের পথ সন্ধান করা হয়েছে।

রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান দেওয়া এ বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। আর কোনো একটি গবেষণাকর্মে তা সম্ভবও নয়। মূলত রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু করার তাগিদই বইটি লেখার পেছনে কাজ করেছে। আর সে বিতর্ক যাতে যুক্তির পথে পরিচালিত হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা বা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এ বইয়ে। বইটির প্রধান আকর্ষণ হলো এর রচনাশৈলী। একটি নির্ভেজাল গবেষণাগ্রন্থ লিখিত হয়েছে অনেকটা রম্যরচনার ঢঙে। ফলে রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে যাঁদের তেমন মাথাব্যথা নেই, এমনকি তাঁরাও এ বই পড়ে আনন্দ লাভ করবেন।


আলোকচিত্র : সাহাদাত পারভেজ

## আকবর আলি খান

জন্ম ১৯৪৪ সালে। ইতিহাসে অনার্স ও এমএ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ও পিএইচডি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন : পাকিস্তানি জান্তা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থসচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক ছিলেন, উপদেষ্টা ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর দুটি পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ *পরার্থপরতার অর্থনীতি* এবং *আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি*। তাঁর *Discovery of Bangladesh* ও *Some Aspects of Peasant Behavior in Bengal* বই দুটি দেশে-বিদেশে প্রশংসিত। তাঁর আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বই *Gresham's Law Syndrome and Beyond* ও *Friendly Fires, Humpty Dumpty Disorder and Other Essays*। জীবনানন্দ বিষয়ে লিখেছেন *চাবিকাঠির খোঁজে*। তাঁর বাংলা রচনা সম্পর্কে কলকাতার *দেশ* পত্রিকার মন্তব্য, 'এই লেখক লিখতে জানেন।'

প্রচ্ছদ : **মাসুক হেলাল**

# অবাক বাংলাদেশ :
# বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি

আকবর আলি খান

# অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি



অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি
গ্রন্থস্বত্ব : ২০১৭ আকবর আলি খান
দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২৩, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মাসুক হেলাল
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

**মূল্য : ৭০০ টাকা**

Abak Bangladesh : Bichitro Chholonajale Rajniti
by Akbar Ali Khan
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 88-02-8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 700 only

ISBN 978 984 91766 4 0

উ ৎ স র্গ

আমার পরম স্নেহের একমাত্র সন্তান
নেহরীণ খানের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত

# সূচিপত্র

**চতুর্থ খণ্ড**

# সারণি

## লেখচিত্র

# ভূমিকা

উইনস্টন চার্চিলের ভাষায় বলতে গেলে বাংলাদেশ একটি রহস্যঘেরা প্রহেলিকাচ্ছন্ন হেঁয়ালি (a riddle wrapped in mystery inside an enigma)। একদিকে এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকট অপ্রতুলতা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে; অন্যদিকে সুশাসনে নিশ্চিত অবক্ষয় ঘটেছে। বাংলাদেশের অনেক অর্জনের জন্য আমি গর্বিত। তবু রাজনৈতিক অবক্ষয় ও সুশাসনের ক্রমাগত অধোগতি আমার প্রজন্মের যারা আমার মতো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের জন্য দৈহিক যন্ত্রণার চেয়েও মর্মান্তিক মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছে। এই গ্রন্থের জন্ম এই যন্ত্রণাবোধ থেকেই।

প্রখ্যাত বাঙালি ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস* গ্রন্থ রচনার যে কারণ দেখিয়েছিলেন তা এই বইয়ের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য : 'যত অধ্যয়ন বীক্ষণ, মনন, আলোচনা ও গবেষণাই এই গ্রন্থের পশ্চাতে থাকুক বা না থাকুক, জ্ঞানস্পৃহা আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত করে নাই। ...বিস্তৃত বাংলার কৃষকের কুটিরে, নদীর ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, বটের ছায়ায়, শহরের বুকে, নির্জন প্রান্তরে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চূড়ায় এই দেশের এবং মানুষের একটি রূপ আমি দেখিয়াছিলাম এবং তাহাকে ভালোবাসিয়াছিলাম..., এই ভালোবাসার প্রেরণাতেই আমি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।' অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় আনুষ্ঠানিকভাবে ইতিহাস শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমার আদৌ কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। তবু দেশের জন্য ভালোবাসাকে পুঁজি করে ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকারের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এই গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা শুরু করি।

প্রথমে ইচ্ছে ছিল ইংরেজি ভাষায় বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে একটি গবেষণাগ্রন্থ লিখব। পরে ভেবে দেখলাম ইংরেজিতে বই লিখে হয়তো কিছু পণ্ডিতের সাধুবাদ পেতে পারি কিন্তু তাতে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আমি চাই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করুক এবং

নিজেরাই সংস্কারের পথ বেছে নিক। তাই সাধারণ পাঠকদের জন্য বইটি বাংলায় লেখা হয়েছে। গবেষণামূলক গ্রন্থ পাঠে সাধারণ পাঠকেরা আগ্রহবোধ করেন না। তবুও গবেষণামূলক গ্রন্থ ছাড়া অন্য ধরনের বই লিখলে তাতে আমার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দই প্রাধান্য লাভ করবে। বইটি গবেষণার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে তবে গবেষণার ফলাফলকে সাধারণ মানুষের উপযোগী করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। গবেষণার বক্তব্য চটুল ভঙ্গিতে অনেক সময় রম্যরচনার শৈলীতে পেশ করেছি। গবেষণার সকল রীতি অনুসরণ করিনি। এই গ্রন্থ যেসব পূর্ববর্তী গবেষণার ওপর ভিত্তি করে রচিত, তার তালিকা এই বইয়ে নেই। এর ফলে আমি পূর্বসূরিদের কাছে আমার যেসব বক্তব্যের জন্য ঋণী তা স্বীকার করতে পারিনি, এ জন্য আমি দুঃখিত। পাদটীকা একেবারে বর্জন করার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা সম্ভব হয়নি। স্বল্পতম সংখ্যক পাদটীকায় সামান্য কিছু বই ও প্রবন্ধের উল্লেখ করেছি, যা উৎসাহী পাঠকদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

এই বই লেখার উদ্দেশ্য একটিই আর সেটি হলো বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি। চার্লস দ্যগল বলতেন, 'Politics is too serious a matter to be left to the politicians'। শুধু চাপার জোরে নয়, যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাই এই বইয়ে দুটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, রাজনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি সমস্যার সমাধান খোঁজা হয়েছে। তবে আমি মনে করি না যে এ বইয়ে আমি যেসমস্ত সমাধান উপস্থাপন করেছি তাই-ই সর্বোত্তম। গণ তর্ক-বিতর্কের আলোকে সমাধানগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। যদি এই বই পাঠকদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টিতে সফল হয়, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

এ বইয়ে পনেরোটি প্রবন্ধ রয়েছে। এসব বিষয় আমি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছি। বিষয়গুলো নিয়ে আগেও লিখেছি। পুরোনো লেখা ও বক্তব্যসমূহ কোথাও কোথাও ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সর্বত্র সাম্প্রতিকতম তথ্যসমূহ পেশ করার চেষ্টা করেছি।

আমি ২০০৮ থেকে শারীরিকভাবে অসমর্থ। এই বই আমার পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। প্রথমা প্রকাশন আমার অসুবিধা বিবেচনা করে এক বছর ধরে শ্রুতিলিখনের জন্য তাদের কম্পিউটার অপারেটর শহিদুল ইসলামকে আমাকে সহায়তা করার দায়িত্ব দেন। এর আগে সব বই আমি নিজের হাতে লিখেছি। জানি না শ্রুতিলিখনে রচনাশৈলীতে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না। আশা করি পাঠকদের কাছে এ নিবেদনও গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রথমা এর আগে আমার যেসব বই ছাপিয়েছে সেখানে আমি সর্বত্র *প্রথম আলোর* বানান রীতি অনুসরণ করিনি। শ্রুতিলিখনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিচ্যুতি

অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি সর্বত্র *প্রথম আলোর* বানান রীতি মেনে নিয়েছি। এ বইয়ের সব বক্তব্যের জন্য আমি দায়ী; তবে বানানের দায়িত্ব কিছুটা হলেও প্রকাশকের। প্রকাশনায় বিশেষ সহায়তার জন্য আমি *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্রথমার জাফর আহমদ রাশেদকে। শহিদুল ইসলাম ও প্রথমার অন্যান্য কর্মী স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ছাড়া এ বই এত সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাঁদেরও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই বইটি মূলত লেখা হয় ২০১৬ সালে। এ বছরটিতে আমার জীবনের সবচেয়ে বিয়োগান্ত ঘটনাসমূহ ঘটেছে। এ বছরে ৪ ডিসেম্বর আমার একমাত্র সন্তান নেহরীণ খান ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বই লেখায় ব্যস্ত থাকায় তাঁর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারিনি। এই বছরই আরও ইন্তেকাল করেন আমার ভগ্নিপতি এ কে এন আহমেদ, আমার চাচাতো ভাই আনোয়ার আলি খান ও তাঁর স্ত্রী জোহরা খান এবং চাচাতো বোন হেনা বুজি। এঁদের প্রত্যেকের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি পরম করুণাময়ের কাছে তাঁদের বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

আমার স্ত্রী হামীম খান দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। লেখালেখির বদ অভ্যাসের জন্য তাঁর যত্নও ঠিকমতো করতে পারিনি। তবু আমি নিশ্চিত এ বই প্রকাশিত হওয়াতে তিনি আনন্দিত হবেন। আমার শাশুড়ি মিসেস জাহানারা রহমানের বয়স এখন প্রায় ৯৫। তবু তিনি এ বয়সে আমার যে যত্ন নেন, তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকেও আমার শারীরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখছেন আমার স্ত্রীর বড় ভাই ডক্টর এহসানুর রহমান। এঁদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ঔদ্ধত্য আমার নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের কল্যাণ করবেন।

আমার বড় বোন নীলুফার আহমেদ ও আমার কনিষ্ঠ দুই ভাই জি এম জিয়াউদ্দিন খান ও কবীর উদ্দিন খান এবং তাঁদের স্ত্রী মাকসুদা ও আনোয়ারার সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও সমর্থনের ফলেই আমি এখনো কাজ করতে পারছি। এঁদের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে গবেষণার সুযোগ দিয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই কৃতজ্ঞতা। বিভিন্নভাবে সহায়তার জন্য আমি ফারহাতুল্লাহ পেরু, আহমেদ আলি, জিয়াউল আনসার ও মির্জা গোলাম হোসেনকে ধন্যবাদ জানাই।

**আকবর আলি খান**

ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৭

## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

*অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি* বইটি প্রকাশের পর তৃতীয় মুদ্রণ শেষ হয়েছে। বইটি সাদরে গ্রহণ করার জন্য পাঠকদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ (চতুর্থ মুদ্রণ) প্রকাশের সময় 'বাংলাদেশের সিভিল সমাজ : সুশীল না দুঃশীল?' শীর্ষক চৌদ্দ অধ্যায়ে বক্তব্যকে আরও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুশীল সমাজের প্রার্থীদের টেলিভিশনের মাধ্যমে নির্বাচনে অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সুশীল সমাজের উদ্যোগে যেসব সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোর আরও বিস্তারিত মূল্যায়ন করা হয়েছে।

আশা করি এ সংস্করণটি পাঠকের কাজে লাগবে।

**আকবর আলি খান**
ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৭

**প্রথম খণ্ড**

# অবাক বাংলাদেশ : রহস্যঘেরা প্রহেলিকাচ্ছন্ন হেঁয়ালি

অবাক পৃথিবী! অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।
হিসাবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত 'রক্ত খরচ' তাতে।
এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম
অবাক পৃথিবী। সেলাম, তোমাকে সেলাম।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

# ১

# প্রস্তাবনা : রহস্যঘেরা প্রহেলিকাচ্ছন্ন হেঁয়ালি

## ১.১ রহস্যঘেরা প্রহেলিকাচ্ছন্ন হেঁয়ালি

নাটকীয়ভাবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আবির্ভাব। আয়তনে পৃথিবীর ৯৫তম রাষ্ট্র—আয়তন ১,৪৩,৯৯৮ বর্গকিলোমিটার (বকি); নেপাল (১,৪৭,১৮৭ বকি) থেকে কিছুটা ছোট, তাজিকিস্তান (১,৪৩,৭০০ বকি) থেকে সামান্য বড়।[১] অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে এর স্থান অষ্টম (২০১০ সালে ১৬.৮৯ কোটি)—নাইজেরিয়ার (১৮.১ কোটি) থেকে কম, রাশিয়ার (১৪.২ কোটি) থেকে বেশি। বিশ্বের ২ শতাংশের সামান্য বেশি জনসংখ্যার বাস বাংলাদেশে। পৃথিবীর প্রতি ৫০ জন মানুষের মধ্যে কমপক্ষে একজন বাংলাদেশি। অথচ কয়েক দশক আগেও এর আবির্ভাবের কোনো আলামত দেখা যায়নি।

জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্থান অনন্য। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্ট্যানলি এ কোচানেকের (Stanley A. Kochanek) মতে, বাংলাদেশে একটি 'অসাধারণ সমরূপ' (extremely homogeneous) জনগোষ্ঠী রয়েছে।[২] ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় যেসব রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, সেসব দেশেও সাধারণত এত সমগোত্রীয় জনগোষ্ঠী দেখা যায় না। জাতিগতভাবে ৯৮.৭% বাংলাদেশি অভিন্ন। প্রায় ৯০% জনগোষ্ঠী একই ধর্মে বিশ্বাস করে। কমপক্ষে ৯৮% লোক বাংলায় কথা বলে। এসব বন্ধন সাধারণত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে। অথচ এই বাংলাদেশই আজকে পৃথিবীতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

বিশ্বব্যাংক প্রতিবছর প্রায় ২০০টি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পরিমাপ করে। 'Worldwide Governance Indicators' শীর্ষক এই বার্ষিক প্রকাশনার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল্যায়ন সম্ভব। সারণি ১.১-এ

১৯৯৬ থেকে ২০১৪ সময়কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল্যায়ন দেখা যাবে।[৩]

**সারণি-১.১**
**বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সহিংস সন্ত্রাসবাদ : তুলনামূলক সূচক, ১৯৯৬-২০১৪**

| বছর | বিশ্বে শতকরা হিসাবে নিচের দিক থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অবস্থান |
|---|---|
| ১৯৯৬ | ২৫% |
| ১৯৯৮ | ২৯.৩% |
| ২০০০ | ২৩.৬% |
| ২০০২ | ১৭.৮% |
| ২০০৩ | ১৭.৩% |
| ২০০৪ | ১০.১% |
| ২০০৫ | ৪.৩% |
| ২০০৬ | ৮.৭% |
| ২০০৭ | ৯.১% |
| ২০০৮ | ৯.৬% |
| ২০০৯ | ৯.০% |
| ২০১০ | ৯.৯% |
| ২০১১ | ৯.০% |
| ২০১২ | ৯.১২% |
| ২০১৩ | ৭.৬% |
| ২০১৪ | ১৮.০% |

উৎস : বিশ্বব্যাংক

সারণি-১ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি অস্থিতিশীল ছিল। এই ১৮ বছর সময়কালে বাংলাদেশ মাত্র একবার নিচের দিক থেকে ৩০ শতাংশ দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০০৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল নিচের দিক থেকে ৪.৩%। অর্থাৎ পৃথিবীর ৯৫ শতাংশ দেশ রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের চেয়ে স্থিতিশীল ছিল। ২০০৭ থেকে ২০১৪ সময়কালে বাংলাদেশের অবস্থান সব সময়ই বিশ্বের ৮০ শতাংশ দেশের নিচে ছিল। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল নিচের দিক থেকে ৭.৬%-এ। ২০১৪ সালে এ হার ১৮ শতাংশে উন্নীত হয়। বিশ্বব্যাংক রাজনৈতিক

স্থিতিশীলতার সূচক পরিমাপ করার জন্য গণ-আন্দোলন, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, গুপ্তহত্যা ও সামরিক অভ্যুত্থানের মতো সহিংস ঘটনার প্রকোপ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের উপলব্ধি ব্যবহার করে। তবে অনেকে একই ধরনের সূচক নির্মাণে ভিন্ন উপাদানও ব্যবহার করে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ফরেন পলিসি' শীর্ষক একটি প্রকাশনা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সম্পর্কে বার্ষিক তথ্য প্রকাশ করে। ১২টি উপাদানের ভিত্তিতে এ সূচক পরিমাপ করা হয়ে থাকে। উপাদানগুলো হচ্ছে[৪] (১) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, (২) শরণার্থীর সংখ্যা, (৩) গোত্রগত অসন্তোষ, (৪) মানুষের স্বদেশত্যাগ, (৫) অসম উন্নয়ন, (৬) দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অবনতি, (৭) রাষ্ট্রের বৈধতা, (৮) গণসেবা, (৯) মানবাধিকার, (১০) নিরাপত্তাব্যবস্থা, (১১) উপদলীয় কোন্দল ও (১২) বাইরের হস্তক্ষেপ। এই সূচকের ভিত্তিতে ১৭৮টি দেশের মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২০১৪ সালের মূল্যায়নে বাংলাদেশের স্থান নিচের দিক থেকে ২৯ (সারণি-১.২ দেখুন)। এই সূচক প্রথমে 'ব্যর্থ রাষ্ট্র সূচক' হিসেবে পরিচিত ছিল। তখন একে ঠুনকো (Fragile) রাষ্ট্রের সূচক বলা হয়ে থাকে।

এই সূচক অনুসারে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন ১৬.২% দেশের অন্তর্ভুক্ত। আর বিশ্বব্যাংকের সূচক অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিক থেকে ১৮ শতাংশের মধ্যে। অর্থাৎ দুটো সূচক অনুসারেই বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্ন ২০ শতাংশ দেশের মধ্যে রয়েছে। বস্তুত, সূচকভেদে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সহিংস পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। যেকোনো গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক সূচক ব্যবহার করা হোক না কেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সহিংস পরিস্থিতি অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

শুধু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সূচক অনুসারেই বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় নিচে নয়, অতীতের তুলনায় বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সংঘাতও বাড়ছে। বাংলাদেশে হরতালসংক্রান্ত সংখ্যাসমূহ বিশ্লেষণ করলেই এই উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে (সারণি-১.৩)। 'হরতাল' শব্দটির উৎপত্তি গুজরাটি ভাষায়। মধ্যযুগের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের মতে, সপ্তদশ শতাব্দীতে গুজরাটে শুল্ক কর্মকর্তাদের দুর্নীতির প্রতিবাদে ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ রাখতেন।[৫] এই পরিস্থিতিকে হিন্দি ভাষায় বলা হতো 'হাট-তাল' বা হাটে তালা দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এ অসহযোগই হরতাল নামে পরিচিত হয়। ক্রমে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হোক অথবা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী কর্তৃক আপামর জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া অসহযোগ আন্দোলন হোক—সবই হরতাল নামে পরিচিত হয়।

## সারণি-১.২
## ঠুনকো রাষ্ট্রের সূচক, ২০১৪

| সূচক অনুসারে (সর্বনিকৃষ্ট থেকে) অবস্থান | দেশের নাম |
|---|---|
| ১ | দক্ষিণ সুদান |
| ২ | সোমালিয়া |
| ৩ | কেন্দ্রীয় আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র |
| ৪ | কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) |
| ৫ | সুদান |
| ৬ | শাদ |
| ৭ | আফগানিস্তান |
| ৮ | ইয়েমেন |
| ৯ | হাইতি |
| ১০ | পাকিস্তান |
| ১১ | জিম্বাবুয়ে |
| ১২ | গিনি |
| ১৩ | ইরাক |
| ১৪ | কোত দ্য ভোয়া |
| ১৫ | সিরিয়া |
| ১৬ | গিনি-বিসাও |
| ১৭ | নাইজেরিয়া |
| ১৮ | কেনিয়া |
| ১৯ | নাইজার |
| ২০ | ইথিওপিয়া |
| ২১ | বুরুন্ডি |
| ২২ | উগান্ডা |
| ২৩ | ইরিত্রিয়া |
| ২৪ | মিয়ানমার |

## সারণি-১.৩
## বাংলাদেশে হরতাল, ১৯৪৭-২০১৫

| সময়কাল | মোট জাতীয় হরতাল | মোট স্থানীয় ও আঞ্চলিক হরতাল | মোট হরতাল | গড়ে বার্ষিক জাতীয় হরতাল | গড়ে বার্ষিক সব ধরনের হরতাল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৪৭-১৯৭১ | ৪৮ | ৪২ | ৯০ | ২ | ৩.৭৫ |
| ১৯৭২-৭৫ (আগস্ট) | ৫ | ১৭ | ২২ | ১.২৫ | ৪.৪ |
| ১৯৭৫ (সেপ্টেম্বর)-১৯৮২ (মার্চ) | ৬ | ৫৩ | ৫৯ | ০.৯২ | ৯.০৭ |
| ১৯৮২ (এপ্রিল)-১৯৯০ (ডিসেম্বর) | ৭২ | ২৫৬ | ৩২৮ | ৮.২২ | ৩৭.৪ |
| ১৯৯০ (ডিসেম্বর)-১৯৯৬ (মার্চ) | ৮১ | ৩৩৫ | ৪১৬ | ১৫.২৮ | ৭৮.৪৯ |
| ১৯৯৬ (মার্চ)-২০০১ (জুলাই) | ৫৯ | ২৭৫ | ৩৩ ৪ | ১১.১৩ | ৬৩.০১ |
| ২০০১ (সেপ্টেম্বর)-২০০৬ (অক্টোবর) | ৯১ | ২৩০ | ৩২১ | ১৮.২ | ৬৪.২ |
| ২০০৬ (অক্টোবর)-২০০৯ (ডিসেম্বর) | ০ | ১ | ১ | ০ | ০.২৯ |
| ২০০৯ (জানুয়ারি)-২০১৫ (নভেম্বর) | ২৪৩ | ৪১১ | ৬৫৪ | ৩৫.৫ | ৯৫.৭৬ |

উৎস : অজয় দাসগুপ্ত। সাত দশকের হরতাল ও বাংলাদেশের রাজনীতি (mimeo)। *সমকাল,* ঢাকা।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল সময়কালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় নিষ্পেষিত হয়েছে। এই শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধার ফলেই এ দেশে মুক্তিসংগ্রামের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম। অথচ জাতির ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অসন্তোষ সত্ত্বেও অর্থনৈতিক জীবন আজকের তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল ছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সময়কালে গড়ে প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে মাত্র দুটি হরতাল পালিত হয়। যদি আঞ্চলিক ও স্থানীয় হরতালসমূহ বিবেচনায় নেওয়া হয়, তবে গড়ে প্রতিবছর ৩.৭৫টি হরতাল পালিত হয়। প্রতিতুলনায় ২০১১-১৫ সময়কালে প্রতিবছর গড়ে ৩৫.৫ দিন জাতীয় পর্যায়ে হরতাল পালিত হয়; আঞ্চলিক ও স্থানীয় হরতালসমূহ যোগ দিলে গড়ে হরতাল সংঘটিত হয় ৯৫.৭৫ দিন। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের তুলনায় জাতীয় পর্যায়ে ২০০৯-১৫ সময়কালে হরতালের পরিমাণ বেড়েছে ১৭৭৫ শতাংশ বা

১৭.৭৫ গুণ; আঞ্চলিক, স্থানীয়সহ সব হরতালের পরিমাণ বেড়েছে ২৫৫৩ শতাংশ বা ২৫.৫৩ গুণ। বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান যুক্তি ছিল, ভিন্নরূপ জনগোষ্ঠীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হলে সমরূপ বাংলাদেশিরা বাংলাদেশে শান্তির নীড় গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। বাস্তবে ঘটল উল্টোটি। সহিংসতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তরতর করে বেড়ে গেল।

শুধু ব্যর্থতার ক্ষেত্রেই নয়, অর্জনের ক্ষেত্রেও দেখা দেয় অবাক কাণ্ড। যুদ্ধবিধ্বস্ত ও নেহাত অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে যখন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ আবির্ভূত হয়, তখন মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক কিসিঞ্জারের মতো অনেকেই বাংলাদেশকে 'ভিক্ষার ঝুড়ি' বলে নাক সিটকায়। এমনকি দুজন অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশকে উন্নয়নের অগ্নিপরীক্ষা (Test case of Development) নামে আখ্যা দেন।[৬] তাঁদের বক্তব্য ছিল যে বাংলাদেশের মতো দুর্দশাগ্রস্ত দেশে যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়, তবে পৃথিবীর যেকোনো দেশেরই উন্নয়ন সম্ভব। অর্থনীতিবিদদের হতাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে বাংলাদেশ। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো :

- নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত—জন্মলগ্নে বাংলাদেশ ছিল নিম্ন আয়ের দেশ। গত চার দশকের অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করেছে।
- মাথাপিছু আয়ের প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি—জনসংখ্যা হ্রাস এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে মাথাপিছু আয় প্রায় তিন গুণ বেড়েছে।
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাফল্য—১৯৭০ সালে বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হতো। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাদি জমি অনাবাদি কাজে ব্যবহারের কারণে ফসল উৎপাদনের জন্য জমির পরিমাণ কমে যাওয়া সত্ত্বেও ২০১৪ সালে মোট ৩.৪ কোটি টন খাদ্য উৎপাদিত হয়।
- দারিদ্র্যসীমার নিচে জনগোষ্ঠীর হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস—১৯৭০ সালে প্রায় ৭০% জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। আজ এ হার ২৫ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস—১৯৭০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পাকিস্তানের চেয়ে এক কোটি বেশি ছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হ্রাসে সাফল্যের ফলে বর্তমানে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা এক কোটি কম।
- মানব উন্নয়ন কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য—শিক্ষার হার বেড়েছে; শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। ১৯৭০ সালে গড় আয়ুর প্রত্যাশা ছিল ৪২। বর্তমানে এই হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭০ বছর।
- মানব উন্নয়ন সূচক অনুসারে সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে মধ্যম পর্যায়ে

উন্নীত—জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) মানব উন্নয়নের সূচক অনুসারে সব রাষ্ট্রের সাফল্য পরিমাপ করে থাকে। বাংলাদেশ এ মূল্যায়নে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে মধ্যম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রচলিত তত্ত্ব অনুসারে এমনটি ঘটার কথা নয়। গত চার দশকে বাংলাদেশে সুশাসনের ক্রম-অবনতি ঘটেছে। প্রচলিত মতবাদ অনুসারে যে দেশে সুশাসন নিশ্চিত করা যায় না, সেখানে টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়।

সুশাসন একটি বহুমাত্রিক বিষয়। ফলে শুধু একটি সূচকের ভিত্তিতে এর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাংক ছয়টি সূচকের ভিত্তিতে সব দেশের সুশাসন মূল্যায়ন করে। ১৯৯৬ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের সুশাসন নিয়ে বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়ন সারণি-১.৪-এ দেখা যাবে।

**সারণি-১.৪**

**বাংলাদেশে সুশাসনের মূল্যায়ন, ১৯৯৬-২০১৪**

| সূচক | ১৯৯৬ সালে সমীক্ষাকৃত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নিচের দিক থেকে শতকরা অবস্থান | ২০১৪ সালে সমীক্ষাকৃত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নিচের দিক থেকে শতকরা অবস্থান |
|---|---|---|
| বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা ও জবাবদিহি | ৪৭.৬ | ৩২.৮১ |
| রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি | ২৫.০ | ১৭.৯৬ |
| সরকারের কার্যকারিতা | ২৪.৪ | ২১.৬ |
| নিয়ন্ত্রণের মান | ১৬.২ | ১৮.৩ |
| আইনের শাসন | ১৮.৭ | ২৬.০ |
| দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ | ২৭.৩ | ১৮.৮ |

উৎস : বিশ্বব্যাংক। Governance Matters (2015)

সারণি-১.৪-এ দুটো বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯৯৬ থেকে ২০১৪ সময়কালে বাংলাদেশে চারটি সূচকের অবনতি ঘটেছে (বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি, সরকারের কার্যকারিতা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ)। উন্নতি ঘটেছে মাত্র দুটি সূচকে (নিয়ন্ত্রণের মান ও আইনের

শাসন)। সার্বিকভাবে সুশাসনের অবনতি ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৯৬ সালে বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা ও জবাবদিহি ছাড়া বাকি ৫টি সূচকের মান খুবই নিচু, সব ক্ষেত্রেই সমীক্ষাকৃত দেশগুলোর দুই-তৃতীয়াংশের নিচে। শুধু গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি নিচের দিক থেকে ১৯৯৬ সালে ৪৭.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। সুশাসনের অবনতি অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খায় না। ওপরের বিশ্লেষণ থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি সুশাসন সম্পর্কিত তত্ত্বের সঙ্গে মোটেও মেলে না। প্রচলিত বিশ্লেষণ অনুসারে সমরূপ জনগোষ্ঠীর জন্য জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টি হলে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমিত হয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তাপ অনেক বেড়েছে এবং বেড়েই চলেছে। প্রচলিত তত্ত্ব অনুসারে সুশাসনের অভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে সুশাসনের অবনতি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে রাজনীতি ও অর্থনীতি বিপরীত দিকে চলছে। রাজনীতি পেছনের দিকে ছুটছে আর অর্থনীতি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সমরনায়ক উইনস্টন চার্চিলের একটি উক্তি মনে পড়ে। যুদ্ধের শুরুতে সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা নিয়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালের পয়লা অক্টোবর তিনি বলেছিলেন, 'I cannot forecast to you the actions of Russia. It is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma, but perhaps there is a key. The key is Russian national interest.'

চার্চিলকে অনুকরণ করে বলতে গেলে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকেও 'রহস্যঘেরা প্রহলিকাচ্ছন্ন হেঁয়ালি'রূপে বর্ণনা করা যায়।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের রাজনীতির এই প্রহেলিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশের সমস্যা কি সাম্প্রতিক, না এর উৎস বাংলাদেশের ইতিহাসের গভীরে নিহিত। দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের ইতিহাস এবং এ প্রসঙ্গে প্রচলিত তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে এ সমস্যা আজকের নয়, দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে এসব সমস্যা দানা বেঁধেছে। যদিও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা সমস্যার উপলব্ধির জন্য সহায়ক, তবু এসব সমস্যার সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। সমাধান খুঁজতে হলে শুধু ইতিহাস বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রের লক্ষ্যসমূহের আলোকে প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবর্তন ও বিচ্যুতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে হবে। এর জন্য একটি প্রবন্ধ যথেষ্ট নয়, এর

জন্য প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ বই। প্রবন্ধের তৃতীয় খণ্ডে প্রস্তাবিত বইয়ের রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে।

## ১.২ অস্থিতিশীলতা ও সংঘাতের রাজনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে বাংলাদেশের ইতিহাসের সাম্প্রতিক প্রবণতা মনে হতে পারে। কিন্তু বাংলার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অস্থিতিশীলতার শিকড় ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। অনেকের কাছেই এ তথ্য বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে লালিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হবে। এর কারণ, বেশির ভাগ ঐতিহাসিক বাংলাদেশের ইতিহাসকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। এ ধারার সূচনা ঘটে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের হাতে। এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের আদৌ কোনো চর্চা হয়নি।

ব্রিটিশ শাসকেরাই প্রথম বাংলার নিয়মিত ইতিহাস রচনা করেন। ব্রিটিশ শাসকদের গর্ব ছিল যে তাঁরা ভারতে আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাস বড় বড় সাম্রাজ্যের ইতিহাস। তাই তাঁরা বাংলার ইতিহাসকে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসকে মৌর্য সাম্রাজ্য, কুষাণ সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, পাল সাম্রাজ্য, সুলতানি শাসন, মোগল সাম্রাজ্য ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অবিচ্ছেদ্য ইতিহাসরূপে গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এই তত্ত্বকে নতুন উপাদানের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেন।[৭] অথচ বাংলার ইতিহাসের সাম্রাজ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা সঠিক নয়। সাম্রাজ্য নয়, খণ্ডরাজ্য ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের নিয়তি।[৮] বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশের পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ কখনো কখনো আধিপত্য স্থাপন করে। কিন্তু কখনো এ শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বাংলাদেশের মধ্যে বারবার ছোট ছোট খণ্ডরাজ্য আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানগুলো সাক্ষ্য দেয়, যেসব এলাকা নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত, তার মাত্র কিছু কিছু এলাকা কোনো কোনো সময় দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর সাম্রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন-সার্বভৌম খণ্ডরাজ্য গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের ইতিহাসের সাম্রাজ্যভিত্তিক ও খণ্ডরাজ্যভিত্তিক ইতিহাসের তুলনামূলক চিত্র সারণি-১.৫-এ দেখা যাবে।

সারণি-১.৫ থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে বৃহৎ সাম্রাজ্য নয়, খণ্ডরাজ্যই হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসের বাস্তবতা। স্বল্পকালের জন্য বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চল বৃহৎ সাম্রাজ্যের অংশ হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রাচীনকালে রাজত্ব করেছে খড়্গ রাত, নাথ, দেব, চন্দ্র, বর্মণ, হরিকেল ও পট্টিকেরা রাজবংশের মতো খণ্ডরাজ্যগুলো। কিন্তু এসব খণ্ডরাজ্য ছিল বনফুলের মতো ক্ষণস্থায়ী।

## সারণি-১.৫
## বাংলাদেশের ইতিহাসে এককেন্দ্রিক সাম্রাজ্যভিত্তিক (Unitary-Imperial) ও খণ্ডিত-স্থানিক (Fragmentary-Local) ব্যাখ্যার তুলনামূলক চিত্র

| কাল | এককেন্দ্রিক-সাম্রাজ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ | খণ্ডিত-স্থানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ |
|---|---|---|
| খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ | পরাক্রমশালী গঙ্গাঋদ্ধি (গঙ্গারিদই) সাম্রাজ্যের উদ্ভব | গঙ্গাঋদ্ধির সুনির্দিষ্ট সীমানা অজ্ঞাত। সাধারণত ধারণা করা হয়, এটি গঙ্গা ও ভাগীরথীর পূর্বে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাঋদ্ধির পক্ষে খুব বড় একটি সাম্রাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। |
| খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫-২১ | মৌর্য সাম্রাজ্য। উত্তর বাংলায় মৌর্য দখলের স্পষ্ট প্রমাণ আছে; অন্য অঞ্চলে মৌর্য প্রভাবের পরোক্ষ প্রমাণ মেলে। | মৌর্য রাজনৈতিক আধিপত্য শুধু উত্তর বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল। |
| খ্রিষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দী | কুষানদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুমান করা যায় এ অঞ্চল হয়তো-বা কুষান অধিকৃত ছিল। | বাংলা যে কুষাণ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, তার প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নেই। |
| ৩৩০-৬৫০ খ্রি. | বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি অংশ। | উত্তর বাংলায় গুপ্ত আধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। কিন্তু পূর্ব বাংলা মাঝেমধ্যে কর দিত। এতৎসত্ত্বেও পশ্চিম বাংলায় (পুষ্কর) স্বাধীন রাজ্য ও কোটালিপাড়ার শিলালেখ অনুযায়ী ফরিদপুরে স্বাধীন রাজত্বের অস্তিত্ব ছিল (আনুমানিক ৫০০-৬০০ খ্রি.) |
| ৬০০-৬৫০ খ্রি. | শশাঙ্কের গৌড় সাম্রাজ্য | পূর্ব বাংলা গৌড় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল না; ভদ্র রাজবংশের অস্তিত্ব তা-ই প্রমাণ করে। |
| ৬৫০-৭৫০ খ্রি. | নৈরাজ্যের কাল | স্বাধীন খড়্গ রাজবংশ পূর্ব বাংলা শাসন করে (৬৫০-৭০০ খ্রি.)। |

| | | |
|---|---|---|
| ৭৫০-১১৬২ খ্রি. | বিশাল উত্তর ভারতীয় পাল সাম্রাজ্য প্রায় চার শ বছর রাজত্ব করে | পাল সাম্রাজ্য মূলত বিহার ও উত্তর বাংলার কিছু কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। ১০৪৩ থেকে ১০৭৫ খ্রি. পর্যন্ত স্বল্পকালীন অরাজক অবস্থা ছাড়া বাংলাদেশ অঞ্চল পাল সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত ছিল। প্রথম দিককার পাল শাসকদের সমস্ত শিলালেখই বিহার থেকে জারি করা হয়েছিল। তারা যেসব ভূমি দান করেছিল, সেগুলো অবস্থিত ছিল বিহার ও উত্তর বাংলার কোনো কোনো অংশে। শেষ পাল রাজা বাংলায় নয়, বরং বিহারে রাজত্ব করেছেন। এগুলো স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে পাল সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি ছিল বিহার। উপরন্তু নিম্নলিখিত সার্বভৌম রাজত্বসম্পর্কিত শিলালেখ বাংলাদেশ অঞ্চলের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রমাণ করে : ১. খড়গ রাজবংশ, ৬৫০-৭০০ খ্রি. ২. নাথ ও রাত রাজবংশ, ৭০০-৭৫০ খ্রি. ৩. দেব রাজবংশ, ৭৫০-৮০০ খ্রি. ৪. হরিকেল রাজবংশ, ৮০০-৯০০ খ্রি. ৫. চন্দ্র রাজবংশ, ৯০০-১০৪০ খ্রি. ৬. বর্মণ, ১০৮০-১১৫০ খ্রি. ৭. পট্টিকেরা রাজবংশ, ১০০০-১১০০ খ্রি. |
| ১১৬০-১২০৬ খ্রি. | সেনরা সারা বাংলায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে | সেন রাজত্ব বাংলাকে ঘিরে গড়ে ওঠে; এটি উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্য ছিল না। |
| ১২০৪-১৭৫৭ খ্রি. | বিভিন্ন রাজবংশের অধীন দিল্লিকেন্দ্রিক মুসলমান সাম্রাজ্য বাংলা অব্দি সম্প্রসারিত ছিল | প্রায় ৫৫০ বছরের মুসলমান শাসনের মধ্যে বাংলা ২২০ বছর কার্যকরভাবে দিল্লিভিত্তিক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক শাসিত হয়। প্রায় ৩৫০ বছর বাংলা কার্যত স্বাধীন থাকে। |

উৎস : খান, আকবর আলি। *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা* / ঢাকা, ১৯৯৬, ৮-১০।

খ্রিষ্টাব্দ ৫০০ থেকে ১০০০ সময়কালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে খণ্ডরাজ্যগুলোতে একটি রাজবংশ গড়ে মাত্র ৮০ বছর রাজত্ব করেছে। খ্রিষ্টাব্দ ১২০৬ থেকে ১৩৪১ সময়কালে বাংলাদেশে একজন সুলতান গড়ে ৫.৫ বছর ক্ষমতায় থেকেছেন। খ্রিষ্টাব্দ ১৩৪২ থেকে ১৫৭০ সময়কালে বাংলাদেশে একজন শাসকের গড় রাজত্বকাল ছিল মাত্র ৯ বছর।[৯]

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সঙ্গে নৈরাজ্যও বাংলাদেশে বারবার দেখা দিয়েছে। খালিমপুর তাম্রলিপিতে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মাৎস্যন্যায় বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতি হলো মাছের জগতের মতো অরাজক ও নৈরাজ্যপূর্ণ।

ষোড়শ শতাব্দীতেও দেখা যায় নৈরাজ্য, হাবশি ক্রীতদাসেরা রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে দেয়। এ দেশে উত্তরাধিকারের সুস্পষ্ট কোনো আইন ছিল না। ফলে যখন-তখন ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হতো। ষোড়শ শতাব্দীর সম্রাট বাবর বাংলাদেশের এই অরাজক পরিস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের একটি অনন্য প্রথা হলো, সার্বভৌম শাসকের ক্ষেত্রে এখানে অতি স্বল্প ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার অনুসরণ করা হয়। যে কেউ রাজাকে হত্যা করে নিজেকে রাজা ঘোষণা করলে আমিররা, সৈনিকেরা ও কৃষকেরা তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নেয়—তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে এবং পূর্ববর্তী রাজার মতোই তাঁর অধিকার মেনে নেয় এবং তাঁর হুকুম তামিল করে। বাংলার লোকেরা বলে, আমরা সিংহাসনের প্রতি অনুগত, যে সিংহাসন দখল করে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকি।'[১০] মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল বাংলাদেশকে 'বুলঘকখানা' বা অশান্ত আবাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সপ্তদশ শতকে শাহ্ নিয়ামত ফিরোজপুরী লিখেছেন :[১১]

Bengal is a ruined doleful land
Go offer the prayers to the dead, do not delay
Neither on land nor water is there rest
It is either the tiger's jaws or the crocodile's gullet.
বাংলা হচ্ছে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বেদনাকুল দেশ
কালবিলম্ব না করে, যাও, মৃতদের কাছে দোয়া চাও,
মাটিতে, পানিতে কোথাও শান্তি নেই, নেই স্বস্তি
আছে শুধু বাঘের থাবা আর কুমিরের হাঁ।

বাংলাদেশে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত বিদ্রোহ ঘটেছে। আবার স্থানীয় শাসকদেরও বারবার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ পর্যটক টম পিয়োরেস (Tom Piores) লিখেছেন, দূরপ্রাচ্যের লোকেরা বিশ্বাস করে বাঙালিরা বিশ্বাসঘাতক। সম্ভবত এই ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে মেকলের বাঙালির চরিত্র বিশ্লেষণে। তিনি লিখেছেন, 'What the horns are to the buffalo, what the sting is to the bee, what beauty according to the song is to woman, deceit is to the Bengalees.' (মোষের যেমন শিং আছে, মৌমাছির আছে হুল, সংগীতে যেমন মেয়েদের সৌন্দর্য, তেমনি বাঙালিদের বিশেষত্ব প্রতারণা।)[১২] এমনকি ব্রিটিশ শাসনামলে বাঙালিদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল ও দলাদলি অনেক বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে এখানে অবিশ্বাসের ঐতিহ্য লালিত হয়।

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা নতুন কিছু নয়। দীর্ঘদিন ধরে এখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ

করছে। কিন্তু এর কারণ ও সমাধান নিয়ে কোনো মতৈক্য দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে আটটি তত্ত্ব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

**১. 'মাৎস্যন্যায়' ও 'মহাসম্মত তত্ত্ব' :** প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেছে। তবু ভারতীয় দার্শনিকদের উদ্বেগের বিষয় ছিল নৈরাজ্য ও অরাজকতা। রামায়ণ ও মহাভারতে নৈরাজ্য সম্পর্কে গভীর শঙ্কা উচ্চারিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতে নৈরাজ্যকে 'মাৎস্যন্যায়' নামে অভিহিত করা হতো। মাৎস্যন্যায়ের শাব্দিক অর্থ হলো মাছের মতো অবস্থা। মাছের ভুবনে বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে। মাৎস্যন্যায়ের পরিস্থিতিতে সমাজে যারা শক্তিমান, তারা দুর্বলদের গ্রাস করে ও তাদের অধিকার হরণ করে। এ ধরনের পরিস্থিতি বিপজ্জনক। মাৎস্যন্যায়ের পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের উপায় হলো মহাসম্মত রাজ্যব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। মহাসম্মত তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রে।[১৩] বৌদ্ধদের বিশ্বাস, শাক্য বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা মহাসম্মত। তিনি রাষ্ট্রের সবার সম্মতি নিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন এবং সে জন্য তাঁকে মহাসম্মত বলে আখ্যা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে খালিমপুর তাম্রলিপিতে মাৎস্যন্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, গোপালের সিংহাসন গ্রহণ করার আগে বাংলাদেশে মাৎস্যন্যায়ের অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেশের প্রজারা গোপালকে রাজা নির্বাচন করেন এবং এই নির্বাচিত রাজবংশ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ শাসন করে। এই ধরনের মতবাদ আসামেও দেখা যায়। আসামের ইতিহাসেও একটি পাল বংশ রয়েছে, সেই পাল বংশও দাবি করে, তাদের প্রথম রাজা প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে। এ ধরনের রাজা নির্বাচনের খবর দাক্ষিণাত্য ও কাশ্মীর থেকেও পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজাদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে রাজারা তাঁদের কর্মচারীদের দ্বারা এ কথা প্রচার করবেন যে তাঁর রাজবংশের প্রথম পুরুষ প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদেরা মনে করতেন যে গণসমর্থন ছাড়া কোনো রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাই তাঁদের অভিমত ছিল যে মাৎস্যন্যায়কে প্রতিহত করতে হলে নির্বাচিত রাজার প্রয়োজন রয়েছে। সমাধান হিসেবে এটা গ্রহণযোগ্য হলেও এই তত্ত্ব কেন বারবার মাৎস্যন্যায়ের পরিস্থিতি দেখা দেয়, তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। কাজেই এই তথ্য থেকে যদিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নৈরাজ্যের একটি সমাধান দেখা যায়; কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

**২. ভৌগোলিক তত্ত্বসমূহ, বিশেষ করে সীমান্ত তত্ত্ব (Frontier Theory):** অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মানুষের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করেছে। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী। বিশ্বের তিনটি বড় নদীর মোহনায় অবস্থিত এই বদ্বীপ অত্যন্ত অস্থিতিশীল ভূখণ্ড। প্রতিনিয়ত নদীর এক পাড় ভাঙে, আরেক পাড় গড়ে। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন অস্থিতিশীল। তবে এই ধরনের অস্থিতিশীলতা বর্তমানের চেয়ে অতীতে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অতীতের তুলনায় রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে। তাই শুধু এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

তবে এই প্রসঙ্গে 'সীমান্ত তত্ত্ব' শীর্ষক একটি বিশেষ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা পরীক্ষা করা যেতে পারে। সীমান্ত তত্ত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ব্যাখ্যা হিসেবে প্রথম পেশ করা হয়। এটি পেশ করেন ঐতিহাসিক টার্নার।[১৪] তাঁর বক্তব্য ছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে বিশাল ভূখণ্ডে রেড ইন্ডিয়ান ছাড়া অন্য কোনো জনবসতি ছিল না। পরবর্তীকালে ইউরোপিয়ানরা সীমান্তবর্তী অঞ্চল দখল করে। কিন্তু তারপরও সীমান্তে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করে। মূলত যারা মূল সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারত না, তারাই এখানে আসত এবং তারা তাদের যে ঐতিহ্য ও চেতনা সেটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করত। সীমান্ত অঞ্চলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ লালিত হয়। টার্নারের মতে, সীমান্ত অঞ্চলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের প্রাণ। বাংলাদেশেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রয়েছে। তাই বাংলাদেশের মানুষেরও গণতন্ত্রের প্রতি তীব্র অনুরাগ দেখা যায় । কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই উপস্থিতি সত্ত্বেও যে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে, এ পরিস্থিতিরও কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

**৩. মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক (Patron-client relationship) :** ঐতিহাসিকদের মতে, কমপক্ষে রোমানদের সময় থেকে মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। অনেক সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক বিরাজ করেছে। তবে বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থায় মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক দুটি কারণে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। প্রথমত, হিন্দু জমিদারেরা ভূমির মুরব্বি ছিলেন অথচ মক্কেলরা ছিল মুসলমান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু জমিদারেরা মুরব্বির আসন হারান, অথচ মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের প্রভাবশালী গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, সম্ভবত প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য এ অঞ্চলের মানুষ সব ব্যাপারে কোনো বিশেষ ব্যক্তির কর্তৃত্ব মেনে নেয়নি। এ বিষয়ে

ষাটের দশকে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থা সম্পর্কে ডক্টর রহিমের গবেষণা স্মরণ করা যেতে পারে।[১৫] ডক্টর রহিমের গবেষণা থেকে দেখা যায়, পূর্ব বাংলার গ্রামের লোকেরা সব বিষয়ে এক মুরব্বির পরামর্শ শোনে না, তারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুরব্বির পরামর্শ গ্রহণ করে। এ ধরনের সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থা মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্ট্যানলি এ কোচানেক বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক নিয়ে একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন।[১৬] এ ধরনের সমাজে রাষ্ট্রনেতারা মুরব্বি হিসেবে বড় বড় মক্কেলদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মক্কেলদেরও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকেন। আবার বড় মক্কেলরা ছোট মক্কেলদের মুরব্বিতে পরিণত হন এবং তাঁরা তাঁদের মক্কেলদের সুযোগ-সুবিধা দেন, বিনিময়ে মক্কেলরা মুরব্বিদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এভাবে পারস্পরিক লেনদেনের ভিত্তিতে মুরব্বি-মক্কেলরা একটি রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলেন। তবে সম্পদের অপ্রতুলতা হেতু একাধিক মুরব্বি-মক্কেল গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে। এর ফলে দেখা দেয় রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য দুই ধরনের ব্যবস্থা জরুরি। প্রথমত, ক্ষমতার অপব্যবহার করে মক্কেলরা যাতে আইনবহির্ভূত সুযোগ-সুবিধা না পায়, সে লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগের ঐচ্ছিক ক্ষমতা হ্রাস করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মুরব্বি-মক্কেল তথ্যের কিছু দুর্বলতা রয়েছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি শুধু মক্কেলদের জন্য করা হয় না, মুরব্বিদের ব্যক্তিস্বার্থে অনেক দুর্নীতি হয়। এর ফলে মক্কেলরা এ ধরনের দুর্নীতি সব সময় পুরোপুরি সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত, মক্কেলরা তাদের মুরব্বিদের দীর্ঘদিন ক্ষমতায় রাখতে পারে না। বাংলাদেশের নির্বাচনে বারবার ক্ষমতাসীন দলের ভরাডুবি ঘটেছে।

**৪. সামাজিক পুঁজির ঘাটতি :** রবার্ট ডি পুটনাম সামাজিক পুঁজির নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন : 'Social capital refers to features of social organization such as trust, norms and networks that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated action.' (সামাজিক পুঁজি হচ্ছে পারস্পরিক আস্থার, প্রথাসিদ্ধ আচরণের ও সামাজিক সম্পর্কজালের মতো সামাজিক সংগঠনের বিশেষত্বসমূহ, যা সমন্বিত কার্যকলাপ সহজ করে সমাজের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়)।[১৭] পুটনাম তাঁর *Making Democracy Work:*

*Civic Traditions in Modern Italy* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, সামাজিক পুঁজির তারতম্যের ফলে ইতালির উত্তর ও দক্ষিণে ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কৃষ্টি ও সংগঠন গড়ে উঠেছে। যেখানে সামাজিক পুঁজি অপ্রতুল, সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিকড় গাঁথতে পারে না। বাংলাদেশের ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাখ্যার মূল বক্তব্য হলো, বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতিকাঠামোয় দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চল হচ্ছে ভিন্ন। পানির সহজপ্রাপ্যতা এবং বন্য আক্রমণের তীব্রতা কম হওয়ার ফলে এখানে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের প্রয়োজন কম। এর ফলে এখানে গ্রামসমূহ হচ্ছে উন্মুক্ত (Open Village)। এসব গ্রামের সংগঠনগুলো মূলত সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু এদের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা সীমিত। পক্ষান্তরে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে গ্রামগুলো ছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংঘবদ্ধ (Corporate), যাদের অনেক বেশি প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল। এর ফলে ঐতিহাসিকভাবে বাংলায় গ্রামীণ সংগঠনগুলো ছিল দুর্বল। তাই বাংলার ইতিহাসে এত রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।[১৮] এই তত্ত্বের সমালোচকেরা বলে থাকেন যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসেবে এ বক্তব্য সত্য ধরে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক পুঁজির কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে কি না। সামাজিক পুঁজি সম্পর্কে যেসব গবেষণা হয়েছে, তাতেও বাংলাদেশে সামাজিক পুঁজির অপ্রতুলতা প্রতর্কের সমর্থন মিলছে। ১৯৮০-এর দশকে অধ্যাপিকা ইউএবি রাজিয়া আক্তার বানু দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের পারস্পরিক আস্থা অত্যন্ত কম। তাঁর সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে মাত্র ৪.৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী একে অপরকে বিশ্বাস করে। শহরাঞ্চলে পারস্পরিক আস্থার হার ২.৫ শতাংশ। প্রতিতুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে ৩৭ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের ৪৪.৯ শতাংশ লোক একে অপরকে বিশ্বাস করে।

এ সম্পর্কে একটি নতুন সমীক্ষা খ্রিষ্টাব্দ ১৯৯৯-২০০১ সময়কালে পরিচালিত হয়। এ সমীক্ষার ফলাফল সারণি-১.৬-এ দেখা যাবে।

সারণি-১.৬ থেকে এ কথা স্পষ্ট, বিশ্বের ৮০টি দেশের গড় সামাজিক পুঁজির (২৭.৬) তুলনায় বাংলাদেশের সামাজিক পুঁজির (২৩.৫) পরিমাণ কম। গড়ে ভারত, চীন ও পাকিস্তানের মানুষ বাঙালিদের তুলনায় একে অন্যকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে। ফ্রান্স ছাড়া অন্যান্য উন্নত দেশে বাংলাদেশের তুলনায় সামাজিক পুঁজি অনেক বেশি। ফ্রান্স ও বাংলাদেশে সামাজিক পুঁজি প্রায় একই পর্যায়ে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ফ্রান্স ২০০ বছরের অধিক সময় ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভুগছে।

## সারণি-১.৬
## বিভিন্ন দেশে সামাজিক পুঁজির পরিমাণ
## (শতকরা কত ভাগ মানুষ অন্যদের বিশ্বাস করে)

| দেশ | % কত ভাগ লোক | দেশ | % কত ভাগ লোক |
|---|---|---|---|
| | অন্যদের বিশ্বাস করে | | অন্যদের বিশ্বাস করে |
| ডেনমার্ক | ৬৬.৫% | দক্ষিণ কোরিয়া | ২৭.৩% |
| ইরান | ৬৫.৩% | নাইজেরিয়া | ২৫.৬% |
| চীন | ৫৪.৫ | বাংলাদেশ | ২৩.৫% |
| ভিয়েতনাম | ৪১.৩% | ফ্রান্স | ২২.২% |
| ভারত | ৪১% | জার্মানি | ৩৪.৮% |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩৫.৮ | উগান্ডা | ০৭.৬% |
| পাকিস্তান | ৩০.৮% | সমীক্ষাকৃত দেশের গড় | ২৭.৬% |

উৎস : Jung Song You. 'Corruption and Inequality as correlates of Social Trust' (mimeo), 2005

সামাজিক পুঁজির ঘাটতি ইতিহাসের অমোঘ বিধান নয়। তবে সামাজিক পুঁজি গড়তে অনেক সময় লাগে। এ ক্ষেত্রে দুই ধরনের নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রথমত, যেখানে সামাজিক পুঁজির ঘাটতি রয়েছে, সেখানে তৃণমূল সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের বেসরকারি সংগঠনগুলোর উদ্যোগে তৃণমূল সংগঠন গড়ে ওঠার ফলে এখানে সামাজিক পুঁজি ক্রমেই বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, যেখানে সামাজিক পুঁজি গড়ে উঠছে, সেখানে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। এই ঘাটতি মেটানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি অত্যন্ত জরুরি।

**৬. বিপ্লবের প্রভাব :** নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের জন্ম হয়নি। একটি রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এর আত্মপ্রকাশ। বিপ্লব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুমড়েমুচড়ে ফেলে দেয় এবং নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এ নতুন কাঠামো সবার জন্য সমভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই নতুন ও পুরোনোর মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সমাজের মধ্যে টানাপোড়েন দেখা দেয়। কখনো বিপ্লবী চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, আবার কখনো প্রতিক্রিয়াশীল থারমিডরিয়ান (Thermidorian) পরিস্থিতি দেখা দেয়। এর ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা শুরু হয়। এখানে ফরাসি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৭৭৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা। তবে বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়ন বোনাপার্টের

রাজত্বকাল অন্তর্ভুক্ত করলে প্রথম ফরাসি বিপ্লবের অবসান হয় ১৮১৫ সালে। আবার বিপ্লবী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ১৮৩০ সালে। এর ১৮ বছর পর আবার বিপ্লব সংঘটিত হয় ১৮৪৮ সালে। এরপর ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সে প্রচণ্ড ছাত্রবিক্ষোভ দেখা দেয়। বিপ্লব ছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে ফরাসি দেশে বারবার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। বাংলাদেশি বিপ্লবও ছিল ফরাসি বিপ্লবের মতো রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক। এই যুদ্ধের বেদনাদায়ক স্মৃতি জাতির মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি করে। চার দশক ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে বিপরীতমুখী শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ চলছে। কখনো মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকেরা জয়যুক্ত হচ্ছেন; আবার কখনো বিরোধী শক্তিরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক সমর্থকেরা মনে করেন যে এই মৌল দ্বন্দ্ব নিরসন না হওয়া পর্যন্ত এ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চলবে। গত চার দশকের অভিজ্ঞতা এ অনুমানের অনেক বক্তব্য সমর্থন করে। তবু এ অনুমান বাংলাদেশের সব ধাঁধার উত্তর দিতে পারে না। বিশেষ করে যত দিন যাচ্ছে, ততই মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় স্মৃতি জনমানস থেকে হারিয়ে যাওয়ার কথা। পক্ষান্তরে যত দিন যাচ্ছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়ছে। বিপ্লবের প্রভাব বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের একমাত্র নিয়ামক নয়।

**৭. উপদলীয় কোন্দল ও বংশভিত্তিক রাজনীতি :** ঐতিহাসিক নীরদ সি চৌধুরী বাঙালিদের দলাদলির পরাকাষ্ঠারূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :[১৯]

> The Bengalis and more specially the Bengalis of Calcutta, were and still, some of the finest virtuoso of factiousness. There is hardly any branch of it which they do not practice and hardly any activity, into which it has not wormed its way. The latest consequence of this factiousness, now that political power has come into the hands of these clique-ridden creatures is going to be chronic political instability. The stasis of Plato and the asabiya of Ibn Khaldum were as milk and water compared with this distilled spirnt of factionusness' (1988, p. 401).

মধ্যযুগ থেকে বাংলার ইতিহাসে উপদলীয় কোন্দল ও দলাদলিভিত্তিক 'কাজিয়া'র উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে সাম্প্রতিক ইতিহাসে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির নিবিড়তা অনেক বেড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বংশভিত্তিক রাজনীতি। বংশভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেখা যেত। তবে সম্প্রতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। উত্তর কোরিয়া কিংবা সিরিয়ার মতো কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে বংশগত রাজনীতির প্রাধান্য দেখা যায়। তবে

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বংশগত রাজনীতি দেখা যাচ্ছে। *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার* একজন প্রতিবেদক ভারতের প্রাদেশিক পর্যায়ের রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, ভারতের মূল সমস্যা হচ্ছে, এটি বংশভিত্তিক গণতন্ত্র, এটি পরিচালনাও করে বংশসমূহ এবং এটি পরিচালিত হয় বিভিন্ন বংশের স্বার্থে। সব বড় রাজনৈতিক গোষ্ঠী সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। দাবি করা হয়, প্রতিষ্ঠাতাদের এই সম্মোহনী শক্তি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওপরই বর্তায়। এই বিশ্বাসই হচ্ছে বংশগত রাজনীতির মূল ভিত্তি। ম্যাক্সওয়েবার লিখেছেন যে এ ধরনের সমাজ শাশ্বত অতীতে বাস করে। কেননা, এদের জন্য বর্তমানের চেয়ে অতীত অনেক বড়। বাংলাদেশে দুটি প্রধান রাজনৈতিক বংশ রয়েছে। এদের প্রতিষ্ঠাতারা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের জন্য এরা বিভক্ত এবং সংঘর্ষে লিপ্ত। যত দিন বাংলাদেশে বংশগত রাজনীতির প্রাধান্য থাকবে, তত দিন অস্থিতিশীলতা হ্রাস করা সম্ভব হবে না।

**৮. কয়েদিদের উভয়সংকট (Prisoner's dilemma) :** অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংঘাতকে প্রতিপক্ষের ক্রীড়াতত্ত্বের (game theory) আলোকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের দুই বড় রাজনৈতিক দলের সংঘাত কয়েদিদের উভয়সংকট (Prisoner's dilemma) ক্রীড়ার সঙ্গে তুলনীয়। এই ক্রীড়ায় যুক্তভাবে দোষী দুই আসামিকে পুলিশ কয়েদে পাঠায়। কিন্তু পুলিশের কাছে তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। পুলিশ আসামিদের একে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে চারটি প্রস্তাব দেয় : (১) যদি তোমার সহ-আসামি দোষ কবুল করে আর তুমি কবুল না করো, তোমার পাঁচ বছরের জেল হবে আর তোমার সহ-আসামির তিন মাসের জেল হবে। (২) যদি তোমরা উভয়েই অপরাধ অস্বীকার করো, তোমাদের দুজনেরই এক বছরের জেল হবে। (৩) যদি তোমরা উভয়েই অপরাধ স্বীকার করো, তোমাদের দুজনেরই তিন বছরের কারাদণ্ড হবে। (৪) যদি তুমি অপরাধ স্বীকার করো আর তোমার সহ-অভিযুক্ত দোষ স্বীকার না করে, তবে তোমার তিন মাসের সাজা এবং সহ-অভিযুক্তের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হবে। এই দুই আসামিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়। কোনো সলাপরামর্শ ছাড়াই যদি তারা একে অপরের প্রতি আস্থাশীল হয়, তবে উভয়েই এক বছর করে জেল খেটে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু যদি আসামিরা একে অপরকে বিশ্বাস না করে, তাহলে উভয়েই অপরাধ কবুল করবে এবং উভয়েই তিন বছর জেল খাটবে। স্বল্প মেয়াদে দেখা যায় যে

এ ধরনের ক্রীড়ায় একে অপরকে অবিশ্বাস করে। ফলে উভয়েই অপরাধ কবুল করে যুক্তভাবে সর্বোচ্চ সাজা ভোগ করে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কয়েদিদের উভয়সংকটের সঙ্গে তুলনীয়। এখানে অবিশ্বাসের ফলে দুটো রাজনৈতিক দলই সংঘাতের জন্য অনেক বেশি মূল্য দিয়ে থাকে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় একই ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল। ১৯৮৪ সালে রবার্ট অ্যাক্সেলরড (Robert Axelrod) *The Evolution of Cooperation*[২০] নামের একটি বিখ্যাত গ্রন্থে এ ধরনের ক্ষেত্রে কীভাবে অবিশ্বাস কমিয়ে আনা যায়, সে সম্পর্কে কতকগুলো পরামর্শ দিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো বিবেচনার যোগ্য :

(১) যদি উভয় পক্ষ ঘন ঘন এবং নিরবচ্ছিন্ন খেলা চালাতে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের সহযোগিতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্স ও জার্মানির সেনারা যখন পরিখায় অবস্থান নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, প্রথমে তুমুল যুদ্ধ চলে। তারপর তারা আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। যদি কোনো পক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরিদর্শনে আসতেন, তবে তারা তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দিত। যখনই উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা চলে যেতেন, তখনই তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিত। কাজেই দীর্ঘদিন সংঘাত চলতে থাকলে আস্তে আস্তে তার তীব্রতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(২) যদি প্রতিযোগিতার পুরস্কারের আকর্ষণ কমানো হয়, তবে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী বিভাগের মেয়াদ হ্রাস ও ক্ষমতা হ্রাস দ্বন্দ্বের তীব্রতা হ্রাসে সহায়ক হতে পারে।

(৩) উভয় পক্ষকে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এ ধরনের পারস্পরিক শ্রদ্ধা দ্বন্দ্বের তীব্রতা হ্রাস করবে।

(৪) উভয় পক্ষের মধ্যে যত আদান-প্রদান বাড়বে, সংঘাতের তীব্রতা ততই কমে যাবে। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে কয়েদিদের উভয়সংকট হ্রাসের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। উভয় পক্ষের মধ্যেই দ্বন্দ্ব হ্রাসে কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

উপরিউক্ত সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বৈপরীত্য ও আপাতবিরোধী অবস্থান নতুন কিছু নয়, এ ধরনের বৈপরীত্য ও সংঘাত বাংলাদেশের ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। ভারতীয় সভ্যতার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এ ভূখণ্ডে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সব সময়ই প্রবল। সাধারণ মানুষের সম্মতি ছাড়া স্থিতিশীল রাষ্ট্রকাঠামো এখানে সম্ভব নয়। এখানে বারবার নেমে এসেছে মাৎস্যন্যায়ের বা অরাজকতার কালো ছায়া। এ অঞ্চলের সবচেয়ে স্থিতিশীল পাল সাম্রাজ্যের সূচনা হয় জনগণের নির্বাচিত শাসক দিয়ে। এখানে রাজা শুধু শাসক

নন, তিনি 'মহাসম্মত'। এখানে সামাজিক পুঁজির ঘাটতি রয়েছে। এখানে তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামীণ সংগঠন ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল। এখানে তাই ধ্রুপদি ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিপত্তি ছিল না; এখানে বেদবহির্ভূত তান্ত্রিক মতবাদ ও বহিরাগত ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। এখানে অনেক ক্ষেত্রে মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বংশভিত্তিক রাজনীতি। এখানে মুক্তিযুদ্ধে বৈপ্লবিক লড়াই সব প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করেছে। এখানে রাজনীতিতে চলছে 'কয়েদিদের উভয়সংকটের' মতো একটি মারাত্মক হার-জিতের খেলা। এসব সংকটের কোনো সহজ সমাধান নেই। উপরন্তু কোনো সমাজই সব বৈপরীত্যের সমাধান করতে পারে না। তবু নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ এই সংকট হ্রাসে সহায়ক হতে পারে :

- অতীতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে গণতন্ত্র কাজ করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটেও গণতান্ত্রিক সমাধানই সবচেয়ে কার্যকর হবে।
- বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সামাজিক পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহযোগিতা বাড়াতে হবে।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক যে মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা হ্রাস করতে হবে।
- বর্তমানে যে সংঘাতময় হার-জিতের খেলা চলছে, তার প্রশমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এসব ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় কিন্তু যথেষ্ট নয়। সব প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতে হবে, নতুন নীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়নের উপযোগী প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের সমস্যার কোনো একটি মাত্র চাবিকাঠি নেই। এর জন্য প্রয়োজন বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও অনেক পরস্পর নির্ভরশীল সমাধান। এ কাজ একটা প্রবন্ধের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি গ্রন্থের। প্রস্তাবিত গ্রন্থের রূপরেখা এ নিবন্ধের তৃতীয় অংশে উপস্থাপন করা হলো।

## ১.৩ গ্রন্থের রূপরেখা

প্রস্তাবিত বইটির শিরোনাম হলো 'অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি'। বাংলাদেশের রাজনীতির বাঁকে বাঁকে রয়েছে ব্যাপক বৈপরীত্য ও আপাতবিরোধী সত্য বা প্যারাডক্স। এর ফলে মনে হবে, হেঁয়ালির বিচিত্র ছলনাজালে আবদ্ধ হয়ে আছে বাংলাদেশের রাজনীতি। এই সব হেঁয়ালির কোনো সুনির্দিষ্ট চাবিকাঠি নেই। এ ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন

অনেক চাবিকাঠি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রহেলিকার চাবিকাঠিসমূহের অন্বেষণের জন্য এই রাজনীতির লক্ষ্য, প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংস্কৃতি, প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণ ছয়টি খণ্ডে ১৫টি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ডে গ্রন্থের প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। এই খণ্ডের 'অবাক বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনীতির রহস্যময় হেঁয়ালিসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবশেষে প্রস্তাবিত গ্রন্থের রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের রাজনীতির মূলনীতিসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপে বিবৃত হয়েছে: 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।' এই খণ্ডের বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হলো, রাষ্ট্রব্যবস্থায় এসব মূলনীতি প্রতিপালনের কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আর কী ব্যবস্থা নিতে হবে, তার বিশ্লেষণ। এই খণ্ডে চারটি অধ্যায় রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের শক্তি ও সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। এই অধ্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর এ ক্ষেত্রে যেসব নতুন চ্যালেঞ্জ উদ্ভূত হয়েছে, সে সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয় হলো গণতন্ত্র। এ অধ্যায়ে গণতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শক্তি ও দুর্বলতাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই খণ্ডে রয়েছে পাঁচটি অধ্যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে নির্বাহী বিভাগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'বঙ্গভবনে বাঁটকু' শীর্ষক অধ্যায়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হ্রাস এবং প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠনিক ক্ষমতাবৃদ্ধির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরন্তু নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের উপজীব্য হলো জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদের ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাবও এখানে আলোচিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থার মৌলিক

সমস্যাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে দশম অধ্যায়ে। এই প্রসঙ্গে শাসন ব্যবস্থাকে একাধিক স্তরে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাবাবলিও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডে আলোচনার বিষয় নির্বাচন। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের দুটো সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, সংবিধানে নির্ধারিত পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে সরকার কতটুকু প্রতিনিধিত্বশীল। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই দেশ পরিচালনা করে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত সরকার। একবার নির্বাচিত হলে সরকার পূর্ণ মেয়াদে দেশ পরিচালনা করে। জনমত যাচাই না করেই এ ধরনের সরকার সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। কাজেই নির্বাচনের সঙ্গে সরকার গঠন ও পরিচালনার সম্পর্ক বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। তাই একাদশ খণ্ডে সরকার নির্বাচনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দেশে অবাধ, সুষ্ঠু, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। এ ধরনের নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচনকালে বিশেষ সরকারের দাবি উত্থাপিত হয়েছে। উপরন্তু সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের আমূল সংস্কারের দাবি রয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে নির্বাচন পরিচালনার সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির দুটি প্রধান ধারক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে একটি প্রাণবন্ত সিভিল সমাজ রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে চতুর্দশ অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ খণ্ডের আলোচনার বিষয় হলো, এই বইয়ে বর্ণিত সমস্যাগুলো বাংলাদেশকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা এবং চিহ্নিত সমস্যাগুলো থেকে মুক্তির পথ সন্ধান। এ প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবায়নের বিভিন্ন সম্ভাব্য কৌশল সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই আলোচনায় যেসব সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছে, তা সবই হয়তো বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যার আরও ভালো ও সহজ সমাধান সম্ভব হতে পারে। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সমস্যাগুলোর চূড়ান্ত সমাধান নির্দেশ করা নয়, সমাধানগুলো নিয়ে বিতর্ক শুরু হলেই এ গ্রন্থের লক্ষ্য অর্জিত হবে।

## পাদটীকা

১. CIA 2016. *The World Factbook.* তবে Wikipedia-এর মতে ভৌগোলিক আয়তনে বাংলাদেশের অবস্থান ৯২।
২. Stanley A. Kochanek. 1996. *Patron Client Politics and Business in Bangladesh,* Dhaka: University Press Ltd. পৃষ্ঠা-১৭
৩. World Bank, 2016 *Worldwide Governance Indicators* htt//www.govindicatorsa.org
৪. The Fund for Peace and Foreign Policy. 2016. *Fragile State Index.* http//fsi.fundforpeace.org.
৫. Irfan Habib. 1995. *Essays in Indian History.* New Delhi: Tulika
৬. Just Faaland and Jack R. Parkinson. 1997. *Bangladesh the Test case of Development.* Dhaka: University Press Ltd.
৭. R. C. Majumdar. 1943. *History of Bengal.* Dhaka: Dhaka University Press.
৮. A. M. Chowdhury. 1967. *Dynastic History of Bengal.* Dhaka: The Asiatic Society of Pakistan
৯. Akbar Ali Khan. 1996. *Discovery of Bangladesh.* Dhaka: University Press Ltd. 75
১০. উদ্ধৃত : Muhammad Abdur Rahim. 1963. *Social and Cultural History of Bangal. Vol. 1* Karachi: Karachi University Press. 188
১১. উদ্ধৃত : Richard M. Eaton. 1994. *The Rise of Islam and Bengal Frontier,* 1201-1710. Delhi: Oxford University Press. ১৬৯
১২. উদ্ধৃত : Nirad C. Chaudhuri. 1987. *Thy Hand! Great Anarch.* Reading, Mass: Addison, Wesley Publishing Company, ১৮২
১৩. A.L. Basham. 1954. *The Wonder that Was India,* New York: Grove Press Inc, 82
১৪. F. J. Turner. 1953. *The Forntier in American History.* New York: Henry Holt and Company.
১৫. S. A. Rahim. 1965. *Communication and Personal Influences in East Pakistan Village.* Comilla: PARD.
১৬. Stanley A. Kochanek. 1996. *প্রাগুক্ত* ৩৮২
১৭. Robert D. Putnam. 1982. *Making Democrasy Work.* Princeton: Princeton University Press.
১৮. Akbar Ali Khan. 1996. *প্রাগুক্ত* ৫৩-৬১
১৯. N. C. Chaudhuri. 1987. *প্রাগুক্ত,* ৪০১
২০. Robert Axelrod. 1984. *The Evolution of Coperation.* New York: Basic Book

# দ্বিতীয় খণ্ড

# রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ : পথের শেষ কোথায়?

The Philosophers have only interpreted the world, in various ways.
The point, however, is to change it.

—Karl Marx
(Words inscribed on Marx's grave)

Failure and disillusionment are realities, but ideologies are dreams.
And dreams, it would seem, do not fade easily.

—Miyuki Miyabe

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কি আছে শেষে।
এত সাধনা! এত কামনা কোথায় মেশে?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# ২

# জাতীয়তাবাদ : জয় বাংলা ও বাংলার জয়

## ২.১ প্রস্তাবনা : অবশ্যম্ভাবী না কাকতালীয়?

একজন অতি আকর্ষণীয় মহিলার ছলাকলা, কতিপয় মুসলিম আমলার কূটচাল ও অতিথিবৎসলদের দেশে এক রাজনৈতিক নেতার হাড়কিপটেমি—এ ধরনের কতিপয় কাকতালীয় দুর্ঘটনার ফলে পাকিস্তানের জন্ম। ১৯৬১ সালে মওলানা আবুল কালাম আজাদের (১৮৮৮-১৯৫৮) *India Wins Freedom* শীর্ষক আত্মজীবনী পড়ে আমার কাছে তা-ই মনে হয়েছিল।[১] অথচ তখন পাকিস্তানিরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো বিচক্ষণ নেতার আবির্ভাবের ফলেই পাকিস্তানের পয়দা সম্ভব হয়েছিল।

প্রথমে মওলানা আজাদের ব্যাখ্যা নিয়ে শুরু করি। মওলানা সাহেব মনে করতেন, জিন্নাহর মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ দাবি ছিল পাকিস্তান নামের একটি সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব জানতেন যে পাকিস্তান ধারণাটি ছিল অবাস্তব। তাই জিন্নাহ ও তাঁর চেলারা স্বাধীন রাষ্ট্র সম্ভব না হলে সম্মানজনক আপসের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এর প্রমাণ হলো, ১৯৪৬ সালেও মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৬ সালে ঘোষিত ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তাব করা হয় যে ব্রিটিশ সরকার অবিভক্ত ভারতকে স্বাধীনতা দেবে, তবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনটি শাসনতান্ত্রিক অঞ্চল (group) সৃষ্টি করা হবে।[২] একটি অঞ্চলে থাকবে বর্তমান পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহ। দ্বিতীয় অঞ্চলে থাকবে তৎকালীন বাংলা ও আসাম প্রদেশ। এই দুই অঞ্চল ছাড়া ভারতের সব অঞ্চল তৃতীয় গ্রুপের আওতাধীন হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক ও যোগাযোগ, মানবাধিকার, মুদ্রাব্যবস্থা, বহিঃশুল্ক ও পরিকল্পনা। বাকি সব দায়িত্ব থাকবে

প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক সরকারের হাতে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রদেশগুলো আঞ্চলিক সরকারের দায়িত্ব নির্ধারণ করবে। এই ব্যবস্থা নিয়ে ১০ বছর দেশ চলবে। তবে যদি কোনো গ্রুপ এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে সে গ্রুপের স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার থাকবে। প্রতি ১০ বছর অন্তর প্রদেশগুলোর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষার অধিকার থাকবে। মুসলিম লীগ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ প্রস্তাব মেনে নেয়। কংগ্রেসও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু নতুন কংগ্রেস সভাপতি নেহরু দাবি করেন যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে সংসদ গঠিত হবে, তারাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এবং তাদের জন্য মন্ত্রিসভা মিশনের সূত্র বাধ্যতামূলক নয়। এর ফলে মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ভারতকে অভিন্ন রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। *India Wins Freedom* বইয়ে তিনি এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন।

মওলানা আজাদের বিশ্বাস যে কংগ্রেসের সম্মতি ছাড়া ভারত বিভাগ সম্ভব ছিল না। কংগ্রেসের সম্মতি মানে মহাত্মা গান্ধীর অনাপত্তি। মহাত্মা গান্ধীর সম্মতির জন্য তাঁর অতি কাছের দুজন নেতার সমর্থন ছিল অত্যাবশ্যক। একজন হলেন জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪); অন্যজন বল্লভভাই প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০)।

মওলানার বিশ্বাস, জওহরলাল ভারত বিভাগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> Jawaharlal was not at first ready for the idea and reacted violently against the idea of partition. Lord Mountbatten persisted till Jawaharlal's opposition was worn down step by step. Within a month of Lord Mountbatten's arrival in India, Jawaharlal, the firm opponent of partition had become, if not a supporter, at least acquiescent to the idea.[৩]

মওলানার কাছে জওহরলালের এই পরিবর্তন বিস্ময়কর মনে হয়। তিনি তাই লিখেছেন :

> I have often wondered how Jawaharlal was won over by Lord Mountbatten. He is a man of principle, but he is also impulsive and very amenable to personal influences. I think one factor responsible for the change was the personality of Lady Mountbatten. She is not only extremely intelligent but has a most attractive and friendly temperament. She admired her husband greatly and in many cases tried to interpret his thoughts to those who would not at first agree with him.[৪]

লেডি মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিত্বের মায়াবী সংস্পর্শে নেহরুর ভারত বিভাগের মতো একটি মৌল ধারণা বদলে গেছে, এ ধরনের মন্তব্য মওলানার পক্ষে অত্যন্ত সাহসী বক্তব্য ছিল। যখন এ বই প্রকাশিত হয়, তখন নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'বন্ধু ও সহযোদ্ধা জওহরলাল নেহরুকে'। বইটির সম্পাদক হুমায়ুন কবির লিখেছেন, মওলানা বিশ্বাস করতেন যে নেহরুর এত গুণাবলি রয়েছে ও ভারতের সেবায় তিনি এত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে তাঁর স্বল্পসংখ্যক দুর্বলতা তাঁর জীবদ্দশাতে আলোচনা না করাই বিধেয়।[৫] তবু সত্যের খাতিরে তিনি নেহরুর জীবনের এ অপ্রিয় সত্যটি এড়িয়ে যাননি। এডউইনা-নেহরুর রোমান্টিক সম্পর্ক শুধু হলুদ সাংবাদিকতার বিষয় নয়; মওলানার বদৌলতে তা এখন একাডেমিক গবেষণার বিষয়।

এডউইনা (১৯০১-৬০) এক বনেদি লর্ড পরিবারের কন্যা। পিতা ছিলেন রক্ষণশীল দলের এমপি। তাঁর মা ছিলেন ইহুদি পরিবারের মেয়ে। তাঁর খ্রিষ্টান নানার প্রেমে পড়েন তাঁর ইহুদি নানি এবং তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নানি অল্প বয়সে মারা যান এবং এডউইনার জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মাও গতায়ু হন। তিনি নানার কাছে বড় হন এবং তাঁর যখন ২০ বছর বয়স, তখন তাঁর নানা তাঁকে তাঁর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে মারা যান। এডউইনা ইংল্যান্ডের একজন ধনী ও সুন্দরী বিবাহযোগ্যা কুমারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। নানার কাছ থেকে তিনি ২০ লাখ পাউন্ড (যা বর্তমান বাজার দামে ৭.৯২ কোটি পাউন্ড) ও লন্ডনের অভিজাত অঞ্চলে প্রাসাদোপম বাসস্থান উত্তরাধিকার সূত্রে পান।

মাউন্টব্যাটেনের পিতৃকুল ছিল জার্মান রাজবংশ আর তাঁর মা ছিলেন মহারানি ভিক্টোরিয়ার নাতনি। রাজপরিবারের এই সন্তান তখন রাজকীয় নৌবাহিনীতে একজন কনিষ্ঠ অফিসার; বেতন বছরে ৬১০ পাউন্ড (আজকের বাজারমূল্যে ২০ হাজার পাউন্ড)। সুদর্শন ও সপ্রতিভ রাজপুত্র মাউন্টব্যাটেন ধনবতী ও সুন্দরী কুমারী মেয়ে এডউইনার প্রেমে পড়েন। ১৯২২ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁদের সম্পর্কে চিড় ধরে। অনেকে মনে করেন যে মাউন্টব্যাটেনের সমকামী প্রবণতা ছিল। আর এডউইনার সমস্যা ছিল যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা। বিয়ে তাঁদের ভাঙেনি, বাইরে একে অপরকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। তবে ভেতরে তাঁরা নিজেদের মর্জিমাফিক জীবন যাপন করেছেন। ১৯৪৬ সালে মাউন্টব্যাটেন যখন সিঙ্গাপুরে মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, তখন এই রূপকথার দম্পতির সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিবিদ নেহরুর পরিচয়। নেহরুর জীবনীকারের মতে, প্রথম দর্শনেই নেহরু ও এডউইনার প্রেমের সূত্রপাত।

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটেনে নবনির্বাচিত শ্রমিকদলের সরকার ভারত থেকে যত শিগগির সম্ভব ব্রিটিশ শাসন নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রত্যাহারের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় হিসেবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে নিয়োগ দেয়। তাঁর দায়িত্ব ছিল যত শিগগির সম্ভব ভারতের স্বাধীনতা প্রদান (যার সর্বশেষ সময়সীমা ছিল ১৯৪৮ সাল)। মাউন্টব্যাটেন এ সিদ্ধান্তে পৌছান যে ভারত বিভক্তি ছাড়া শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের আর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু ভারত বিভাগের প্রধান অন্তরায় হলো কংগ্রেসের বিরোধিতা। গান্ধীর সমর্থন ছাড়া এ বিরোধিতার অপসারণ সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে, নেহরুর মত পরিবর্তন না করতে পারলে গান্ধীর সমর্থন পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। কাজেই নেহরুর সমর্থন ছাড়া মাউন্টব্যাটেনের ভারতে সাফল্য লাভ কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের সূত্র গ্রহণ করার পরও যে নেহরু ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ভবিষ্যতে ভারত বিভাগের সম্ভাবনা থাকায় তাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁকে সরাসরি ভারত বিভক্তিতে কে ও কীভাবে রাজি করায়? এই আপাত-অসম্ভবকে সম্ভব করেন অঘটনঘটনপটীয়সী এডউইনা; এ প্রশ্ন নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। অবশ্য কীভাবে তিনি সেটা করেছিলেন, তা নিয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। ২০১২ সালে ৮৩ বছর বয়সে এডউইনার কনিষ্ঠ কন্যা পামেলা তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন।[৬] তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে তাঁর মায়ের সঙ্গে জওহরলালের গভীর প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল ও তাঁর বাবাসহ সবাই এ সম্পর্কে জানতেন। তবে এ প্রেম দেহজ ছিল না; এ প্রেম ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক। তাঁর মতে, ভাইসরয়ের স্ত্রীর পক্ষে পরপুরুষের সঙ্গে দেহজ সম্পর্ক সম্ভব ছিল না। কিন্তু সবাই এ মতের সঙ্গে একমত নন। স্ট্যানলি ওয়ালপার্টের নেহরু-জীবনী পড়লে মনে হয় যে এ প্রেম ইন্দ্রিয়জ ছিল।[৭] এ মতবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান পাকিস্তানি নৃতত্ত্ববিদ আকবর এস আহমেদ। তিনি এডউইনা ও নেহরুর দৈহিক সম্পর্কের বিভিন্ন প্রমাণ উল্লেখ করেন।[৮] তিনি দাবি করেন যে এডউইনা ভারত বিভক্তি ও কাশ্মীর প্রসঙ্গে নেহরুর বক্তব্য গ্রহণ করতে মাউন্টব্যাটেনকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর মতে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নেহরু-এডউইনার কয়েকটি প্রেমপত্র দেখানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি নাকি এ সম্পর্কে রাজনীতি করতে রাজি হননি।[৯] অধ্যাপক আহমেদ দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে এডউইনা ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ প্রশাসনকে প্রভাবান্বিত করেছেন। কিন্তু ভারত বিভাগ প্রশ্নে নেহরুর মত পরিবর্তন করে পাকিস্তানের যে উপকার তিনি করেছেন, তা বেমালুম চেপে গেছেন। ভারতের রাজনীতিতে মাউন্টব্যাটেন ও এডউইনার অংশগ্রহণ ছিল আকস্মিক দুর্ঘটনা। প্রশ্ন হলো, নেহরুর মত পরিবর্তনে এডউইনার সাফল্য ছাড়া কি ভারত বিভাগ সম্ভব ছিল?

নেহরুর মতো ভারত বিভাগের সময় কংগ্রেসের আরেক শক্তিমান নেতা ছিলেন সরদার বল্লভভাই প্যাটেল। নেহরু রাজি হলেও প্যাটেল রাজি না হলে কংগ্রেসের পক্ষে ভারত বিভাগ মেনে নেওয়া সম্ভব হতো না। নেহরুর মতো প্যাটেলও ছিলেন ভারত বিভাগের ঘোরতর বিরোধী। অথচ কংগ্রেসের মধ্যে তিনিই ভারত বিভাগের বড় সমর্থক হয়ে দাঁড়ান। এর জন্য অন্য কেউ দায়ী নন, দায়িত্বটা তাঁর নিজের। তিনি মুসলিম লীগকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। যখন ভারতে সব বড় দলের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলো কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ভাগ করা হবে। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাবে মুসলিম লীগ। কিন্তু মুসলিম লীগ প্রথম পর্যায়ে মন্ত্রিসভায় যোগ না দেওয়াতে বল্লভভাই প্যাটেলকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে লীগ মন্ত্রিসভায় যোগ দেয় এবং পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে দাবি করে যে তাদের নেতা লিয়াকত আলী খানকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হোক। প্যাটেল ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেছেন। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছাড়তে অস্বীকৃতি জানান। তিনি কংগ্রেস নেতাদের বোঝান যে মুসলিম লীগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা অতি জরুরি। কাজেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়া যাবে না। মুসলিম লীগকে দেওয়া হোক অর্থ মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় চালানোর জন্য যে এলেমের প্রয়োজন, তা মুসলিম লীগ মনোনীত কোনো মন্ত্রীর পেটেই নেই। এ মন্ত্রণালয় চালাবেন বিশেষজ্ঞ আমলারা। এতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে, কিন্তু তিনি আদৌ কার্যকর হবেন না। লিয়াকত আলীর কাছে যখন এ প্রস্তাব আসে, তখন তিনি এটি প্রত্যাখ্যানের জন্য জিন্নাহর কাছে আবেদন করেন। ইতিমধ্যে এ বার্তা দিল্লির আমলাদের মধ্যে চাউর হয়ে যায়। প্যাটেল জানতেন না যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বিভাগে দুজন সুদক্ষ মুসলিম কর্মকর্তা ছিলেন। একজনের নাম গোলাম মোহাম্মদ, যিনি পরে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ও গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন। আরেকজন হলেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, যিনি পাকিস্তানের প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল ও পরে প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁরা জিন্নাহর মাধ্যমে লিয়াকত আলীকে বোঝাতে সক্ষম হন যে তাঁদের সমর্থন নিয়ে তাঁর পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা মোটেও শক্ত হবে না। উপরন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলে তাঁদের পক্ষে কংগ্রেসের সব রাজনৈতিক উদ্যোগ আটকে দেওয়া সম্ভব হবে। লিয়াকত আলী অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিলেন। বাজেটে ব্যবসায়ের ওপর কর বাড়ালেন। উচ্চবিত্তের হিন্দুরা ফাঁপরে পড়ল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রায়

সব নতুন ব্যয়ের প্রস্তাব নাকচ করা হলো। এবার প্যাটেল নিজেই ঝামেলায় পড়লেন। এ প্রসঙ্গে মওলানা লিখেছেন :

> The Sardar's was the responsibility for giving finance to the Muslim League. He, therefore, resented his helplessness before Liaqat Ali more than anybody else. When Lord Mountbatten suggested that partition might offer a solution to the present difficulty he found ready acceptance to the idea in Sardar Patel's mind. In fact, Sardar Patel was fifty per cent in favor of partition even before Lord Mountbatten appeared on the scene. He was convinced that he could not work with the Muslim League. He openly said that he was prepared to have a part of India if only he could get rid of the Muslim League. It would not be perhaps be unfair to say that Vallabhbhai Patel was the founder of Indian partition.'[১০]

দেশ বিভাগের প্রস্তাব নেহরু আর প্যাটেলের সমর্থনলাভের পর এ প্রস্তাব গান্ধীর মৌন সম্মতি লাভ করে। দেশ বিভাগ ঠেকানোর সর্বশেষ উপায় ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অদ্ভুত সীমানা নির্ধারণ করা। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস আবদুল জব্বার খানের (১৮৮৩-১৯৫৮, যিনি ডক্টর খান সাহেব নামে সমধিক পরিচিত) নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জয়লাভ করে। সিদ্ধান্ত হয় যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না, সে সম্পর্কে গণভোট হবে। মওলানার বর্ণনা অনুসারে, ডক্টর খান সাহেব ও তাঁর ভাই খান আবদুল গফফার খান খুবই কৃপণ ছিলেন। এমনকি নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস থেকে যে অর্থ পাঠানো হয়, সে টাকা পর্যন্ত তাঁরা খরচ করেননি। তাঁদের ব্যক্তিগত কার্পণ্য অতিথিবৎসল পাঠান চরিত্রের কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই প্রসঙ্গে মওলানা লিখেছেন :

> On one occasion, a large deputation from Peshwar came to see me in Calcutta in connection with the election funds. As it was tea time, I offered them tea and biscuits. Several members of the deputation looked at the biscuits with surprise. One took up a biscuit and asked me its name They seemed to enjoy the biscuit and then told me that they had seen such biscuits in Dr. Khan Shahib's house but he had never offered biscuits or even a cup tea to any of them.'[১১]

পাঠানদের দেখিয়ে চা-বিস্কুট খাবে, অথচ তাদের সাধবেও না, এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে জনসমর্থন ধরে রাখা সম্ভব নয়। কাজেই সীমান্ত প্রদেশের গণভোটেও কংগ্রেসের পরাজয় ঘটল। এসব কাকতালীয় ঘটনার অনিবার্য পরিণতিতে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটে।

যারা পাকিস্তানে বিশ্বাস করে, তারা মনে করে যে তাদের কায়েদে আজমের দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলেই পাকিস্তানের জন্ম। তবে এখানেও দুর্ঘটনার ভূমিকা

একবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ডোমেনিক ও লা পিয়েরের মতে, জিন্নাহ যখন পাকিস্তানের জন্য চূড়ান্ত দর-কষাকষি করছেন, তখন তাঁর ফুসফুসে ক্যানসার বাসা বেঁধেছে।[১২] এই খবর জিন্নাহর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও জিন্নাহ নিজে জানতেন। কিন্তু কংগ্রেসের কেউ জানত না। জিন্নাহর চিকিৎসক এ খবরের গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন। অন্যথায় কংগ্রেস আপসে হয়তো রাজি হতো না। যত সময় যেত, জিন্নাহ আপসের জন্য অস্থির হয়ে পড়তেন। কাজেই যারা পাকিস্তানের সমর্থক, তাদের পক্ষেও দুর্ঘটনার তত্ত্ব একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

শুধু কাকতালীয় ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও পাকিস্তানের জন্মের অনিবার্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ১৯৩০ সালে কবি ইকবাল এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সভায় পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের সমন্বয়ে একটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবি করেন। তবে এ রাষ্ট্রের তিনি কোনো নাম দেননি। পাকিস্তান শব্দটির জন্ম চৌধুরী রহমত আলী কর্তৃক ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'Now or Never' শীর্ষক ক্রোড়পত্রে।[১৩] এই দলিলে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে চারটি প্রদেশের আদ্যক্ষর নিয়ে (পাঞ্জাবের 'পি', আফগান বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'এ', সিন্ধ-এর 'এস' ও বালুচিস্তানের 'তান') পাকিস্তান শব্দের উৎপত্তি। তবে 'আই' অক্ষরটি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন 'আই' অক্ষরটি ইন্ডাস নদীর আদ্যক্ষর; আবার কেউ বলেন উচ্চারণের সুবিধার জন্য 'আই' যুক্ত হয়েছে। মোটকথা এ নামে বাংলার কোনো উল্লেখ নেই। ১৯৪০ সালে লাহোরে শেরেবাংলা কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটি আদৌ ব্যবহৃত হয়নি। লাহোর প্রস্তাবে একটি পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি করা হয়নি। লাহোর প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছিল :

> The establishment of completely independent states formed by demarcating geographically contiguous units into regions which shall be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that areas in which the Mussulmans are necessarily in a majority as in the North Western and Eastern zones of India, shall be grouped together to constitute Independent States as Muslim Free National Homelands in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.'[১৪]

এ কথা সুস্পষ্ট যে লাহোর প্রস্তাবে কমপক্ষে দুটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই মুসলিম লীগ বাংলায় নির্বাচনে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগ জানত যে এক পাকিস্তানের দাবি লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। তাই ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে মুসলিম লীগ থেকে

নির্বাচিত সাংসদের এক কনভেনশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে লাহোর প্রস্তাব (যা সংশোধনের এখতিয়ার দলের ছিল, দল কর্তৃক মনোনীত সাংসদের নয়) সংশোধন করা হয়। এই প্রস্তাবে 'Independent States'-এর বদলে দাবি করা হয় 'a sovereign independent state, comprising Bengal and Assam in the north-east zone and the Punjab, the N.W.F.P., Sind, and Baluchistan in the north-west zone.'[১৫]

জন্মের এক বছর চার মাস চার দিন আগে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান দাবি করা হয়। এত তাড়াতাড়ি এত বড় দাবি পূরণের নজির ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। পাকিস্তান শব্দটি চয়ন করা হয়েছিল মাত্র সাড়ে ১৪ বছর আগে। মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে ভারতে মুসলমানদের জন্য একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ছিল। ভারতে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাদের হিন্দুরা ঠাট্টা করে পাকিস্তানের সমর্থক বলত। জিন্নাহ্ নিজে স্বীকার করেছেন যে তিনি হিন্দুদের দেওয়া পাকিস্তান নাম মেনে নিয়েছেন। এত দ্রুততার সঙ্গে পাকিস্তানের জন্ম হয় যে এর আবির্ভাব অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

ভারতের ভৌগোলিক ঐক্য প্রকৃতির অবদান। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় চেতনা গড়ে উঠেছে। রামায়ণ-মহাভারতের মতো ধর্মগ্রন্থ এ চেতনাকে লালন করেছে। কালিদাসের কাব্যে সর্বভারতীয় চেতনা বিধৃত। মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে মোগল সাম্রাজ্য পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছর ধরে অসংখ্য রাষ্ট্রনায়ক এই ঐক্যের সাধনা করেছেন। অথচ মুসলিম লীগের মতো একটি দ্বিতীয় সারির রাজনৈতিক দলের পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের সাড়ে সাত বছরের মাথায় সেই ঐক্য খানখান হয়ে গেল। এ ধরনের ঐতিহাসিক প্রবণতা অবিশ্বাস্য। পাকিস্তানের যারা সমর্থক, তারা অনেকেই ধরে নিয়েছিল, এ বিভক্তি টিকবে না। অনেক হিন্দু নেতা মনে করতেন যে পাকিস্তান হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। তাই পাকিস্তানিদের প্রিয় স্লোগান ছিল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বা 'পাকিস্তান দীর্ঘজীবী হোক'।

বাংলাদেশের আবির্ভাব পাকিস্তানের চেয়েও অনেক বেশি আকস্মিক। আনুষ্ঠানিকভাবে এক পাকিস্তানের প্রস্তাব গ্রহণের এক বছর কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তানের জন্ম হয়। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক দাবি করার আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। মূলত ছয় দফা দাবিতে বাংলাদেশের দাবি প্রচ্ছন্নভাবে পেশ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছয় দফা (কেন্দ্রীয় সরকারের কর আদায়ের কোনো ক্ষমতা থাকবে না এই প্রস্তাবটি ছাড়া) কোনো

নতুন প্রস্তাব নয়। ছয় দফা ছিল মূলত লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবি। ছয় দফা দাবি ঘোষিত হয় ১৮ মার্চ ১৯৬৬। ছয় দফায় বাংলাদেশের কোনো উল্লেখ ছিল না। তবু যদি ছয় দফাতেই বাংলাদেশ দাবির সূত্রপাত হয়েছে ধরে নিই, তাহলে বাংলাদেশ দাবি অর্জিত হয়েছে মাত্র পাঁচ বছরে। অনেকে মনে করেন যে ১৯৭১ সালে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে বাংলাদেশের জন্ম অনিবার্য ছিল না। কাজেই যখন ভারতের মিত্রবাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশের জন্ম হয়, তখন বাংলাদেশের অনেক সমালোচকই এর অনিবার্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

যাঁরা মনে করেন যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী ছিল না, তাঁরা বলে থাকেন যে ইয়াহিয়া খানের মতো মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র রাষ্ট্রপতি না হলে হয়তো আলোচনার মাধ্যমে ছয় দফা অর্জন করা যেত। আবার কেউ কেউ বলেন, যদি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জীবিত থাকতেন, তাহলে পাকিস্তানের অখণ্ডতা হয়তো অক্ষুণ্ন থাকত। স্মরণ করা যায়, দিল্লিতে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে এক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সোহরাওয়ার্দীই উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৯২ সালে, মৃত্যু হয়েছিল ১৯৬৩ সালে ৭১ বছর বয়সে। ১৯৭১ সালে জীবিত থাকলে তাঁর বয়স হতো ৭৯ বছর।

সমসাময়িক ইতিহাস যতই বিশ্লেষণ করা হবে, সব ঐতিহাসিক ঘটনার অনিবার্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা সম্ভব। কী অনিবার্য আর কী অনিবার্য নয়, তা বুঝতে হলে সমসাময়িক রাজনীতির ডামাডোল উপেক্ষা করে প্রশ্ন করতে হবে, যা ঘটেছিল তা অবশ্যম্ভাবী ছিল কি না। বস্তুত বাংলাদেশের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল এই কারণে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি ছিল কাকতালীয় ও ইতিহাসের মূলধারা থেকে বিচ্যুতি এবং এই বিচ্যুতি সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশ হলো ইতিহাসের ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধন।

পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের মূল বক্তব্য ছিল যে যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে, তারা ভাষা, ভৌগোলিক দূরত্ব ও জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে এক জাতি। এর ফলে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, তার দুটি অংশ প্রায় হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত। তার অধিবাসীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং জনগোষ্ঠীর দিক থেকেও তারা ভিন্ন। ঠাট্টা করে বলা হতো, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিল ইংরেজি ভাষা আর পিআইএ নামে একটি বিমান কোম্পানি। অথচ ইসলামের জন্মভূমি মধ্যপ্রাচ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য, ভাষাগত অভিন্নতা ও জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য সত্ত্বেও সেখানে রাজনৈতিক ঐক্যের কাছাকাছিও গড়ে তোলা যায়নি। (সারণি-২.১)

### সারণি-২.১
### ভৌগোলিকভাবে অবিচ্ছিন্ন আরবিভাষী মুসলমান দেশসমূহের তালিকা

| ক্রমিক সংখ্যা | রাষ্ট্রের নাম | জনসংখ্যা (লাখ) |
|---|---|---|
| ১ | মিসর | ৮২০ |
| ২ | আলজেরিয়া | ৩৯২ |
| ৩ | সুদান | ৩৯৭ |
| ৪ | ইরাক | ৩৩০ |
| ৫ | মরক্কো | ৩৩০ |
| ৬ | সৌদি আরব | ২৮৩ |
| ৭ | ইয়েমেন | ২৪৪ |
| ৮ | সিরিয়া | ২২৮ |
| ৯ | তিউনিসিয়া | ১০৯ |
| ১০ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৯৩ |
| ১১ | জর্দান | ৬৪ |
| ১২ | লিবিয়া | ৬২ |
| ১৩ | লেবানন | ৪৪ |
| ১৪ | ফিলিস্তিন | ৪২ |
| ১৫ | মৌরিতানিয়া | ৩৯ |
| ১৬ | ওমান | ৩৬ |
| ১৭ | কুয়েত | ৩৩ |
| ১৮ | কাতার | ২২ |
| ১৯ | বাহরাইন | ১৩ |

ঃস : Wikipedia

মুসলমান আরব দেশসমূহের জনসংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের চেয়ে ম। এরা একই ধর্মে বিশ্বাস করে, একই আরবি ভাষায় কথা বলে এবং একটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে বাস করে। তবু আরব বিশ্বে ১৯টি মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। অথচ াষাগত ভিন্নতা এবং ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সব ভারতীয় সলমান শুধু ধর্মের ভিত্তিতে কীভাবে একটি রাষ্ট্রে মিলিত হবে, তার কোনো ক্তিসংগত ব্যাখ্যা নেই। ভাষা ও ভৌগোলিক বন্ধন অগ্রাহ্য করে কীভাবে ারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের এক রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে, সে ম্পর্কে কোনো যুক্তিসংগত পরিকল্পনা পাকিস্তানের সমর্থকেরা দিতে পারেননি।

ভারতে কমপক্ষে দুটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। তাতেও সব ভারতীয় মুসলমান হয়তো একত্র হতে পারত না, তবে অধিকাংশ মুসলমানের ঠাঁই হতো।

মিশন পরিকল্পনা, যা মওলানা আজাদ সমর্থন করেছিলেন, তাতে দুটি মুসলিম রাষ্ট্রের সম্ভাবনা ছিল। কাকতালীয় ঘটনাপ্রবাহে দুটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রের বদলে ভারতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ মেয়াদে ভারত উপমহাদেশে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে দুটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। তাই পাকিস্তানের জন্ম নয়, পাকিস্তানের বিভক্তিই ছিল ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পাকিস্তান সৃষ্টি ছিল ইতিহাসের মূলধারা থেকে বিচ্যুতি। বাংলাদেশ সৃষ্টির ফলে এই উপমহাদেশের রাজনীতি ইতিহাসের মূলধারায় ফিরে আসে।

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব অনিবার্য না কাকতালীয়—এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তবু এ বিতর্ক শুধু অতীতের বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বিতর্কের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও জড়িয়ে রয়েছে। এই নিবন্ধে তাই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে এই অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের আকস্মিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের বিচার্য বিষয় হলো সম্প্রতি চটজলদি যেসব জাতীয়তাবাদী সত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে—তারা টেকসই কি না তা বিবেচনা করা। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ কতটুকু টেকসই, সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি পরীক্ষা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাঙালি বনাম বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিতর্ক পর্যালোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের ওপর আধিপত্যবাদের সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষ খণ্ডে বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

## ২.২ জয় বাংলা বনাম বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

আপাতদৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ দীর্ঘদিন ধরে তার শক্তি সঞ্চয় করে। তাই জাতিরাষ্ট্রের নাটকীয় আবির্ভাব সম্ভব নয়। যেখানে চটজলদি জাতিসত্তার আবির্ভাব, সেখানে জাতীয়তাবাদ কতটুকু টেকসই, তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে জাতীয়তাবাদের গত দুই শতাব্দীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে জাতীয়তাবাদ আস্তে আস্তে আত্মপ্রকাশ করে না। অনেক ক্ষেত্রেই এর আকস্মিক আত্মপ্রকাশও ঘটে।

## সারণি-২.২
## জাতিরাষ্ট্রের সংখ্যা, ১৮১৫-২০১৫

| সময় | মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা |
|---|---|
| ১৮১৫-৫০ | ৩৮ |
| ১৮৫১-৬০ | ৫৫ |
| ১৯০১-১০ | ৪৮ |
| ১৯২১-৩০ | ৬৯ |
| ১৯৫১-৬০ | ১০৮ |
| ১৯৬১-৯০ | ১৩৮ |
| ২০০২ | ১৯১ |
| ২০০৬ | ১৯২ |
| ২০১১ | ১৯৩ |
| ২০১৫ | ২০৩ |

উৎস :

১) ১৮১৫-১৯৯০ সময়কালের উপাত্তের উৎস : Lake David and Angela Maloney. 'The Incredible Shrinking State' *The Journal of Conflict Resolution*. vol-48. Oct., 204, 699-722

২) ২০১৫ ও ১৮১৫-১৯৮০ ছাড়া অন্য সব সংখ্যার উৎস জাতিসংঘের সদস্য তালিকা।

৩) ২০১৫-এর সংখ্যাতে জাতিসংঘের সদস্য নয়, এমন ১০টি রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত।

সূত্র : বিশ্বব্যাংক ২০১৪ World Development Indicators.

সারণি-২.২ থেকে দেখা যায়, ১৮১৫-৫০ সময়কালে মোট স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৮। অথচ এই সংখ্যা বর্তমানে ২০৩-এ উন্নীত হয়েছে। বিগত দুই শ বছরে রাষ্ট্রের সংখ্যা প্রায় ৫.৪ গুণ বেড়েছে। এ বৃদ্ধি যে একেবারে থেমে যাবে, সে ধরনের কোনো প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে না। সারণি-২.৩ এ বর্তমান বিশ্বে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রের জন্য সক্রিয় আন্দোলনের একটি তালিকা দেখা যাবে।

## সারণি-২.৩
## বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রের জন্য সক্রিয় আন্দোলনের তালিকা

| মহাদেশ | ক্রমিক নং ও দেশের নাম | বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রের জন্য সক্রিয় আন্দোলনের সংখ্যা |
|---|---|---|
| আফ্রিকা | ১। আলজেরিয়া | ১ |
| | ২। এঙ্গোলা | ১ |
| | ৩। ক্যামেরুন | ২ |

| | |
|---|---|
| ৫। কোমোরস | ২ |
| ৬। কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ১ |
| ৭। কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র | ১ |
| ৮। মিসর | ৪ |
| ৯। নিরক্ষরেখা অঞ্চলের গিনি | ১ |
| ১০। ইথিওপিয়া | ৫ |
| ১১। ফ্রান্সের উপনিবেশ | ১ |
| ১২। আইভরি কোস্ট | ১ |
| ১৩। লিবিয়া | ৩ |
| ১৪। মালি | ১ |
| ১৫। মরক্কো | ২ |
| ১৬। নামিবিয়া | ১ |
| ১৭। নাইজার | ১ |
| ১৮। নাইজেরিয়া | ৪ |
| ১৯। রুয়ান্ডা | ১ |
| ২০। সেনেগাল | ১ |
| ২১। সোমালিয়া | ১ |
| ২২। দক্ষিণ আফ্রিকা | ১ |
| ২৩। কানারি দ্বীপ | ১ |
| ২৪। সুদান | ২ |
| ২৫। তানজানিয়া | ১ |
| ২৬। উগান্ডা | ১ |
| ২৭। জাম্বিয়া | ১ |
| ২৮। জিম্বাবুয়ে | ১ |
| ২৯। আলবেনিয়া | ১ |
| ৩০। বেলজিয়াম | ২ |
| ৩১। বসনিয়া-হারজেগোভিনা | ২ |
| ৩২। ক্রোয়েশিয়া | ২ |
| ৩৩। সাইপ্রাস | ১ |
| ৩৪। চেক প্রজাতন্ত্র | ২ |
| ৩৫। ডেনমার্ক | ২ |
| ৩৬। ফিনল্যান্ড | ১ |
| ৩৭। ফ্রান্স (ইউরোপ) | ৪ |
| (ওশেনিয়া) | ২ |
| ৩৮। জর্জিয়া | ২ |
| ৩৯। জার্মানি | ৪ |
| ৪০। ইতালি | ৩ |
| ৪১। কসোভো | ১ |
| ৪২। ম্যাসিডোনিয়া | ১ |

| | | |
|---|---|---|
| | ৫২। বাংলাদেশ | ১ |
| | ৫৩। মিয়ানমার | ১২ |
| | ৫৪। সাইপ্রাস | ১ |
| | ৫৫। জর্জিয়া | ২ |
| | ৫৬। চীন | ৪ |
| | ৫৭। ভারত | ৬ |
| | ৫৮। ইন্দোনেশিয়া | ৫ |
| | ৫৯। ইরান | ৫ |
| | ৬০। ইরাক | ৪ |
| | ৬১। ইসরায়েল | ২ |
| | ৬২। জাপান | ২ |
| | ৬৩। লাওস | ১ |
| | ৬৪। মালয়েশিয়া | ২ |
| | ৬৫। পাকিস্তান | ১ |
| | ৬৬। ফিলিপাইন | ২ |
| | ৬৭। শ্রীলঙ্কা | ১ |
| | ৬৮। সিরিয়া | ৭ |
| | ৬৯। তাজিকিস্তান | ১ |
| | ৭০। থাইল্যান্ড | ১ |
| | ৭১। তুরস্ক | ১ |
| | ৭২। উজবেকিস্তান | ১ |
| | ৭৩। ভিয়েতনাম | ১ |
| | ৭৪। ইয়েমেন | ৩ |
| র আমেরিকা | ৭৫। কানাডা | ৪ |
| | ৭৬। মেক্সিকো | ১ |
| | ৭৭। নিকারাগুয়া | ১ |
| | ৭৮। যুক্তরাষ্ট্র (উত্তর আমেরিকা) | ৫ |
| ণ আমেরিকা | ৭৯। পোয়ের্তো রিকো | ১ |
| | ৮০। আর্জেন্টিনা | ১ |
| | ৮১। বলিভিয়া | ১ |
| | ৮২। ব্রাজিল | ৫ |
| | ৮৩। কলম্বিয়া | ১ |
| | ৮৪। ফরাসি গিনি | ১ |
| | ৮৫। ভেনেজুয়েলা | ১ |
| ানিয়া | ৮৬। অস্ট্রেলিয়া | ২ |
| | ৮৭। ফিজি | ১ |
| | ৮৮। নিউজিল্যান্ড | ২ |
| | ৮৯। ভানায়াতু | ১ |
| ট | মোট রাষ্ট্র ৮৯ | ১৯৬ |

: Wikipedia

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুধু উন্নয়নশীল দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, উন্নত দেশেও এন্তার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন রয়েছে। মানুষের ইতিহাসে প্রথম টেকসই উন্নয়নের সূচনা হয় যুক্তরাজ্যে। এ দেশে প্রায় ৪০০ বছর ধরে গণতন্ত্র সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। তবু এ দেশে ৪টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার দাবি রয়েছে। ৩০০ বছর একত্রে থাকার পর স্কটরা যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা চায়। এই প্রশ্নে গণভোটে ২০১৪ সালে অবশ্য স্কটরা হেরে যায়। তবে স্বাধীনতাকামীরা প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোট পায়। আর ৫ শতাংশ জনসমর্থন পেলেই স্কটল্যান্ড নামে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম নিতে পারত। যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা চায় ওয়েলসের অধিবাসীরা, করনওয়ালের কেল্টিক নরগোষ্ঠী ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রোটেস্টান্টরা। ইউরোপে রাশিয়াতে ১৫টি, স্পেনে ১০টি ও ফ্রান্সে ৪টি নতুন রাষ্ট্রের দাবি রয়েছে। ২০১৫ সালে সেপ্টেম্বরে কেটালোনিয়ার জনগণ স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতার পক্ষে গণভোটে মত দিয়ে এক নতুন রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিয়েছে। গত ২০০ বছরে প্রায় বিশ্বে ১৫৫টি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি কমে এলেও এখনো একেবারে থেমে যায়নি।

মজার ব্যাপার হলো, নতুন রাষ্ট্র একবার স্থাপিত হলে খুব অল্প ক্ষেত্রেই তা আবার পরিবর্তিত হয়। একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির একত্রীকরণে। আবার কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নতাকামী রাষ্ট্রকে দমন করে মূল রাষ্ট্র (যথা যুক্তরাষ্ট্র, নাইজেরিয়া, কঙ্গো ইত্যাদি)। এ ধরনের কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা বাদ দিলে দেখা যায়, একবার জাতীয়তাবাদী শক্তি জয়লাভ করলে পুরোনো ব্যবস্থা আর ফিরে আসে না। এর একটি বড় কারণ হলো, প্রতিটি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। যদি কোনো অঞ্চল পুরোনো রাষ্ট্রকাঠামোতে ফিরে আসে, তবে তার জনসংখ্যাকে এটি মেনে নিতে হয় (বর্তমান বিশ্বে কোনো অঞ্চলকে জনশূন্য করে অধিভুক্ত করা সম্ভব নয়)। এতে ক্ষমতার কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। কাজেই পুরোনো রাষ্ট্রের অভিভাবকেরা এ ধরনের সংযুক্তির তীব্র বিরোধিতা করবে। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ ভারতে যোগ দিতে চায়। সে ক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এর বিরোধিতা করবে। এর কারণ হলো, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ভারতে যোগ দিলে সর্বভারতীয় নেতৃত্বে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

## সারণি-২.৪
## ভারত ও বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা, ২০১১

| ধর্ম | ভারতে ধর্মাবলম্বীর জনসংখ্যা | ভারতের মোট জনসংখ্যার অনুপাত | বাংলাদেশে ধর্মাবলম্বীর জনসংখ্যা | বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাত | ভারত ও বাংলাদেশে ধর্মাবলম্বীর মোট জনসংখ্যা | ভারত ও বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অনুপাত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইসলাম | ১৭.২২ কোটি | ১৪.২৩% | ১৩.৭২ | ৯০ | ৩০.৯৪ | ২২.৭ |
| হিন্দু | ৯৬.৬৩ কোটি | ৭৯.৮ | ১.৩২ | ৯ | ৯৭.৯৫ | ৭১.৮ |
| তফসিলি সম্প্রদায় | ১৯.৬ | ১৬.২ | - | - | - | - |
| তফসিলি উপজাতি | ৯.৯২ কোটি | ৮.৯ | - | - | ৯.৯২ | ৭.৭৩ |
| বর্ণহিন্দু | ৬৭.১১ | ৫৫.৪ | ০.৩২ | - | ৬৭.৪৩ | ৪৯.০০ |
| খ্রিষ্টান | ২,৭৮ | ২.৩ | ০.১ | .০৫ | ২.৭৮ | ২.০ |
| শিখ | ২.১৬ | ১.৭৯ | - | - | ২.১৬ | ১.৬ |
| অন্যান্য | ২.৩৯ | ১.৯৮ | ০.১ | - | ২.৫৭৪ | ১.৯ |

উৎস : Wikipedia and Census of Bangladesh, 2011

সারণি-২.৪ থেকে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান ব্যবস্থায় ভারতে মুসলমান ভোটারের অনুপাত হচ্ছে প্রতি ১০০ জন ভারতীয়ের মধ্যে ১৪.২৩ জন। যদি কোনো কারণে ভারত-বাংলাদেশ একত্র হয়, তবে প্রতি ১০০ জন ভারতের নাগরিকের মধ্যে ২২.৭ শতাংশ হবে মুসলমান। সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে যদি নিবিড় ঐক্যের বন্ধন গড়ে ওঠে এবং যদি তারা একই দলের পক্ষে ভোট দেয়, তবে ভারতের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। বর্ণহিন্দুদের রাজনৈতিক আধিপত্য ক্ষুণ্ন হতে পারে। কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতা এ ধরনের বড় পরিবর্তন চাইবে না।

রাজনৈতিক সমস্যা শুধু ফেডারেল রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না; তা বাংলা অঞ্চলের আশপাশের প্রদেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়বে। বাংলা ভারতে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা। ভারতে মোট ৮.৩৩ কোটি বাংলাভাষী লোক রয়েছে। কিন্তু ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১৫ কোটি লোক বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় কথা বলে।

## সারণি-২.৫
## বাংলাদেশের আশপাশে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর জনসংখ্যা

| ভাষার নাম | মোট জনসংখ্যা | মোট ভাষাভাষীর ভিত্তিতে ভারতে অবস্থান |
|---|---|---|
| বাংলা (পশ্চিম বাংলা) | ৮.৩২ | ২ |
| বাংলা (বাংলাদেশ) | ১৫.০০ | - |
| মোট বাংলাভাষী . | ২৩.৩২ | ২ |
| ওড়িয়া | ৩.৩ | ১০ |
| আসামি | ১.৩১ | ১২ |
| মণিপুরি | .১৪ | ০.২৫ |
| খাসি/গারো | ০.১১২ | ০.২৯ |
| বোরা | .১৩ | ০.২৯ |

উৎস : Census of India and Bangladesh

যদি ২৩ কোটি বাংলাভাষী লোক একত্র হয়, তবে প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহে ওড়িয়া, আসামি, খাসি, বোরা, মণিপুরি প্রভৃতি ভাষাভাষীরা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের এবং উড়িষ্যা ও বিহারের প্রদেশসমূহ এর বিরোধিতা করবে। বাংলাদেশের ভারতে অন্তর্ভুক্তির ফলে ভারতের জনগণের লাভের সম্ভাবনা কম। ১৯৪৬ সালে হিন্দু বাঙালি সাংসদদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে হিন্দু বাঙালিরা ভাষার বন্ধনের চেয়ে ধর্মের বন্ধনের ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। ১৯৪৬ সালে বাংলার হিন্দু সাংসদদের বাংলাকে অবিভক্ত রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। হিন্দু সাংসদরা রাজি হলে অবিভক্ত বাংলা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হতো। হিন্দু সাংসদরা সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

শুধু মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে এ ধরনের রাষ্ট্রে বাংলাদেশের কোনো লাভ নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলে পাকিস্তানিদেরও এ ধরনের রাষ্ট্র সৃষ্টিতে আগ্রহ থাকবে না; কেননা, এই রাষ্ট্রে ভিন্ন ভাষা ও জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকবে। বাংলাদেশ চাইলেও (যার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা নেই) বাংলাদেশের অবলুপ্তি ভারতের বা পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। বস্তুত ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক।

ব্রিটিশ শাসনকালে এই উপমহাদেশে দুই ধরনের জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথমত, কংগ্রেসের নেতাদের বক্তব্য ছিল, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদ একটি। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ নেতাদের বক্তব্য ছিল যে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুটি ভিন্ন জাতি। ভারতে এখন তিনটি জাতি রয়েছে; ভারতীয়, পাকিস্তানি ও বাঙালি। এই তিন জাতির মধ্যে বাঙালি জাতিই সবচেয়ে স্থির। ভাষা ও গোত্রের ভিত্তিতে পাকিস্তানি জাতির ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তেমনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদও ভঙ্গুর। এখনো বিচ্ছিন্নতাবাদী জনগোষ্ঠী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয়। তিনটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালি জাতিই সবচেয়ে স্থিতিশীল। ভারতীয় বা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ধসে পড়লেও বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই কম। অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই লিখেছেন :

যত দিন রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

## ২.৩ বাঙালি বনাম বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের আদি সংবিধানের নবম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।' ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় ঘোষণা (পঞ্চদশ সংশোধনী) আদেশবলে সামরিক শাসকেরা এই অনুচ্ছেদটি বাদ দেয় ও স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করে। স্পষ্টতই সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে দেশের মূল সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাদের মূল আপত্তি ছিল তিনটি। প্রথমত, বাংলাদেশে শতভাগ ব্যক্তি বাংলা ভাষায় কথা বলে না। কাজেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, যদিও ভাষা মুক্তিসংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবু শুধু ভাষাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের একমাত্র ভিত্তি নয়। বাংলাদেশ শূন্য থেকে আসেনি, এর পেছনে রয়েছে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯০ ভাগ মুসলমান।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ নামকরণে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে ইসলামের ভূমিকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। তাই সমালোচকেরা এই নামকরণের বিরোধিতা করেন। তৃতীয়ত, বাঙালি জনগোষ্ঠী শুধু বাংলাদেশে বাস করে না, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাস করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন হওয়া উচিত সব বাঙালির জন্য একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। এ ধরনের সমালোচকেরা মনে করেন যে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যুক্ত বাংলা চায় না। কাজেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ নামকরণ মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। এই ঘরানার রাজনীতিবিদেরা তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রতিস্থাপন করতে চান। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ভূখণ্ডভিত্তিক। আসলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র কোনো ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল না। বাংলাদেশের ভূখণ্ড হচ্ছে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ড। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমান সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে। কাজেই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ-সম্পর্কিত তত্ত্বের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের সমর্থকদের দাবি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। তাঁদের মতে, সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কবর দেওয়া হয়েছে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রামের সূচনা তা একান্তই ভাষাভিত্তিক, এটি শুধু বাংলাদেশেই ঘটেনি। পৃথিবীর সর্বত্রই জাতীয়তাবাদ ও ভাষার এ ধরনের সম্পর্ক দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক বেনেডিক্ট এন্ডারসন যথার্থই লিখেছেন :

> What the eye is to the lover—that particular ordinary eye he or she is born with—, language—whatever language history has made his or her mother tongue—is to the patriot. Through that language, encountered at mother's knee and parted with only at the grave, pasts are restored, fellowships are imagined and futures dreamed.[১৬]

মায়ের ভাষার প্রতি আবেগমণ্ডিত অনুরক্তি বাংলার ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক লরেন্স জিরিং এ প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন :

> Bengali love affair with their language involves a passionate ritual that produces emotional experiences seldom found in other parts of the world.[১৭]

তাঁর মতে, বাংলাদেশের জনগণের ভাষার প্রতি এই তীব্র অনুরাগের উৎস বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুতে নিহিত। বর্ষাকালে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যায়। এর ফলে অধিবাসীদের জীবনে স্থবিরতা দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে লরেন্স জিরিং লিখেছেন :

> Bengalis pass the rainy season huddled together in small groups, riding out the torrential downpour in virtual isolation sustained only by recitations and songs that fill the time, waiting for rains to subside and water to recede.[১৮]

বাংলা ভাষার প্রতি তীব্র অনুরাগের একটি বড় কারণ হলো, বাংলা ভাষার আবির্ভাব কুসুমাস্তীর্ণ পথে হয়নি। গণমানুষের মুখের ও প্রাণের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষা দীর্ঘদিন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ধর্মের সহজে স্বীকৃতি পায়নি। ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের জন্য তাকে পাঁচটি সাম্রাজ্যবাদী ভাষার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। এই ভাষাগুলো হলো সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি। প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী ভাষার পেছনে ছিল শক্তিশালী কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী।

সংস্কৃত ভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। মনুসংহিতায় সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে শূদ্রেরা উপস্থিত থাকলে বেদের শ্লোক আবৃত্তি করা যাবে না। এই নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ ছিল নিম্নবর্ণের লোকেরা যাতে বেদে কী লেখা আছে তা জানতে না পারে। একই কারণে হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ নিষিদ্ধ করা হয়। শাস্ত্রকারেরা বিধান দিলেন :

অষ্টাদশ পুরণাণিরামস্য চরিতানি চ
ভাষায় মানব শ্রুত্বা রৌরব নরকং ব্রজেৎ।[১৯]

এর অর্থ হলো, রামায়ণ ও অষ্টাদশ পুরাণের বাণী ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ শুনলে তাকে রৌরব নরকে যেতে হবে। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় হিন্দুধর্মের চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হামলা থেকে উদীয়মান বাংলা ভাষাকে রক্ষা করে মুসলমান রাজাদের আনুকূল্য ও সাধারণ মানুষের সমর্থন।

ব্রাহ্মণদের মতো মুসলমান মোল্লা-মৌলভিরাও বাংলা ভাষা প্রচলনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। হিন্দুদের জন্য যেমন পবিত্র ভাষা সংস্কৃত, তেমনি মুসলমানদের জন্য পাক ভাষা হলো আরবি। মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর বাণী বাংলা ভাষার মতো পৌত্তলিকতা দোষে দুষ্ট ভাষায় অনুবাদ করা যাবে না। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। কাজেই এর শব্দসম্ভারে পৌত্তলিকতার ছাপ অবশ্যই থাকবে। তাই ফতোয়া দেওয়া হলো যে বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে লেখা যাবে না। এভাবে আরবির সঙ্গে ফারসি ও উর্দু ভাষাও বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ফারসি ভাষা ছিল মুসলমান শাসকদের রাষ্ট্রভাষা। শুধু মুসলমান শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নয়, বাংলার অভিজাত হিন্দুরাও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ফারসি ভাষার চর্চা করত। উপরন্তু ভারতের বাইরে থেকে ও উত্তর ভারত থেকে অনেক বহিরাগত মুসলমান বাংলায় বসতি স্থাপন করে। তারা উর্দু বা ফারসি ভাষায় কথা

বলত। কাজেই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণির লোকেরা বাংলা ভাষাকে ছোটলোকের ভাষা হিসেবে ঘৃণার চোখে দেখত। মোল্লা-মৌলভি, আমির-ওমরা ও আশরাফদের বাধাকে অগ্রাহ্য করে বাংলা ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যায় সাধারণ মানুষের সমর্থন।

এরপর ইংরেজদের রাজত্বকালে রাজানুকূল্য নিয়ে আরেক শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয় ইংরেজি ভাষা। এই অসম প্রতিযোগিতায় সাধারণ মানুষের সমর্থনই ছিল বাংলা ভাষার প্রধান শক্তি। সব শেষে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের আশরাফদের উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করেছে বাংলার সাধারণ মানুষেরাই। বাংলাদেশে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়নি, বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল কমপক্ষে ৭০০ বছর আগে, যখন বাঙালি কবি-সাহিত্যিকেরা মোল্লা-মৌলভিদের ফতোয়াকে অগ্রাহ্য করে বাংলা ভাষায় ইসলামের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তবে আন্দোলন শুধু ফতোয়া অগ্রাহ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে বুকের রক্ত দিয়ে বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এই সুদীর্ঘ ভাষা আন্দোলনই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করেছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে ভাষার ভূমিকা মুখ্য হলেও ভাষাই একমাত্র উপাদান নয়। এখানে পরোক্ষভাবে ধর্মের ভূমিকাও রয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলমান সাহিত্যিক হিসেবে চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তাঁর রচনা পাঠ করলে স্পষ্টতই দেখা যায়, মৌলভিদের ফতোয়ার ফলে বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে কিছু লেখা সমীচীন হবে কি না, সে সম্পর্কে তাঁর মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। দেশি ভাষায় কাব্য রচনায় তাঁর ভয় ছিল। *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যগ্রন্থে তিনি কেন বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন, তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

ন লিখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ।
দোষিব সকল তাক ইহ না জুয়াএ।
গুনিয়া দেখিলু; আক্ষি ইহ ভয় মিছা
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা ॥
শুনিয়াছি মহাজনে কহিতে কথন।
রতন ভান্ডার মধ্যে বচন সে ধন ॥[২০]

মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। প্রথমত, বেশির ভাগ মুসলমান লেখক ইসলামের

দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার সীমাবদ্ধতা মেনে নেন। সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক আবদুল হাকিম (১৬২০-৯০) লিখেছেন :

আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান।
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান ॥
আরবী পড়িতে যদি না পার কদাচিৎ।
ফারছি পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত ॥
ফারছি পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিৎ।
নিজ দেশি ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত ॥[২১]

তিনি এ কথা স্বীকার করে নেন যে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে আরবি ভাষা। যারা আরবি জানে না, তাদের জন্য ফারসি পরবর্তী উত্তম ভাষা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু যারা দুটি উত্তম ভাষার কোনোটিই জানে না, তাদের অন্তত স্বদেশি ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ থাকা উচিত। বাংলা ভাষায় ধর্মচর্চা করা বিধেয় নয়। কিন্তু যারা আরবি-ফারসি ভাষা জানে না, তাদের বাংলা ভাষায় ধর্মচর্চা না করতে দিলে তারা ধর্মের আলো থেকে বঞ্চিত হবে। একই দৃষ্টিকোণ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি শেখ মুত্তালিব লিখেছেন :

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তেকারণে দেশি ভাষে রচিলু প্রবন্ধ ॥
মুসলমানী শাস্ত্রে কথা বাঙ্গালা করিলু।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু ॥
কিন্তু মাত্র ভরসা আছয়ে মনান্তরে।
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে ॥
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবশ্য গফুর আল্লাহ পাপ খেমিবেক ॥
এ সব জানিয়া যদি করয়ে রক্ষণ।
তবে সে মোহেরে পাপ হইবে মোচন ॥[২২]

মুত্তালিব স্বীকার করেন যে বাংলা ভাষায় মুসলমানি শাস্ত্রচর্চা করলে গুনাহ হবে। তবে কবির আশা এই যে যারা আল্লাহর বাণী বুঝতে পারেনি, তারা এই বেদাত কাজ থেকে উপকৃত হবে। যেসব মুসলমান উপকৃত হবেন, তাঁরা, যাঁরা বাংলায় ইসলাম সম্পর্কে লিখছেন, তাঁদের মাগফিরাত কামনা করবেন। এর ফলে মহান আল্লাহ লেখকদের পাপ ক্ষমা করবেন।

কতিপয় লেখক বাংলা ভাষায় লেখার জন্য যেসব পাপ হবে, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাংলা ভাষায় আরবি হরফে লেখেন। মুহাম্মদ ফসীহর (সপ্তদশ শতাব্দী) মতো কিছু লেখক আরবি হরফে বাংলা লেখেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা গ্রন্থ *মাক্তুল হুসাইন* আরবি হরফে রচিত হয়।

তৃতীয় ধারার লেখকেরা মোল্লা-মৌলভিদের ফতোয়ার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, মহান আল্লাহ সব ভাষাই বোঝেন। তাই বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাওয়ার কোনো কারণ নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম তাই যুক্তি দেখিয়েছেন :

যেই দেশে যেই বাক্যে কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
সর্ব বাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বংগদেশি বাক্য কিবা যত ইতি বাণী ॥
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ ॥[২৩]

যারা মারফত জানে না, তারাই হিন্দু ভাষার লিপি ব্যবহারে কুণ্ঠাবোধ করে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি শুধু আরবি ভাষাই জানেন না, তিনি হিন্দুদের ভাষাসহ সব ভাষাই জানেন। সুতরাং বাংলা ভাষায় ইসলামের বাণী প্রচারে কোনো অসুবিধা নেই। তাই যেসব মোল্লা-মৌলভি মুসলমানদের বাংলা ভাষা প্রচলনে বিরোধিতা করছেন, তাঁদের উদ্দেশে তিনি লেখেন :

যে সবে বঙ্গতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশি ভাষে বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায় ॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গতে বসতি।
দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥[২৪]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে বাংলা ভাষা নিয়ে বাংলার মুসলমানদের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। একদিকে তারা ইসলামের প্রতি অনুরক্ত ছিল, অন্যদিকে স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি ছিল তাদের সুগভীর ভালোবাসা। ধর্ম ও ভাষা নিয়ে টানাপোড়েন বাঙালির ইতিহাসের কোনো নতুন উপাদান নয়। এই দ্বন্দ্বই বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রধান চালিকাশক্তি। বাংলা ছাড়া ভারতের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু বাংলায় এই দ্বন্দ্ব ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। এই তিন পক্ষ হলো হিন্দু, আশরাফ বা অভিজাত মুসলমান ও আতরাফ বা ধর্মান্তরিত সাধারণ মুসলমান সমাজ। ভাষা ও ধর্মের টানাপোড়েনকে জিইয়ে রেখেছে বাংলার আশরাফ মুসলমানরা। এরা ছিল প্রধানত বাইরে থেকে আসা মুসলমান অভিবাসীদের সন্তান। তাদের পূর্বপুরুষদের ফেলে আসা দেশগুলো ছিল তাদের হৃদয়ে দীপ্যমান। বাংলায় বাস করেও তারা বাঙালিসত্তা গ্রহণ করেনি। অথচ

সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলমানরা একই সঙ্গে তাদের বাঙালি ও ইসলামি সত্তার জন্য গর্বিত ছিলেন।

বাংলায় একই সঙ্গে দুটি দ্বন্দ্ব কাজ করে। একটি হলো হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব। বাংলার বেশির ভাগ মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে হিন্দুরা ছিল জমিদার, জমির মালিক ও মহাজন। ব্রিটিশ সরকারের সৃষ্ট চাকরি ও শিক্ষার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও হিন্দুরা দখল করে নেয়। তাই অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের দ্বন্দ্ব ছিল অনিবার্য। পক্ষান্তরে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বহিরাগত আশরাফ ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব ছিল না। আশরাফরা স্থানীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের তাদের চেয়ে হীন গণ্য করত। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে স্থানীয় জোতদারেরা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে ভাষা গুরুত্ব লাভ করে।

বাঙালি মুসলমানদের জীবনে ভাষা ও ধর্মের দ্বন্দ্ব সব সময়ই ছিল, তবে বিদেশি শাসনের প্রথম দিকে হিন্দুদের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে এ দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় মুসলমানরা আশরাফদের নেতৃত্ব মেনে নেয়। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর হিন্দু আধিপত্যের ভয় দূর হয়। সীমিত সম্পদের মধ্যে আশরাফ ও জোতদারদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘাত দেখা দেয়। এই পর্যায়ে ভাষা ও ধর্মের দ্বন্দ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মুখের ভাষা প্রাধান্য লাভ করে। পক্ষান্তরে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের সময় ধর্ম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাঙালি জাতীয়তা ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ পরস্পরবিরোধী ধারণা নয়, এরা একটি বহুমাত্রিক জাতীয়তাবাদের দুটি মাত্রা মাত্র।

একই ব্যক্তি কখনো ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেছে, আবার পরে সেই ব্যক্তিই অবলীলাক্রমে ভাষাগত জাতীয়তাবাদে আস্থা স্থাপন করেছে। এই প্রসঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর স্কুলজীবনের কথা স্মরণ করে তিনি তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* লিখেছেন, 'তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে আর নজর নেই। শুধু মুসলিম লীগ আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই।'[২৫] *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* তিনি আরও লিখেছেন, 'অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না, এটা আমি মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম।'[২৬] বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে সুস্পষ্টভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাষাগত ও ধর্মীয় এই দুই উপাদানের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বাঙালিদের 'আমাদের বাঙালি' ও 'আমাদের নয় বাঙালি' এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। 'আমাদের বাঙালি' (অর্থাৎ পূর্ব বাংলার বাঙালিদের) প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের বাঙালির

মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটি হলো আমরা মুসলমান, আর একটি হলো আমরা বাঙালি।' 'আমাদের বাঙালি' সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন, 'নিজকে এরা চেনে না। আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।' (পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮)

ভারতীয় কূটনীতিক জে এন দীক্ষিত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাজ করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে তিনি যথার্থই লিখেছেন :

> He was a fervent and articulate supporter of the Partition as well as the creation of Pakistan. He felt that it was the only way in which Muslims of Bengal could ensure for themselves a place under the Sun. He was not a religious extremist but was deeply convinced of the sanctity and relevance of the Islamic identity of Bengali Muslims who he felt would not get a fair deal from Hindu dominated India.[২৭]

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দীক্ষিত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণ করে তিনি আরও লিখেছেন :

> Mujib as the first head of government of Bangladesh was deeply imbued with a sense of Bangladesh's identity as a distinct socio-ethnic and political force in the sub-continent. He was clear about the ethno-cultural separateness of East Bengal from West Bengal (He emphasised the differences between a 'Bangal' and a 'Ghoti'). He was also clear in his mind that the national identity of newly created Bangladesh can be sustained only if the Muslim identity of Bangladeshis forms a primary ingredient in 'Bangladeshi nationalism'. This emphasis on Islamic identity of Bangladesh was not underpinned by any religious extremism or fanaticism or hostiity towards the minorities of Bangladesh.[২৮]

স্পষ্টতই বাঙালি জাতীয়তাবাদে দুটি উপাদান রয়েছে : ভাষাগত ও ধর্মীয়। যেহেতু পাকিস্তানে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের নিদারুণ ব্যর্থতার পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব, সেহেতু ভাষাগত উপাদানের প্রাধান্য রয়েছে, তবে ধর্মীয় উপাদান একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। এখানেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভয়। আবার কি ধর্মীয় উপাদানসমূহ প্রাধান্য লাভ করতে পারে? এ সম্ভাবনা যে একেবারে নেই, তা বলা ঠিক হবে না। অনেক তাত্ত্বিক মনে করেন যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখনো ইসলামি উপাদানসমূহ অতি সক্রিয় রয়েছে। ওলন্দাজ ঐতিহাসিক উইলেম ভনশেন্ডেল লিখেছেন, 'In many ways the Bangladesh state was the Pakistan state by another name',[২৯] তবে অনেক বাংলাদেশির পাকিস্তানপ্রীতি সর্বার্থে ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন নয়। বরং তাদের ভারত-বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক শুধু ধর্মীয়

উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ভারত বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বড় রাষ্ট্র। বাংলাদেশের দিক থেকে ভারতের প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্তকে আধিপত্যবাদের প্রয়াস হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। (আধিপত্যবাদ সম্পর্কে এ প্রবন্ধের পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে)। সেই দিক থেকে অনেক বিষয়েই পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের অবস্থান অভিন্ন। এতে ধর্মের প্রভাব খুবই কম। তবে এ ধরনের ভারতবিদ্বেষীরা ইসলাম-পসন্দ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একজোটে কাজ করে। তাই অনেক সময় ইসলাম-পসন্দ দলগুলোকে শক্তিশালী মনে হয়। তিনটি কারণে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদে ইসলামের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

প্রথমত ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঙালিদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস বর্বরতা বাঙালিদের ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি মোহ চিরতরে ঘুচিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে যখন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা দানা বাঁধে তখন এখানে মুসলমানরা ছিল শোষিত আর বর্ণহিন্দুরা ছিল শোষক। সাম্প্রদায়িকতার ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ভারতে চলে যায়। এই অভিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল বর্ণহিন্দু, যারা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের শোষণ করেছে। নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা থেকে যায়, তারা নিজেরা ছিল শোষিত। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে আজকের বাংলাদেশে অধিকাংশ শোষকই মুসলমান। এর ফলে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশে তলোয়ারের জোরে কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পথ ও মত নিয়ে বিভিন্নতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিদ্যমান ধর্মগুলোর মধ্যে একটি বড় সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান সব ধর্মই মানুষ স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে। ধর্ম এখানে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশে প্রচলিত ধর্মগুলো ধ্রুপদি হিন্দুধর্ম হতে ভিন্ন। অবশ্যই ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম ও আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস শাশ্বত হিন্দুধর্মসম্মত নয়। এমনকি যারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করে, তাদের ধর্মবিশ্বাসও নানাবিধ তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা দূষিত। এসব বিশ্বাস যারা পছন্দ করেছে, তারাই হচ্ছে বাংলাদেশি হিন্দুদের সিংহভাগ। দীর্ঘদিন ধরে একটি উন্মুক্ত পরিবেশে বিভিন্ন মত ও পথের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক উইলেম ভনশেন্ডেল যথার্থই লিখেছেন :

> Ideas, peoples and goods have met and mingled at this major crossroads since time immemorial, leaving innumerable cultutral, economic and gentic traces and creating a distinct regional culture. It

is frrom such mingling and cross fertilization that modern Bangladeshi identities have emerged—never monolithic, often conflicted and in perpetual flux.[৩০]

বাংলাদেশের ভেতরে তাই ধর্মীয় উপাদানসমূহের শক্তি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদে তাই ধর্মের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার কথা।

তবু দুটি শঙ্কার কারণ রয়ে গেছে। প্রথমত, বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সকল ধর্মের মধ্যে মৌলবাদী চেতনা পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে মৌলবাদী চেতনার প্রসার লক্ষণীয়। বাইরে থেকে মৌলবাদ বাংলাদেশে তরুণ মুসলমানদের আকর্ষণ করতে পারে। তবে বাংলাদেশে ভাষা ও ধর্মনিরপেক্ষ উপাদানসমূহ এত প্রবল যে শুধু বৈদেশিক প্রভাব জাতীয়তাবাদী চেতনায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করলেও, ইতিহাসের মূলধারাকে প্রভাবান্বিত করার আশঙ্কা কম।

দ্বিতীয় শঙ্কার কারণ ভারত। ভারত বাংলাদেশের চরম দুর্দিনে সমর্থন দিয়েছে। এখনো অনেক ক্ষেত্রে ভারতের সমর্থন প্রয়োজন। তবু বাংলাদেশের জনগণ ভারতের ওপর আস্থা বা ভরসা রাখতে পারে না। এর কারণ, ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারত অনেক বড়। ছোট দেশগুলো সব সময়ই বড় দেশকে ভয় করে। এই ভয় ছড়িয়ে পড়লে তা সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। পরবর্তী খণ্ডে আধিপত্যবাদ নিয়ে তাই আলোচনা করা হবে।

## ২.৪ বাংলাদেশে আধিপত্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের তুলনায় অনেক বেশি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। 'জিন্দাবাদ' তকবির না দিলেও এ জাতীয়তাবাদ টিকে থাকবে। জিন্নাহর পাকিস্তান ও গান্ধীর ভারতের তুলনায় শেখ মুজিবের বাংলাদেশ অনেক বেশি টেকসই। তবু আগামী দিনগুলোতে একে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। প্রথম সমস্যা হলো আধিপত্যবাদ, যা জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন সফল হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়ন এ জাতীয়তাবাদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে সব রাষ্ট্র সমান। বাস্তবে কিন্তু এ সমতার অস্তিত্ব দেখা যায় না। জর্জ অরওয়েল বিদ্রূপ করে জন্তুদের জগতে সমতা নিয়ে যা লিখেছেন, তা রাষ্ট্রের সমতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি লিখেছেন, 'All animals are equal but some animals are more equal than others.' পৃথিবীতে যে প্রায় ২০০ দেশ,

তারা আইনগতভাবে সমমর্যাদার অধিকারী হলেও বাস্তবে তাদের ক্ষমতার মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। দুই ধরনের রাষ্ট্রের আধিপত্যের ক্ষমতা রয়েছে। প্রথমত পুঁজিবাদী বিকাশের শীর্ষে অবস্থানকারী দেশ বা দেশগুলো। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে প্রধান আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র। এর আধিপত্যবাদী ক্ষমতা শুধু অর্থনৈতিক আধিপত্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাংস্কৃতিক আধিপত্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই তিন ধরনের আধিপত্যকে নিশ্চিত করে সামরিক ক্ষমতা। যেহেতু পৃথিবীর সব অঞ্চলের দেশই এ ধরনের আধিপত্যবাদের শিকার, সেহেতু এ ধরনের নিষ্পেষণ সরাসরি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তত প্রভাবিত করে না। দ্বিতীয়ত, অনেক অঞ্চলেই আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র রয়েছে। আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অনেক বেশি সোচ্চার।

বাংলাদেশ অঞ্চলে তিনটি আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তি রয়েছে। প্রথমত রয়েছে ইসলামি আধিপত্যবাদ। প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তান এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে কাজে লাগায়। তবে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামের নামে পাকিস্তানের আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

দ্বিতীয়ত, চীন এশিয়াতে একটি আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তি। বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের কোনো সরাসরি সীমান্ত নেই। সামরিক আধিপত্য তাই সুদৃঢ় নয়। যদিও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, তবু ভাষাগত ভিন্নতার ফলে সাংস্কৃতিক প্রভাবও সীমিত। তবে চীনের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অর্জন মানুষের ইতিহাসে তুলনাহীন। চীন বর্তমানে বিশ্বের একটি বড় অর্থনীতি। কাজেই চীনের অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের প্রভাব বাংলাদেশের ওপর অবশ্যই পড়বে। তবে এ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়। একে প্রতিহত করবে মার্কিন ও ভারতীয় অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিমান আঞ্চলিক আধিপত্যবাদ হচ্ছে ভারতীয় আধিপত্যবাদ। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় উদার কূটনীতিবিদ জে এন দীক্ষিত যথার্থই লিখেছেন :

> The point to be remembered is that India looms large in many ways in Bangladesh's domestic politics and foreign policy. India is too overarching and too proximate to be ignored. It is also too proximate and assymetrical identity to have a close relationhip with. This is the Bangladesh.[৩১]

সৌহার্দ্যে ও প্রতিযোগিতায়, ভালোবাসায় ও বিদ্বেষে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অনন্য। অভিন্ন জনগোষ্ঠী, একই ভাষা, ধর্মের বন্ধন ও সামগ্রিক ইতিহাসজুড়ে

পারস্পরিক লেনদেন এদের নিবিড় বাঁধনে বেঁধেছে। অথচ আজ দুটি দেশ কাঁটাতারের বেড়ায় বিভক্ত। কয়েক দশক আগে এরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়েছে। আজ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে প্রচণ্ড বাঙালিবিদ্বেষ দৃশ্যমান। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুফলও দেখা যায়। প্রায় ৬৭ বছর পর ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়েছে। ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবু চারটি প্রাচীন সমস্যার আশু কোনো সমাধান দেখা যাচ্ছে না :

**পানিবণ্টন সমস্যা :** ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় যথার্থই লিখেছেন, 'বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাংলার প্রাণ; ইহারাই বাংলাকে গড়িয়াছে, বাংলার আকৃতি প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদনদীগুলিই বাংলার আশীর্বাদ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনো কখনো বাংলার অভিশাপও।'[৩২] বাংলাদেশের সব বড় নদীই আন্তর্জাতিক। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে; মিয়ানমারের সঙ্গে রয়েছে চারটি। তবে বাংলাদেশ মূলত ভারত থেকে প্রবাহিত অভিন্ন নদী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুদূর অতীত থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত এই নদীসমূহের পানিবণ্টনের কোনো সমস্যা ছিল না। সমস্যা দেখা দেয় ভারত বিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে। এর সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পানির চাহিদাও অনেক বেড়ে যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নও পানির চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়। উজানের দেশ ভারত ভাটির দেশের চাহিদা বিবেচনায় না নিয়ে পানি প্রত্যাহার শুরু করে। এতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর পানি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। গঙ্গা নদীর পানিবণ্টন নিয়ে একটি সাময়িক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও অন্য নদীর পানিবণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। দুটো কারণে পানিবণ্টন সমস্যার সমাধান সহজ হবে না। প্রথমত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পানিবণ্টনের প্রশ্নে জনসমর্থন প্রয়োজন। এ ধরনের সমর্থন সৃষ্টি করা অত্যন্ত শক্ত। ভারতের ভেতরে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে নদীর পানির বিভাজন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া যায়নি। তাই বাংলাদেশের সঙ্গে পানিবণ্টনের কোনো চটজলদি সমাধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, ভারতের জাতীয় পানি পরিকল্পনা অববাহিকাভিত্তিক পানি ব্যবহারে বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে, বিজেপি নেতৃত্ব মনে করে, যেসব অঞ্চলে উদ্বৃত্ত পানি রয়েছে, সে পানি অববাহিকা-নির্বিশেষে তাদের পানিঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণের অধিকার রয়েছে। তাই তারা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার উদ্বৃত্ত জলরাশি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরের পক্ষপাতী। এর ফলে বাংলাদেশে তীব্র

পানিসংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। তাই বাংলাদেশে ভারত সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

**গরু ও চোরাচালান :** বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী শুল্কের প্রাচীর ও অশুল্কের বাধা কমে যাওয়াতে চোরাচালানের হার কমে গেছে। বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চোরাচালানের হার হ্রাস পেয়েছে। তবু বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যে এখনো চোরাচালানের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। এর একটি বড় কারণ হলো, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে গরু রপ্তানি করে না। অথচ ভারতের কৃষকেরা চায় বুড়ো, অকেজো ও কম উৎপাদনশীল গো-সম্পদ রপ্তানি করতে। বাংলাদেশের ভোক্তারা আমিষের চাহিদা মেটানোর জন্য উপযুক্ত দাম দিয়ে প্রতিবেশী দেশ থেকে গরু কিনতে চায়। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে গরু রপ্তানি বন্ধ থাকায় ভারত থেকে সব গরু চোরাচালানের মাধ্যমে আসে। সিএনবিসির একটি প্রতিবেদন থেকে (২ জুলাই ২০১৫) দেখা যায়, ভারত থেকে প্রায় ২০ লাখ গরু-মহিষ বাংলাদেশে চোরাচালান করা হয়। এর মূল্য প্রায় ৬৮ কোটি ডলার বা ৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এ ছাড়া ভারত থেকে ফেনসিডিল নামক মাদকদ্রব্য আসে। প্রতিবছরই কিছু হিন্দু পরিবার ভারতে বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে তাদের সব সম্পদ ভারতে পাচার করে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশকে চোরাচালান বাবদ দেড় থেকে দুই বিলিয়ন ডলার অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিশোধ করতে হয়। ভারতে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা অত্যন্ত সীমিত। তাই এই পুরো অর্থ, যার পরিমাণ ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা, স্বর্ণ চোরাচালানের মাধ্যমে শোধ করতে হয়। সামগ্রিকভাবে আমদানি-রপ্তানি মিলিয়ে চোরাচালানের পরিমাণ ২৪ হাজার কোটি হতে ৩০ হাজার কোটি। এই বিশাল চোরাচালানের উপকারভোগীরা কখনো বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে দেবে না।

**মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতা :** সম্প্রতি বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এসব চুক্তিকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে অনেকেই মনে করেন। পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাধা দূর হলেও কাঁটাতারের বেড়া এবং জটিল ভিসা-ব্যবস্থা এই দুই দেশের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছে। সীমান্তের অপর পারে বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনটি ভয় রয়েছে। ভারতীয়দের মতে, ১৯৫০ থেকে ২০০১ সময়কালে ১.২ থেকে ১.৭

কোটি বাংলাদেশি ভারতে অভিবাসী হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যসমূহে স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলোর সংখ্যাধিক্য হুমকির সম্মুখীন। আসামে সাত দশকের বেশি সময়জুড়ে বাঙাল খেদা আন্দোলন চলছে। দ্বিতীয়ত ভয় করা হচ্ছে যে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে। উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রে এক মিটার পানি বাড়লে বাংলাদেশের এক-পঞ্চমাংশ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এর ফলে প্রায় তিন কোটি লোক শরণার্থী হয়ে পড়তে পারে। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতে চলে যেতে চেষ্টা করবে। কাজেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মোট ৪ হাজার ৯৬ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ২ হাজার ৭৩৫ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কিছু অংশ ছাড়া ভারত আর কোনো প্রতিবেশী দেশের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেনি। শুধু কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেই ভারত ক্ষান্ত হয়নি; ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফকে চরম ব্যবস্থা নেওয়ার কর্তৃত্ব দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিএসএফকে ট্রিগার হ্যাপি বা বন্দুকের ঘোড়াপ্রিয় বলে বর্ণনা করেছে। ২০০০ থেকে ২০১০ সময়কালে প্রায় এক হাজার বাংলাদেশি বিএসএফের গুলিতে মারা গেছে। গড়ে প্রতি চার দিনে একজন বাংলাদেশি মারা যায়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে বেআইনি অভিবাসীরা নির্যাতনের শিকারও হন। এই পরিস্থিতি দীর্ঘ সময় ধরে সৃষ্টি হয়েছে। এর কোনো চটজলদি সমাধান নেই।

**বাণিজ্য ঘাটতি ও বিনিয়োগ:** এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ ও পণ্য রপ্তানির সমস্যা। ২০১৫-১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে ভারত থেকে বাংলাদেশে আমদানির মূল্য ছিল ৫.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করে মাত্র ৬৮৯.৬ মিলিয়ন ডলার। এ বছরে তাই বাণিজ্যঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪.৭৬ বিলিয়ন ডলার। ২০১৩-১৪ সালে এই ঘাটতি ছিল ৫.৫৭ বিলিয়ন ডলার। (*কালের কণ্ঠ*, ২৪ অক্টোবর ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫)। গত দুই বছরে আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ঘাটতি পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হলেও বাণিজ্যঘাটতি তুলে দিতে হলে বাংলাদেশকে ভারতে রপ্তানি কমপক্ষে ৯০০ শতাংশ বাড়াতে হবে। এ ধরনের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

বাণিজ্যঘাটতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ বৃদ্ধিজনিত সমস্যা। এই সমস্যাই হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশের আজকের ও আগামী দিনের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যা শুধু বাংলাদেশিদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না,

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাও এ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে *দেশ* একটি বহুলপ্রচারিত পাক্ষিক। ২০১৫ সালে মোদির বাংলাদেশ সফর সম্পর্কে পত্রিকাটির ১৭ জুন সংখ্যায় 'মাছ নিয়ে গেছে চিলে' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। নিচে সম্পাদকীয়টির শেষ অংশটি উদ্ধৃত হলো :

> আবার পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যুৎ কেনার জন্য বাংলাদেশকে ভারতের পক্ষ থেকে সামান্য সুদে দু'শো কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন মোদী। অনেকের মতে, দূর পথে যাবে এ ঋণ। টাকা আদতে চলে যাবে আদানি-অম্বানিদেরই পকেটে। কেননা তারাই হবে সেই বেসরকারি সংস্থা, যাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনতে হবে। দেশের স্বার্থ সম্পর্কে মোদী নিশ্চয়ই সচেতন, তাঁর দেশপ্রেম নিয়েও কোনো প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু নিজের রাজ্যের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর এই পরোক্ষ উদ্যোগ চোখে পড়ার মতো। তবে এই সফরের সাফল্যে তৃপ্তির হাসিটি মোদী কিংবা হাসিনা হাসেননি। শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চিম বঙ্গের বন্ধ্যাত্ব ঘুচছে না দেখে মমতার হাসি এমনিতেই ঘুচে গেছে। অতএব তিনিও হাসতে পারেননি। তাহলে কে? বরাতের ক্ষীরটুকু খেয়ে শেষ হাসিটি হেসেছেন দু'জন—আদানি ও আম্বানি।[৩৩]

যে ধরনের লেনদেন শুধু আদানি ও অম্বানির মুখে হাসি ফোটায় অথচ মোদি, মমতা বা হাসিনাকে হাসায় না, সেসব ব্যবসা কতটুকু টেকসই হবে, সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ এ ধরনের অসম সম্পর্ক নিয়ে সজাগ না থাকলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে নেতিবাচক প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের ভাগ্যবিধাতারা ভারতীয় কূটনীতিবিদ জে এন দীক্ষিতের নিম্নলিখিত পরামর্শটি স্মরণ রাখতে পারেন :

> The approach to economic, scientific and cultural cooperation with India would be selective and subject to constant caution about not allowing India to become excessively influential in Bangladesh.
> This is both a legitimate and logical orientation to which India should adjust and be responsive.[৩৪]

## ২.৫ বিশ্বায়ন ও জাতীয়তাবাদ : একদিন বাঙালি ছিলাম রে

নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ধারণার পরিবেশে জাতীয়তাবাদের জন্ম। কিন্তু বিশ্বায়নের পরিবেশে আজকের দুনিয়াতে নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ধারণা অচল হয়ে পড়েছে। নিজ দেশে অপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার একসময়ে ছিল অকল্পনীয়। আজ তা সম্ভব। বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল চূড়ান্ত। আজ অনেক ক্ষমতা চলে গিয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে। জাতিসংঘের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা

তহবিলের নজরদারি বেড়েছে। পরিবেশ থেকে স্বাস্থ্য, পরিবহন থেকে বেআইনি মুদ্রা পাচার—জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক খবরদারি সম্প্রসারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিকতার চাপে রাষ্ট্রের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জাপানি লেখক কেনেচি ওয়ামির ভাষায়, জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। সমাজতত্ত্ববিদ অ্যান্থনি গিডেন্স তাই লিখেছেন, 'Nations have lost most of the sovereignty they once had, and politicians have lost most of their capability to influence events।'[৩৫] অবশ্য সার্বভৌমত্বের অবক্ষয় সর্বত্র একই হারে হয়নি। যে দেশে বিশ্বায়নের মাত্রা বেশি, সেখানে সার্বভৌমত্বের অবক্ষয়ের পরিমাণও বেশি।

বিশ্বায়ন শুধু রাষ্ট্রের ক্ষমতা ওপরের দিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যায়নি, বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্র অনেক ক্ষমতা নিচের দিকেও হারাচ্ছে। মানুষ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্রীড়নক হতে চায় না। তারা রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে চায়। বিশ্বব্যাপী তাই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দাবি উঠছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে জাতিরাষ্ট্র ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতাও জাতিরাষ্ট্রসমূহের নেই। মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ ডেনিয়েল বেল যথার্থই লিখেছেন, বড় সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিরাষ্ট্র ছোট, আর মানুষের ছোট সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য বেমানানভাবে বড়।

এই পরিস্থিতিতে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানসমূহ 'খোলস প্রতিষ্ঠান' বা 'Shell institution'-এ পরিণত হয়েছে। ভেতরে পরিবর্তন চলছে, কিন্তু বাইরের খোলস অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। অ্যান্থনি গিডেন্স এই পরিস্থিতিকে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

> We continue to talk of the nation, the family, work, tradition, nature, as if they were all the same as in the past. They are not. The outer shell remains, but inside they have changed ~ and this is happening not only in the USA, Britain or France, but almost everywhere. They are what I call Shell institutions. They are institutioins that have become inadequate to the tasks they are all called upon to perfonn.[৩৬]

রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটছে। তবে পরিবর্তনের হার সর্বত্র সমান নয়। উন্নত দেশসমূহে এই পরিবর্তন অনেক ব্যাপক; উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ পরিবর্তন অনেক শ্লথ।

তবে তৃণমূল পর্যায়ে সর্বত্রই বিশ্বায়নের বিপক্ষে বিক্ষোভ দানা বাঁধছে। মানুষ অস্বস্তিকর দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। অনেক মানুষের কাছেই মনে হচ্ছে যেন তারা পরিচিত ভুবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন। এই সুরই

প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাংলাদেশের লোকগীতিতে :

একতারা বাজাইও না
দোতারা বাজাইও না
একতারা বাজাইও না, ঢাকঢোল বাজাইয়ো না
গিটার আর ব্যাঞ্জো বাজাও রে
একতারা বাজাইলে মনে পইড়া যায়
একদিন বাঙালি ছিলাম রে
একদিন বাঙালি ছিলাম রে।

বিশ্বায়নের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও এই চাপা ক্ষোভ স্থানীয় সত্তাকে অদূর ভবিষ্যতে বাঁচিয়ে রাখবে।

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের বিকাশের এই সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় একটি প্রলম্বিত প্রক্রিয়া। ইতিহাসের অনেক বাঁক ও মোড় অতিক্রম করে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের নিম্নলিখিত প্রবণতাসমূহ নীতিনির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- বাংলাদেশের আবির্ভাব আকস্মিক হলেও কাকতালীয় নয়। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এ জাতীয়তাবাদ সুস্থিত এবং এর সহজে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। বস্তুত এই উপমহাদেশে তিনটি জাতিরাষ্ট্র রয়েছে : পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ। এর মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র, যার পরিবর্তনের সম্ভাবনা ভারত কিংবা পাকিস্তানের চেয়ে অনেক কম।
- বাংলা ভাষা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি। তবু সব বাংলাভাষী নিয়ে দক্ষিণ এশিয়াতে একটি বাঙালি রাষ্ট্রের উদ্ভবের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। এর প্রধান কারণ, পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা তাদের হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং তারা কোনোমতেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাজি হবেন না। ১৯৪৭ সালে বাংলাকে ভাগ করা হবে কি না, এ বিষয়ে যখন বাংলা বিধানসভায় ভোট নেওয়া হয়েছিল, তখন হিন্দু বিধায়কেরা সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।
- বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র। ভারতের রাজনীতিবিদেরা কখনো এত বিপুল পরিমাণ মুসলমান নাগরিককে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হবেন না। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদে ধর্ম একটি গৌণ উপাদান। এমনিতে বাংলাদেশের ইতিহাসে উগ্র ধর্মীয় চেতনা কখনো প্রাধান্য লাভ করেনি। বাংলাদেশের ধর্মীয় চেতনা সব সময়ই ছিল মানবতাবাদী।

● জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে নিজস্ব সত্তাকে রক্ষা করার জন্য। জাতীয়তাবাদী চেতনা তাই সব সময়ে আধিপত্যবাদ-বিরোধী। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের জন্য ভারতীয় আধিপত্যবাদ একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভারত একটি বন্ধুরাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রচুর সাহায্য করেছে। তবে ভারত বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বড়। যদি অসতর্কভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। যেহেতু ভারত একটি হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র, সেহেতু ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ সংগ্রাম পুনরুজ্জীবিত ইসলামি চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। এ সম্পর্কে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

## পাদটীকা

১. Maulana Abul Kalam Azad. *India Wins Freedom*. Hyderabad: Orient Longmans,1988.

২. Ishtiaque Husain Qureshi. *The Struggle for Pakistan*. Karachi: University of Karachi, 1965. 248-262.

৩. Maulana Abul Kalam Azad. *প্রাগুক্ত, ১৯৮*

৪. Maulana Abul Kalam Azad. *প্রাগুক্ত, ১৯৮*

৫. Maulana Abul Kalam Azad. *প্রাগুক্ত, ২৫২*

৬. Pamela Hicks. *Daughter of the Empire*, London: Weidenfeld and Nicolson, 2012.

৭. Stanley Wolpert. *Nehru, A Tryst With Destiny*. New Delhi and Oxford: Oxford University Press 1996.

৮. Akbar S. Ahmed. *Jinnah, Pakistan and Islamic Identity*. London and New York:Routledge, 1997.

৯. Akbar S. Ahmed. *প্রাগুক্ত, ১৪১*

১০. Maulana Abul Kalam Azad. *প্রাগুক্ত, ১৯৭-১৯৮*

১১. Maulana Abul Kalam Azad. *প্রাগুক্ত, ১৮২-১৮৩*

১২. Collins, Larry and Lapierre Dominique 1975. *Freedom at Midnight*. New York. Simon and Schuester. 1998

১৩. Choudhary Rahmat Ali. Now or Never. In G. Allana. *Pakistan Movement Historical Records*. Karachi: University of Karachi,1969,104-110.

১৪. Ishtiaq Husain Qureshi. 1968 *প্রাগুক্ত, ১২০-১২১*

১৫. Ishtiaq Husain Qureshi. 1968 *প্রাগুক্ত*

১৬. Benedict Anderson. 1983. *Imagined Communities*. London. Verses
১৭. Lawrence Ziring 1992. *Bangladesh, from Mujib to Ershad*. Dhaka. University Press Ltd.
১৮. Lawrence Ziring, *প্রাগুক্ত*
১৯. গোলাম মুরশিদ। ২০০৬। হাজার *বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা : অবসর
২০. মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৫৭। মুসলিম *বাংলা সাহিত্য।* ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ৭৫
২১. মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৫৭, প্রাগুক্ত
২২. মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৫৭, প্রাগুক্ত, ১৯৮
২৩. মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৫৭, প্রাগুক্ত, ৬৭
২৪. মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৫৭, প্রাগুক্ত
২৫. শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১৪। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ঢাকা*: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৫
২৬. শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১৪। প্রাগুক্ত, ২১-২২
২৭. J. N. Dixit. 1999. *Liberation and Beyond*. Dhaka: University Press Ltd. ২২০
২৮. J. N. Dixit. 1999. *প্রাগুক্ত*, ২২৩-২২৪
২৯. Willem Van Shendel. 2009. *A History of Bangladesh*. New Delhi, Cambridge University Press, ২৬৮
৩০. Willem Van Shendel. 2009. *প্রাগুক্ত*, ২৬৮
৩১. J. N. Dixit. 1999. *প্রাগুক্ত*, ২৮১
৩২. নীহাররঞ্জন রায়। ১৪০০ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ) *বাঙ্গালীর ইতিহাস।* আদিপর্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং
৩৩. *দেশ*, ১৭ জুন ২০১৫
৩৪. J. N. Dixit. 1999. *প্রাগুক্ত*
৩৫. Anthory Giddens, *প্রাগুক্ত*
৩৬. Anthory Giddens, *প্রাগুক্ত*

৩

# ধর্মনিরপেক্ষতা : কাঁচি হাতে মহাপুরুষ কি পারবেন?

## ৩.১ প্রস্তাবনা

সৈয়দ মুজতবা আলীর বয়স যখন ২৭, তখন 'নেড়ে' শীর্ষক তাঁর লেখা গল্প একটি অপরিচিত সাময়িকীতে ছাপা হয়। এরপর রচনাটি প্রায় হারিয়ে যায়। ২০০৪ সালে *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর* ৭ম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে গল্পটি আবার প্রকাশিত হয়।[১] ডক্টর আলী ৩২ বছর বয়সে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম ছিল 'The Origin of the Khojahs and Their Religious Life Today'।[২] এই অভিসন্দর্ভে ইসমাইলিদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি অনেক মৌলিক অবদান রেখেছেন। তবু আজ বিশ্লেষণ করলে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে চার পৃষ্ঠার গল্পটি তাঁর প্রায় ১১২ পৃষ্ঠার অভিসন্দর্ভের চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত মনে হয়।

সংক্ষেপে গল্পটি নিম্নরূপ : আবদুল রসুল (যার বাংলা অর্থ হলো প্রেরিত পুরুষের ভৃত্য) নামে এক যুবক পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চল থেকে কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য চাঁদপুরে স্টিমারে চাপে। অনেক কষ্টে সে ট্রেন থেকে সরাসরি দৌড়ে স্টিমারে এসে কোনোমতে দোতলার সিঁড়ির কাছে একটি আসন পেতে বসে। এ সময়ে দেখতে পেল যে একটি প্রৌঢ় হিন্দু দম্পতি ওপরে উঠে আসছেন। স্টিমারে দোতলায় ওঠার পর তাঁদের খেয়াল হলো যে তাঁদের কুলি ও মূল্যবান গয়নার বাক্সসহ তাঁদের মাল আসেনি। রসুল সাহেব পরিবারটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তিনি জাহাজ থেকে নেমে হারানো মাল উদ্ধার করে নিজের কাঁধে বয়ে জাহাজে তুলে আনলেন। তাঁর দখল করা স্থান তাঁদের ছেড়ে দিলেন। এদিকে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বিভিন্ন বিষয়

নিয়ে মতামত ব্যক্ত করে চলেছেন। একপর্যায়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 'কিন্তু আমি ছোঁয়াছুঁয়ি মানি নে। ওতে তো আর কোনো খরচ নেই। কেনই বা মানব? কেন মুচি মুসলমান কি মানুষ নয়? ওদের সঙ্গে বসে কেন খাব না? খুব খাব—আলবৎ খাব।' এর মধ্যে দম্পতিটি জলখাবার বের করলেন। আবদুল রসুল সেখান থেকে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ভদ্রলোক তাকে ছাড়লেন না। 'খান' বলে টপ করে একটি রসগোল্লা জোর করে তাকে খাইয়ে দিলেন। ঘণ্টা খানেক পর ভদ্রলোকের গন্তব্যস্থল চলে আসে। এর পরের ঘটনাটি আলী সাহেবের ভাষাতেই বর্ণনা করছি :

> "বাবুটি পারে নাবতে যাবেন এমন সময় ফিরে বললেন,...চিঠিপত্র লিখবেন আপনার ঠিকানা?—তাই তা নামই জানা হলো না। 'আপনার নাম?'
>
> 'আবদুল রসুল।'
>
> থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কি?'
>
> 'আবদুল রসুল।'
>
> 'তুমি মুসলমান?'
>
> আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কেন?'
>
> ভদ্রলোক মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'কেন?'—কেন জাতটা মারলে? খাবার সময়ে বললে না কেন তুমি মুসলমান? উল্লুক।'
>
> আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আপনি যে বললেন, জাত মানেন না!'
>
> তিনি তেড়ে এসে আমার নাকের কাছে হাত নেড়ে বললেন, 'মানিনে, খুব মানি। আলবৎ মানি। সাত পুরুষ মেনে এসেছেন আর আমি মানিনে! আবার প্রাচ্ছিত্তির ফেরে ফেললে! হতভাগা— নেড়ে!"

এই গল্পের মাধ্যমে সৈয়দ মুজতবা আলী তুলে ধরেছেন, মানুষ ধর্ম সম্পর্কে মুখে যা কিছু বলে, তা অন্তরে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। মুখে মুখে অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি কপচায়; আসলে অন্তরে তারা ধর্মান্ধ। একজন প্রবীণ হিন্দু ভদ্রলোকের কাহিনি বর্ণনা করে তিনি এ সত্যটিই গল্পের আকারে পেশ করেছেন। তবে এ ধরনের কপটতা শুধু হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একই ধরনের মনোবৃত্তি মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তপন রায় চৌধুরী একজন জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ আলিম সম্পর্কে নিম্নলিখিত কাহিনিটি লিপিবদ্ধ করেছেন :

> গল্প শুনতাম খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নায়ক দেওবন্দ থেকে পাস করা আলিম স্থানীয় এক মৌলবী সাহেব দেশ তথা খলিফাভক্তির দায়ে দীর্ঘদিন জেল খেটে কারামুক্ত হওয়ার পর রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে বরিশাল টাউন হলে সাম্প্রদায়িক প্রীতি প্রচার করে এক বক্তৃতা করলেন: 'উফারে নীল আসমান, নিচে সবুজ ঘাস, ইয়ার নিচে (অর্থাৎ আসমান এবং ঘাস উভয়েরই

নিচে) হিন্দু মুসলমান দুই ভাই। দোনোতে কোনো ফারাক নেই, দোনোতে কোনো কাজিয়া নেই। হারামজাদা ফিরিঙ্গী আইয়া দোনোর ভিতর ফাসাদ বাধাইছে। ভাই সকল শয়তানের ফান্দে পা দিয়া আখের খুইয়াবেন না, আল্লাহর এই না-লায়েক বান্দার এই আরজি।' 'রাম-রহিম না জুদা কর ভাই' গান দিয়ে সভা শেষ হলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। মৌলবী সাহেব বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে নেমে তাঁর পাদুকাজোড়া আর খুঁজে পান না। তখন তাঁর উত্তেজিত স্বগতোক্তি: 'জোতাজোড়া কই গ্যালে? লালা লাজপত রায় আইলেন, লালা মহাত্মা গান্ধী আইলেন, লালা দেশবন্ধু আইলেন কারও তো জোতা হারাইয়ে না। হুধা (শুধু) আমারই জোতা হারাইলে ক্যান? লইলে কেডা, লইলে কেডা? হেঁদু হালায়ই নেছে।'[৩]

ওপরে বর্ণিত দুটো গল্প থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয়, হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে বড় কোনো ফারাক নেই। উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। অথচ অন্তরে একে অপরকে ঘৃণা করে। আবার অনেকের মধ্যে একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা পাশাপাশি বিরাজ করতে পারে।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে অনেকের অভিজ্ঞতা জটিল। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস ছিল অটল। তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* তিনি দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথম ঘটনাটি বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। এত বিস্তারিতভাবে লেখার কারণ হয়তো ছিল যে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের প্রথম জেল খাটার ঘটনাটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন এবং এর যাতে অপব্যাখ্যা না হয়, সে জন্য সতর্কতার সঙ্গে পুরো ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যটি (উদ্ধৃতির জন্য বেমানান বড় হলেও) পুরোপুরি নিচে উদ্ধৃত করা হলো:

> এই সময়ে একটি ঘটনা হয়ে গেল। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটু আড়াআড়ি চলছিল। গোপালগঞ্জ শহরের আশে পাশেও হিন্দু গ্রাম ছিল। দু একজন মুসলমানের ওপর অত্যাচারও হল। আবদুল মালেক নামে আমার এক সহপাঠী ছিল। একদিন সন্ধ্যায়, আমার মনে হয় মার্চ বা এপ্রিল মাস হবে, আমি ফুটবল মাঠ থেকে খেলে বাড়িতে এসেছি; আমাকে খন্দকার শামসুল হক ওরফে বাসু মিয়া মোক্তার সাহেব (পরে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন) ডেকে বললেন, মালেককে হিন্দু মহাসভা সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে মারপিট করছে। যদি পার একবার যাও। তোমার সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব আছে বলে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আস। আমি আর দেরি না করে কয়েকজন ছাত্র ডেকে নিয়ে ওদের ওখানে যাই এবং অনুরোধ করি ওকে ছেড়ে দিতে। রমাপদ দত্ত নামে

এক ভদ্রলোক আমাকে দেখেই গাল দিয়ে বসল। আমিও তাঁর কথায় প্রতিবাদ করলাম এবং আমার দলের ছেলেদের খবর দিতে বললাম। এর মধ্যে রমাপদরা থানায় খবর দিয়েছে। তিনজন পুলিশ এসে হাজির হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, ওকে ছেড়ে দিতে হবে, না হলে কেড়ে নেব। আমার মামা শেখ সিরাজুল হক (একই বংশের) তখন হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করতেন। তিনি আমার মা ও বাবার চাচাতো ভাই। নারায়ণগঞ্জে আমার এক মামা ব্যবসা করেন, তাঁর নাম শেখ জাফর সাদেক। তাঁর বড় ভাই মেট্রিক পাস করেই মারা যান। আমি খবর দিয়েছি শুনে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছেন। এর মধ্যেই আমাদের সাথে মারপিট শুরু হয়ে গেছে। দুই পক্ষে ভীষণ মারপিট হয়। আমরা দরজা ভেঙে মালেককে কেড়ে নিয়ে চলে আসি।

শহরে খুব উত্তেজনা। আমাকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। সেদিন রবিবার। আব্বা বাড়ি গিয়েছিলেন। পরদিন ভোরবেলায় আব্বা আসবেন। বাড়ি গোপালগঞ্জ থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। আব্বা শনিবার বাড়ি যেতেন আর সোমবার ফিরে আসতেন, নিজেরই নৌকা ছিল। হিন্দু নেতারা রাতে বসে হিন্দু অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে একটা মামলা দায়ের করল। হিন্দু নেতারা থানায় বসে এজাহার ঠিক করে দিলেন। তাতে খন্দকার শামসুল হক মোক্তার সাহেব হুকুমের আসামি। আমি খুন করার চেষ্টা করেছি, লুটপাট দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়েছি। ভোরবেলায় আমার মামা, মোক্তার সাহেব, খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ এমএলএ সাহেবের মুহুরি জহুর শেখ, আমার বাড়ির কাছের বিশেষ বন্ধু শেখ নুরুল হক ওরফে মানিক মিয়া, সৈয়দ আলী খন্দকার, আমার সহপাঠী আবদুল মালেক এবং অনেক ছাত্রের নাম এজাহারে দেয়া হয়েছিল। কোনো গণ্যমান্য লোকের ছেলেদের বাকি রাখে নাই। সকাল ন'টায় খবর পেলাম আমার মামা ও আরও অনেককে গ্রেফতার করে ফেলেছে। আমাদের বাড়িতে কি করে আসবে— থানার দারোগা সাহেবদের একটু লজ্জা করছিল। প্রায় দশটার সময় টাউন হল মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দারোগা আলাপ করছে, তার উদ্দেশ্য হল আমি যেন সরে যাই। টাউন হলের মাঠের পাশেই আমার বাড়ি। আমার ফুফাতো ভাই, মাদারীপুর বাড়ি, আব্বার কাছে থেকেই লেখাপড়া করত, সে আমাকে বলে, 'মিয়াভাই, পাশের বাসায় একটু সরে যাও না।' বললাম, 'যাব না, আমি পালাব না। লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি।'

এই সময় আব্বা বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। দারোগা সাহেবও তাঁর পিছে পিছে বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। আব্বার কাছে বসে আস্তে আস্তে সকল কথা বললেন। আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখালেন। আব্বা বললেন, 'নিয়ে যান।' দারোগা বাবু বললেন, 'ও খেয়েদেয়ে আসুক, আমি একজন সিপাহি রেখে যেতেছি, এগারটার মধ্যে যেন থানায় পৌছে যায়। কারণ, দেরি হলে জামিন পেতে অসুবিধা হবে।' আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মারামারি করেছ?' আমি চুপ করে থাকলাম, যার অর্থ 'করেছি'।

আমি খাওয়া-দাওয়া করে থানায় চলে এলাম। দেখি আমার মামা, মানিক সৈয়দ আরও সাত-আটজন হবে, তাদেরকে পূর্বেই গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। আমার পৌছার সাথে সাথে কোর্টে পাঠিয়ে দিল। হাতকড়া দেয় নাই, তবে সামনেও পুলিশ পিছনেও পুলিশ। কোর্ট দারোগা হিন্দু ছিলেন, কোর্টে পৌছার সাথে সাথে আমাদের কোর্ট হাজতের ছোট কামরার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন। কোর্ট দারোগার রুমের পাশেই কোর্ট হাজত। আমাকে দেখে বলেন, 'মজিবর খুব ভয়ানক ছেলে। ছোরা মেরেছিল রমাপদকে। কিছুতেই জামিন দেওয়া যেতে পারে না।' আমি বললাম, 'বাজে কথা বলবেন না, ভাল হবে না।' যারা দারোগা সাহেবের সামনে বসেছিলেন, তাদের বললেন, 'দেখ ছেলের সাহস!' আমাকে অন্য সকলে কথা বলতে নিষেধ করল। পরে শুনলাম, আমার নামে এজাহার দিয়েছে এই কথা বলে যে, আমি ছোরা দিয়ে রমাপদকে হত্যা করার জন্য আঘাত করেছি। তার অবস্থা ভয়ানক খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে রমাপদের সাথে আমার মারামারি হয় একটা লাঠি দিয়ে, ও আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করলে আমিও লাঠি দিয়ে প্রত্যাঘাত করি। যার জন্য ওর মাথা ফেটে যায়। মুসলমান উকিল মোক্তার সাহেবরা কোর্টে আমাদের জামিনের আবেদন পেশ করল। একমাত্র মোক্তার সাহেবকে টাউন জামিন দেয়া হল। আমাদের জেল হাজতে পাঠানোর হুকুম দিল। আমি রুখে দাঁড়ালাম, সকলে আমাকে বাধা দিল, জেলে এলাম। সাবজেল, একটা মাত্র ঘর। একপাশে মেয়েদের থাকার জায়গা, কোনো মেয়ে আসামি না থাকার জন্য মেয়েদের ওয়ার্ডে রাখল। বাড়ি থেকে বিছানা, কাপড় এবং খাবার দেবার অনুমতি দেয়া হল। শেষ পর্যন্ত সাত দিন পরে আমি প্রথম জামিন পেলাম। দশ দিনের মধ্যে আর সকলেই জামিন পেয়ে গেল।

হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করা হল। লোকও চলে গেল কলকাতায়। গোপালগঞ্জে ভীষণ উত্তেজনা চলছিল। হিন্দু উকিলদের সাথে আব্বার বন্ধুত্ব ছিল। সকলেই আমার আব্বাকে সম্মান করতেন। দুই পক্ষের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে ঠিক হল মামলা তারা চালাবে না। আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পনের শত টাকা। সকলে মিলে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হল। আমার আব্বাকেই বেশি দিতে হয়েছিল। এই আমার জীবনে প্রথম জেল।[৪]

বঙ্গবন্ধুর লেখা পড়লে মনে হয় সাম্প্রদায়িক কারণে এ ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত হননি। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন মাত্র। এমনকি সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক ছিল। এ ঘটনায় ফরিদপুরের হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জি জড়িত ছিল। রমাপদ দত্ত বঙ্গবন্ধুকে গালি দিয়েছিল। হিন্দু নেতারা হিন্দু অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে মামলা করে। এসডিও হিন্দু ছিলেন, তাই বঙ্গবন্ধুকে জামিন

দেননি। সুতরাং পুরো ঘটনাটি পরিচালিত হয়েছে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা। বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না কিন্তু হিন্দুরা বিশ্বাস করত 'মজিবর ভয়ানক ছেলে'। একই ঘটনা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা ভিন্ন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে দ্বিতীয় সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে ১৯৪০-এর দশকে। এই সময়ে বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের পতন হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি বঙ্গবন্ধু নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

> খবর যখন রটে গেল লীগ মন্ত্রিত্ব নাই, তখন দেখি টুপি ও পাগড়ি পরা মাড়োয়ারিরা বাজি পোড়াতে শুরু করেছে এবং হৈচৈ করতে আরম্ভ করেছে। সহ্য করতে না পেরে, আরও অনেক কর্মী ছিল, মাড়োয়ারিদের খুব মারপিট করলাম, ওরা ভাগতে শুরু করল।[৫]

এ ঘটনা বঙ্গবন্ধু *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* অকপটে লিখতে পেরেছেন এই জন্যই যে তিনি ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি। তাঁর কাছে ঘটনাটি ছিল রাজনৈতিক। যখন অন্যায় অসহ্য মনে হয়েছে, তখন তিনি প্রতিরোধ করেছেন মাত্র। অথচ মাড়োয়ারিদের কাছে এটি কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা বলে মনে হবে না।

স্পষ্টতই মানুষের ধর্মীয় আবেগের প্রকাশ ভিন্নভাবে ঘটে। আসলে কে ধর্মনিরপেক্ষ আর কে সাম্প্রদায়িক, তা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার মাত্রা সাদা-কালো রং দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। কেউ কেউ সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। আবার কেউ কেউ আংশিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। কেউ কেউ আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ নন। অনাপেক্ষিক ধর্মনিরপেক্ষতা অত্যন্ত দুরূহ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষতা আপেক্ষিক। তাই রাষ্ট্রজীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন কাজ।

এই নিবন্ধে ভারত ও বাংলাদেশে রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই নিবন্ধটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতা নির্ধারণের জটিলতা সম্পর্কে কয়েকটি কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। এ কাহিনিগুলো থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ধর্মনিরপেক্ষতার অনাপেক্ষিক সংজ্ঞা সব সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয় এবং সেটি নির্ধারণ করা গেলেও তার বাস্তবায়ন সহজ নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো আদর্শ, অন্যটি বৈষয়িক সুবিধা। দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এবং এর শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতার বৈষয়িক ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু একটি আদর্শ নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা। এই খণ্ডে তাই বাংলাদেশ ও ভারতে সংখ্যালঘুদের

স্বার্থরক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে উপসংহারে প্রথম তিন খণ্ডের বিশ্লেষণের ওপর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য কী করণীয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## ৩.২ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এবং এর শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত তাৎপর্য

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ইংলিশ-বাংলা অভিধান অনুসারে ইংরেজি সেক্যুলারিজম শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়, এই মতবাদ; ইহজাগতিকতা; ইহবাদ।' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বারো অনুচ্ছেদে সেক্যুলারিজমের অনুবাদ করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। কোন অনুবাদ সঠিক? দুটোই ঠিক। ইংরেজি সেক্যুলারিজম শব্দটির দুটো অভিধা রয়েছে। সেক্যুলারিজম শব্দটি একটি জীবনদর্শন, আবার এটি একটি শাসনতান্ত্রিক মতবাদও বটে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জর্জ জেকব হলিওক সেক্যুলারিজম জীবনদর্শন উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, মানুষের ইহলোকে শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চরম উৎকর্ষে পৌঁছার সাধনাই হচ্ছে ইহবাদ। এই উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে বৈষয়িক উপায়ে বিজ্ঞান প্রয়োগ করে ও বৈষয়িক কল্যাণই একমাত্র অভীষ্ট। তাঁদের অনেকে বিশ্বাস করেন, যেহেতু ইহবাদ ধর্মের চেয়ে শ্রেয়, সেহেতু রাষ্ট্রজীবনেও ধর্মের বদলে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে শাসনতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতা ইহবাদের চেয়েও পুরোনো মতবাদ। রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে শাসকদের ক্ষমতার লড়াইয়ে এই মতবাদ বিকশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন এ জন্য যাতে এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর প্রাধান্য লাভ না করে। কিন্তু ইউরোপে সবাই ছিল খ্রিষ্টান। ঝগড়াটা এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের ছিল না; ঝগড়া ছিল খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন উপদল বা সিলসিলার মধ্যে। ঝগড়া শুধু শাস্ত্রিক ছিল না; লড়াইটি ছিল মূলত বৈষয়িক। ক্যাথলিক গির্জা ছিল বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক। ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ গড়ে ওঠে রাষ্ট্র কর্তৃক গির্জার সম্পত্তির দখল নিয়ে। কিন্তু এ মতবাদ শুধু বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি; এর জন্য ঘটেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত জার্মানি ও কেন্দ্রীয় ইউরোপে ৩০ বছর ধরে এক প্রচণ্ড বিধ্বংসী লড়াই চলে। এ যুদ্ধের ফলে জার্মানি ও কেন্দ্রীয় ইউরোপে স্থানভেদে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ জনসংখ্যা হ্রাস পায়। জার্মানির ওটেমবার্গ রাজ্যে জনসংখ্যা কমে ৭৫ শতাংশ।

ইউরোপে দুটি প্রত্যয়ের ওপর ধর্মনিরপেক্ষতার শাসনতান্ত্রিক মতবাদ গড়ে ওঠে। প্রথম প্রত্যয় হলো, রাষ্ট্র হবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জাগতিক ব্যাপারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রাধান্য থাকবে না। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে এ প্রত্যয় স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় প্রত্যয় হলো, সব ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যক্তিরা আইনের দৃষ্টিতে সমান। শুধু যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে, তারাই নয়, যারা আদৌ কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না (অর্থাৎ নাস্তিক), তারাও এই সুযোগ পাবেন।

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় সব রাষ্ট্রেই ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকার স্বীকৃত। কোথাও এই অধিকার শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত। কোথাও কোথাও এ অধিকার শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত না হলেও পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালিত। ইউরোপ থেকে অনেক অত্যাচারিত ধর্মীয় গোষ্ঠী আমেরিকাতে আশ্রয় নেয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা টমাস জেফারসনের মতে, মার্কিন সংবিধানে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে দেয়াল রয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্রের কোনো পদের জন্য ধর্মভিত্তিক যোগ্যতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম সংবিধান সংশোধনীতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেস কোনো ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আইন তৈরি বা কোনো ধর্মের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে না। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সব সময়েই এ অধিকার সংরক্ষণে তৎপর রয়েছেন। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যে কোনো লিখিত সংবিধান নেই। আইন অনুসারে যুক্তরাজ্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। চার্চ অব ইংল্যান্ডের ধর্ম ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। ইংল্যান্ডের রাজা বা রানি যখন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর শপথ নিতে হয় যে তিনি চার্চ অব ইংল্যান্ডের ধর্ম রক্ষা করবেন। ২৬ জন অনির্বাচিত যাজক পদাধিকার বলে হাউস অব লর্ডসের সদস্য এবং তাঁদের পছন্দ নয়, এরূপ আইন অনুমোদনের বিরোধিতা করতে পারেন। কিন্তু সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ না হলেও, বাস্তবে ব্যক্তিপর্যায়ে যুক্তরাজ্যে যত নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রয়েছে, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। মূলত এ স্বাধীনতা শুধু আইনের ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে আইনের শাসনের ওপর।

পৃথিবীতে দুই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র রয়েছে। যারা জন্ম থেকে ধর্মনিরপেক্ষ, এসব রাষ্ট্র নবীন। এদের সংবিধান রয়েছে। সাংবিধানিকভাবে এদের ধর্মনিরপেক্ষ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনেক রাষ্ট্র রয়েছে, যারা প্রচলিত ব্যবস্থার সংশোধনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন করেছে। ভারত ও বাংলাদেশ আইনগত দিক থেকে নতুন রাষ্ট্র। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা পাশ্চাত্যের আদলে

সংবিধানে প্রবর্তন করা হয়েছে। ভারতের মূল সংবিধানকে সরাসরি সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা দেওয়া হয়নি। তবু নামে না হলেও কাজে এটি শতভাগ ধর্মনিরপেক্ষ। ভারতীয় সংবিধানে কোনো রাষ্ট্রধর্ম নেই এবং কোনো ধর্মাবলম্বীকে কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়নি। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জনগোষ্ঠী বা লিঙ্গনির্বিশেষে সবাইকে সমান মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায় পর্যায়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে ধর্মবিশ্বাস ও অনুশীলনের এবং ধর্মীয় বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপরও সংবিধান জারি হওয়ার ২৭ বছর পর ১৯৭৬ সালে ৪২ নম্বর সংবিধান সংশোধনীতে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় সংবিধান সব ধর্মকে সমান আইনগত অধিকার দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ভিত্তিতে প্রণীত ব্যক্তিগত আইনের অলঙ্ঘনীয়তাও মেনে নিয়েছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে যারা ধূর্ত, তারা অন্যদের প্রতারণা করার চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে 'সরলা মুদ্গাল বনাম ভারত সরকার' মামলায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের রায় স্মরণ করা যেতে পারে। জিতেন্দর মাথুরের পত্নী মীনা মাথুর অভিযোগ করেন যে তাঁর স্বামী হিন্দু পরিবার আইন অনুসারে তাঁকে বিয়ে করেন এবং আইন অনুসারে তাঁর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ না করেই সুনীতা নরুলা নামের আরেক মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর স্বামী দাবি করেন যে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন ও তাই তাঁর দ্বিতীয় বিয়েতে কোনো আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই। পক্ষান্তরে মীনা প্রার্থনা করেন তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েকে বেআইনি ঘোষণা করা হোক। ১৯৯৫ সালে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট জিতেন্দরের দ্বিতীয় বিয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারা অনুসারে একটি ফৌজদারি অপরাধ বলে রায় দেন। এই রায় থেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জন্য ভিন্ন পারিবারিক আইনের সমমর্যাদার সমস্যা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলিম পারিবারিক আইনের সঙ্গে সংবিধানের সংঘর্ষ নিয়ে 'মোহাম্মদ আহমদ খান বনাম শাহ বানু বেগম' মামলায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৫ সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। মধ্যপ্রদেশে মোহাম্মদ আহমদ খান ১৯৩২ সালে শাহ বানু বেগমকে শাদি করেন। এর ১৪ বছর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং সন্তানাদিসহ প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭০-এর দশকে তিনি প্রথমা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহন করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৭৮ সালে প্রথমা স্ত্রী শাহ বানু স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোশের মামলা করেন। এই মামলা করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী শাহ বানুকে তালাক দেন এবং দাবি করেন যে মুসলিম পারিবারিক

আইন অনুসারে তালাক দেওয়া স্ত্রীর খোরপোশ দেওয়ার কোনো বিধান নেই। আদালত মুসলিম পারিবারিক আইনের ওপর দেশে প্রচলিত আইনের প্রাধান্য দিয়ে এই ক্ষেত্রে খোরপোশের আদেশ দেন। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৫ সালে নিম্ন আদালতের সঙ্গে একমত হয়ে ১৯৮৫ সালে চূড়ান্ত রায় দেন। ভারতীয় মুসলমানরা এই রায়কে মুসলিম পারিবারিক আইনের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ গণ্য করে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৬ সালে ভারত সরকার মুসলিম মহিলা (তালাকের পর অধিকার সংরক্ষণ) আইন ১৯৮৬ জারি করে। এই আইনে শাহ বানুর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় বাতিল করা হয় এবং তালাকের পর ইদ্দতের সময় পার হওয়ার পর স্বামীকে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই রাজনৈতিক উদ্যোগ শুধু রক্ষণশীলরাই নন, প্রগতিশীলরাও স্বেচ্ছায় মেনে নেন। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই মনে করছেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘুদের হাতে একটি রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ টি এন মদন এ প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন :

> Secularism is the dream of a minority who wants to shape the majority in its own image, which wants to impose its will upon history but lacks the power to do so under a democratically organized polity. In an open society the state will reflect the character of the society. Secularism therefore is a social myth which draws a cover over the failure of this minority to separate politics from religion in the society in which its members live.[৬]

ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য নিয়ে ভারতে দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। একটি মতবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ জীবনদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরা বিশ্বাস করে যে সাম্প্রদায়িকতা ইতিহাসের অমোঘ বিধান নয়। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাবে। তাই যাঁরা প্রগতিবাদী, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব এবং এই ব্যবস্থাতে ধর্মের ভূমিকা ক্রমশ হ্রাস পাবে। পক্ষান্তরে যাঁরা দ্বিতীয় মতবাদে বিশ্বাস করেন, তাঁরা মনে করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে প্রগতির লক্ষণ নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষণশীল ধর্মান্ধদের হাতে আত্মরক্ষার একটি অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ভারতের মতো বাংলাদেশও জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে

প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূল নীতি হইবে।' সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে :

৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে,

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্রসমূহে যেসব আইনগত অধিকার রয়েছে, তার সবই বাংলাদেশের সংবিধানে রয়েছে। তবে বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে দুটি ব্যতিক্রমধর্মী বিধান রয়েছে। প্রথমত সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে :

১২। ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য—

(ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার ওপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।

১৯৭৮ সালে সামরিক শাসকগণ এই অনুচ্ছেদ বিলোপ করেন। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা হয়।

দ্বিতীয়ত, মূল সংবিধানে ৩৮ অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শর্ত যোগ করা হয় :

'তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোনো সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোনো প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকিবে না।' এই শর্তও ১৯৭৮ সালে সামরিক শাসকদের দ্বারা বিলুপ্ত হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারা পুনর্বহাল করা হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের সংবিধান সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের ফলে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমত, ১৯৭৭ সালে সামরিক শাসকেরা প্রস্তাবনার পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম' ইসলামিক শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপন করেন। যেহেতু এই শব্দগুচ্ছ প্রস্তাবনার পূর্বে যুক্ত হয়েছে এবং সংবিধান প্রস্তাবনা থেকে শুরু, সেহেতু এই শব্দগুচ্ছ সংবিধান ব্যাখ্যায় ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাই সুপ্রিম কোর্ট অভিমত প্রকাশ করছেন যে এই বাক্যাংশ বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

১৯৮৮ সালে সংবিধানে (অষ্টম সংশোধন) আইনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ২(ক) অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়: '২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।'

এই অনুচ্ছেদ সংবিধানের ১২(খ) উপ-অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ; কেননা, এর ফলে রাষ্ট্র ইসলাম ধর্মকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে রাষ্ট্রধর্মের বিধান মূল সংবিধানের চেতনার পরিপন্থী। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায় বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংশোধনের সময় সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করেনি। এই বিধানের পক্ষে জনসমর্থন আছে মনে করেই সম্ভবত সরকার রাষ্ট্রধর্মের বিধান পরিবর্তন করতে রাজি হয়নি। রাষ্ট্রধর্মের বিধান থাকাতে বাংলাদেশের সংবিধানকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যাবে কি না, এ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। উপরন্তু সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদে জনশৃঙ্খলার প্রয়োজন সাপেক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। জনশৃঙ্খলার স্বার্থে রাষ্ট্র প্রচলিত ধর্মসমূহের পক্ষে সাধারণত অবস্থান নেয়। এর ফলে বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা কমে যায়।

## ৩.৩ ভারত ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বর্তমান পরিস্থিতি

ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু একটি লক্ষ্য নয়, এটি লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র। ভারত ও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণের মূল লক্ষ্য হলো সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রায় ৬৯ বছর ধরে চালু রয়েছে। কাজেই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে ভারতের প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমানদের জীবনে কী প্রভাব দেখা দিয়েছে।

যদি জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিচার করা হয়, তবে ভারতে মুসলমানদের পরিস্থিতি ভারতের হিন্দুদের চেয়ে ভালো মনে হবে।

## সারণি-৩.১
## ভারতের জনসংখ্যায় মুসলমানদের শতকরা হার

| সাল | ভারতের মোট জনসংখ্যায় মুসলমানদের শতকরা হার |
|---|---|
| ১৯৫১ | ৯.৯৩% |
| ১৯৬১ | ১০.৭% |
| ১৯৭১ | ১১.২১% |
| ১৯৮১ | ১১.৩৫% |
| ১৯৯১ | ১২.১২% |
| ২০০১ | ১৩.৪৩% |
| ২০১১ | ১৪.৫৮% |

উৎস : ভারতীয় আদমশুমারি

১৯৫১ সালে ভারতে মোট মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩.৫৮ কোটি। ২০০১ সালে এ সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বিগত ৫০ বছরে পাঁচ গুণের বেশি বেড়েছে মুসলমানের সংখ্যা। ১৯৫১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৬.১ কোটি। ২০০১ সালে এ সংখ্যা ১২১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বিগত ৫০ বছরে ভারতে (মুসলমানসহ) মোট জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৩.৪ গুণ। অবশ্য মুসলমান জনসংখ্যার অসাধারণ বৃদ্ধি নতুন কোনো প্রবণতা নয়। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৭১ থেকে ১৯৪১—এই ৭০ বছর সময়কালেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যা দ্রুত বেড়েছে; কেননা, মুসলমানদের জন্মের হার বেশি। কাজেই জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে মুসলমানদের জীবনকুশলতার পরিমাপ হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না।

সাধারণত জাতীয় সংস্থাসমূহ ধর্মভিত্তিক আর্থসামাজিক তথ্য সংগ্রহ করে না। তাই দীর্ঘদিন ভারতের মুসলমানদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ওপর কোনো প্রামাণ্য তথ্য ছিল না। ২০০৫ সালে কংগ্রেস সরকার ভারতের মুসলমানদের আর্থসামাজিক ও শিক্ষাগত পরিস্থিতির ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রাজিন্দর সাচারের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করে।[৭] ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে কমিটি তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। সাচার কমিটির প্রতিবেদনে ভারতীয় মুসলমানদের বঞ্চনা ও দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে।

## সারণি-৩.২
## ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাসিক মাথাপিছু ব্যয়, ২০০৪-০৫ (রুপিতে)

| | সব নাগরিক | মুসলিম | হিন্দু সাধারণ | হিন্দু অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী | তফসিলি বর্ণ বা উপজাতি |
|---|---|---|---|---|---|
| নগর | ১১০৫ | ৮০০ | ১৪৬৯ | ৯৫৫ | ৭৯৩ |
| পল্লি অঞ্চল | ৫৭৯ | ৫৫৩ | ৭৩৯ | ৫৬৭ | ৪৬৮ |
| জাতীয় | ৭১২ | ৬৩৫ | ১০২৩ | ৬৪৬ | ৫২০ |

উৎস : সাচার কমিটির প্রতিবেদন

সাচার কমিটির প্রতিবেদনে ভারতের জনসংখ্যাকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয় : (১) মুসলিম (২) সাধারণ হিন্দু বা বর্ণহিন্দু (৩) তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু ছাড়া অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর হিন্দু (৪) তফসিলি হিন্দু ও তফসিলি উপজাতি।

সারণি-৩.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে গড়ে ভারতীয় মুসলমানদের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় গড় ভারতীয় নাগরিকদের তুলনায় অনেক কম। জাতীয় পর্যায়ে ভারতে মুসলমানদের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় গড় ভারতীয় নাগরিকদের চেয়ে প্রায় ১২ শতাংশ কম। তবে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে এই তফাত অনেক বেশি। একজন বর্ণহিন্দু একজন মুসলমানের চেয়ে গড়ে ৬০ শতাংশ বেশি ব্যয় করে। নগর অঞ্চলের হিন্দুরা একজন গড় মুসলমানের চেয়ে ৮৩ শতাংশ বেশি ব্যয় করে। তফসিলি ছাড়া অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর হিন্দুদের মাসিক ব্যয়ও মুসলমানদের চেয়ে বেশি। মাথাপিছু ব্যয়ের দিক থেকে মুসলমানদের চেয়ে সামান্য পেছনে রয়েছে তফসিলি হিন্দু ও উপজাতীয়রা।

সাচার কমিটির প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, মুসলমানদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ হওয়ার একটি বড় কারণ হলো মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে। (সারণি-৩.৩)

শিক্ষার হারের দিক থেকে ভারতীয় মুসলমানরা তফসিলি জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য সব জনগোষ্ঠীর পেছনে। এর ফলে ভারতে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার হারও কম। ২০০১ সালের আদমশুমারি থেকে দেখা যায়, ভারতে মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা রয়েছে; মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ৪ শতাংশ। মুসলমানরা চাকরির ক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছে।

## সারণি-৩.৩
## ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে শিক্ষার হার (২০০১)

| | সর্ব ভারতীয় | পল্লি অঞ্চল | পল্লি অঞ্চল | পল্লি অঞ্চল | নগর অঞ্চল | নগর অঞ্চল | নগর অঞ্চল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সব | পুরুষ | মহিলা | সব | পুরুষ | মহিলা |
| সব | ৬৪.৮ | ৫৯ | ৭১ | ৪৬ | ৮০ | ৮৬ | ৭৩ |
| হিন্দু | ৬৫.১ | ৫৯ | ৭২ | ৪৬ | ৮১ | ৮৮ | ৭৪ |
| তফসিলি বর্ণ/উপজাতি | ৫২.২ | ৪৯ | ৬১ | ৩৬ | ৬৮ | ৭৮ | ৫৮ |
| মুসলিম | ৫৯.১ | ৫৩ | ৬২ | ৪৩ | ৭০ | ৭৬ | ৬৩ |
| অন্যান্য | ৭০.৪ | ৬৪ | ৭১ | ৫২ | ৮৫ | ৯০ | ৭৮ |

উৎস : সাচার কমিটির প্রতিবেদন

## সারণি-৩.৪
## ভারতে বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে সরকারি, সরকারি মালিকানাধীন ও বৃহৎ বেসরকারি খাতে নিয়োগের শতকরা হার

| | সরকারি | সরকারি মালিকানাধীন ও বৃহৎ বেসরকারি খাত |
|---|---|---|
| সব | ৩৪.২ | ১৩.১ |
| হিন্দু | ৩৫.৩ | ১৩.৯ |
| তফসিলি হিন্দু/উপজাতি | ৩৯.৪ | ৯.৫ |
| অন্যান্য পশ্চাৎপদ হিন্দু | ৩০.৪ | ১২.৮ |
| উচ্চবর্ণ | ৩৭.৪ | ১৭.১ |
| মুসলিম | ২৩.৭ | ৬.৫ |
| অন্যান্য | ৩৫.৫ | ১২.৮ |

উৎস : সাচার কমিটির প্রতিবেদন

মুসলমান বেতনভোগী কর্মচারীদের মাত্র ২৩.৭ শতাংশ সরকারে কাজ করে, আর ৬.৫ শতাংশ সরকারি মালিকানাধীন বৃহৎ বেসরকারি খাতে কাজ করে। প্রতিতুলনায় সব ভারতীয়ের ৩৪.২ শতাংশ সরকারে ও ১৩.১ শতাংশ

সরকারি মালিকানাধীন ও বৃহৎ বেসরকারি খাতে কাজ করে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, মুসলমানদের ৬১ শতাংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, হিন্দুদের মাত্র ৫৫ শতাংশ এ ধরনের কাজে নিয়োজিত। দ্বিতীয়ত, সরকারের নীতিনির্ধারকের পদে মুসলমানদের নিয়োগ জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম। মুসলমানরা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ১৪.৫৮ শতাংশ, অথচ ভারতে সর্বোচ্চ ক্যাডার সার্ভিস আইএএসে মুসলমান অফিসার মাত্র ৩ শতাংশ, ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগের চাকরিতে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ১.৮ শতাংশ। (সারণি-৩.৫)

**সারণি-৩.৫**
**ভারতে সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের শতকরা হার**

| চাকরি | মুসলমানদের শতকরা হার |
|---|---|
| আইএএস | ৩.০ |
| আইএফএস | ১.৮ |
| আইপিএস (নিরাপত্তা-সংক্রান্ত) | ৪.০ |
| রেলপথ | ৪.৫ |
| শিক্ষা (রাজ্য পর্যায়ে) | ৬.৫ |
| স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (রাজ্য পর্যায়ে) | ৭.৩ |
| পুলিশ কনস্টেবল | ৬.০ |
| স্বাস্থ্য বিভাগ | ৪.৫ |
| পরিবহন বিভাগ | ৬.৫ |
| বিচার বিভাগ | ৭.৮ |

উৎস : সাচার কমিটির প্রতিবেদন

শুধু নীতিনির্ধারক পদেই নয়—স্বাস্থ্য, পরিবহন, পুলিশ ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানেও মুসলমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক কম। স্বকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ অত্যাবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ব্যাংকঋণের সুবিধাও কম। সাড়ে ১৪ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী বেসরকারি ব্যাংক থেকে মোট ঋণের ৬.৬ শতাংশ ও সরকারি ব্যাংকের মাত্র ৪.৬ শতাংশ ঋণের সুবিধা লাভ করে। (সারণি-৩.৬)

## সারণি-৩.৬
## ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ব্যাংকের আদায়যোগ্য ঋণ বিতরণের হার (শতকরা)

| | মুসলিম | অমুসলিম সংখ্যালঘু | হিন্দু |
|---|---|---|---|
| বেসরকারি ব্যাংক | ৬.৬ | ৭.৯ | ৮৫.৫ |
| সরকারি ব্যাংক | ৪.৬ | ৬.৩ | ৮৯.১ |

উৎস : সাচার কমিটির প্রতিবেদন।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে কমিটি নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় :

> The Community exhibits deficits and deprivation in practically all dimensions of development. In fact, by and large, Muslims rank somewhat above SCs/STs, but below Hindu OBCs, other minorities and Hindu General (mostly upper castes) in almost all indicators considered. Among the states that have large Muslim populations, the situation is particularly grave in the states of West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and Assam.

সাচার কমিটি ভারতীয় মুসলমানদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু তাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেনি।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের প্রধান যুক্তি ছিল, এর ফলে সাম্প্রদায়িকতায় ক্ষত-বিক্ষত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অথচ ভারত বিভাগের শুরুতেই প্রায় দেড় কোটি নাগরিক অভিবাসী হতে বাধ্য হয় এবং কমপক্ষে দুই লাখ (সর্বোচ্চ হিসাব অনুসারে ১০ লাখ) লোক প্রাণ হারায়। কিন্তু বিভাগোত্তর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হয়নি। দাঙ্গায় মৃতের হার কিছুটা কমেছে, কিন্তু এখনো মৃতের সংখ্যা উদ্বেগজনক। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সময়কালে ভারতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় গড়ে বছরে ৩৮১ জন মারা যায়। ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় ২০১৩ সালে ১৩৩ জন ও ২০১৪ সালে ৯৫ জন মারা যান। ১৯৫০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১০ হাজার লোক দাঙ্গায় মারা গেছে। দাঙ্গার সংখ্যা এখনো উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে *টাইমস অব ইন্ডিয়া* (২২ জুলাই ২০১৪) জানাচ্ছে, ভারতে ২০১৩ সালে ২২৬৯টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে; ২০১৪ সালে ঘটে ১৯৬১টি। অর্থাৎ ভারতে ২০১৩ সালে প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে ছয়টি দাঙ্গা ঘটেছে; ২০১৪ সালে প্রতিদিন গড়ে ঘটেছে কম পক্ষে পাঁচটি দাঙ্গা। সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেনি।

ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা ভারতের অনুরূপ। ভারতের মুসলমানদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি যা-ই হোক, তাদের মোট জনসংখ্যা অন্তত উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে অনেক কমে গেছে। (সারণি-৩.৭)

**সারণি-৩.৭**

**বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যায় হিন্দুদের হার (শতকরা)**

| সাল | হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার |
|---|---|
| ১৯৪১ | ২৮ |
| ১৯৫১ | ২২ |
| ১৯৬১ | ১৮.৫ |
| ১৯৭১ | ১৩.৫ |
| ১৯৮১ | ১২.১২ |
| ১৯৯১ | ১১.৬২ |
| ২০০১ | ৯.৬ |
| ২০১১ | ৮.৫ |

উৎস : বাংলাদেশের আদমশুমারি প্রতিবেদন।

বাংলাদেশের আদমশুমারি থেকে দেখা যায়, ১৯৫১-২০১১ সময়কালে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা মাত্র ৩৭ লাখ বেড়েছে, পক্ষান্তরে এই সময়ে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ১১ কোটি ১৩ লাখ। হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রজনন হার মুসলমান জনগোষ্ঠীর তুলনায় (প্রায় ১৫%) কম। আলী রীয়াজের হিসাব অনুসারে, ২০১১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা হওয়া উচিত ছিল প্রায় ২.৭৯ কোটি। বাস্তবে রয়েছে ১.২৯ কোটি। অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি হিন্দু বাংলাদেশের জনসংখ্যা থেকে নিরুদ্দিষ্ট।[৮] এই নিরুদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ভারতে অভিবাসী হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে অর্থনৈতিক উন্নতির মোহে বিশ্বব্যাপী অভিবাসনের হার দ্রুত বাড়ছে। তবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অভিবাসনের মূল প্রণোদনা আর্থিক নয়। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যসমূহের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের চেয়ে উন্নত নয়।

আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিমাণ ভারতের চেয়ে কম। বেসরকারি সংস্থা 'অধিকার'-এর হিসাব অনুসারে, ২০০৯ থেকে ২০১৩—এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশে হিন্দুদের বাস্তুভিটা আক্রমণের ঘটনা ঘটে ৫৬৮টি; মন্দিরের ওপর হামলা হয় ২৪৭টি। বছরে গড়ে ১৬৩টি সহিংস

ঘটনা ঘটে। এই হিসাবে বাংলাদেশে গড়ে ২.২ দিনে একটি দাঙ্গা হয় আর ভারতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ থেকে ছয়টি দাঙ্গা ঘটেছে। তবে দাঙ্গার পরিসংখ্যান দিয়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রকৃত পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা যাবে না। প্রকৃত পরিস্থিতি হলো যে বাংলাদেশে দাঙ্গাকারীদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দাঙ্গার প্রয়োজন নেই, এখানে হিন্দুদের মধ্যে প্রতিনিয়ত 'ভয়ের সংস্কৃতি' বিরাজ করছে। আলী রীয়াজ যথার্থই লিখেছেন, 'অনিশ্চয়তা, ভীতি ও শঙ্কা ধর্মীয়ভাবে বাংলাদেশের "সংখ্যালঘু" হিন্দু জনগোষ্ঠীকে জন্মভূমিতেই পরবাসী করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আর এই যে অনিশ্চয়তার ভীতি ও শঙ্কা, এটা তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে কেবল প্রত্যক্ষ সন্ত্রাস থেকেই নয়, বিরাজমান অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ কিন্তু সদা উপস্থিত একধরনের সন্ত্রাস থেকে। এই সন্ত্রাসকে আমরা বলতে পারি কাঠামোগত সন্ত্রাস।'[৯]

বাংলাদেশে হিন্দুদের অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে কোনো বড় ধরনের সমীক্ষা হয়নি। তবে সরকারি চাকুরেদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সারণি-৩.৮-এ দেখা যাবে।

**সারণি-৩.৮**

**বাংলাদেশে সচিবালয়ে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ধর্মভিত্তিক সংখ্যা ও শতকরা হার**

| পদের নাম | হিন্দুর সংখ্যা | হিন্দুদের শতকরা হার | অন্যান্য সংখ্যা লঘুর সংখ্যা | অন্যান্য সংখ্যা লঘুর শতকরা হার | মুসলমানের সংখ্যা | মুসলমানদের শতকরা হার | মোট পদের সংখ্যা | মোট পদের শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সচিব | ৩ | ৪.০ | ০ | ০ | ৭১ | ৯৬ | ৭৪ | ১.৮ |
| অতিরিক্ত সচিব | ৩৩ | ১৩.৮ | ১ | ০.০০৪ | ২০৫ | ৮৫.৭৭ | ২৩৯ | ৫.৮৪ |
| যুগ্ম সচিব | ৫৩ | ৫.২১ | ০ | ০ | ৯৬৩ | ৯৪.৭৯ | ১০১৬ | ২৪.৮৪ |
| উপসচিব | ১২৩ | ৯.৩৩ | ৪ | ০,০০৩ | ১১৯১ | ৯০.৩ | ১২১৮ | ৩২.২৩ |
| সিনিয়র সহকারী সচিব | ১১২ | ৭.৭৬ | ১১ | ৭.৭৬ | ১৩১৯ | ০.৯২ | ১৪৪২ | ৩৫.২৬ |
| মোট | ৩২৪ | ৭.৯২ | ১৬ | ০.০৩৯ | ৩৭৪৯ | ৯১.৬ | ৪০৮৯ | ১০০ |

উৎস : গণপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (২৯.১০.২০১৩)

বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৪ হাজার ৮৯ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার ধর্মীয় পরিচয় বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে প্রায় ৭.৯২ ভাগ সরকারি কর্মকর্তা হিন্দু। ২০১১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮.৫ ভাগ ছিল হিন্দু। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগে হিন্দুদের হার খুব অসন্তোষজনক নয়। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাবে ভারতে চলে যাওয়ায় হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত বর্তমানে ৮.৫-এ নেমে এসেছে। ২০০১ সালে হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার ৯.৬ শতাংশ ছিল। এই হিসাবে হিন্দুরা জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি চাকরি পায়নি। তবে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য কম।

ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সত্ত্বেও ভারত ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। এরা এখনো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। মানুষের জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। এর জন্য প্রয়োজন সুশাসন ও সরকারের জবাবদিহি।

## ৩.৪ উপসংহার : কাঁচি হাতে মহাপুরুষের পক্ষে কি সমাধান সম্ভব?

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হয়েছে, তা মূলত দক্ষিণ এশিয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। দক্ষিণ এশিয়াতে ধর্মনিরপেক্ষতা সমস্যা মূলত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য। ধরে নেওয়া হয় যে ধর্মনিরপেক্ষতা না থাকলে যেখানে একাধিক ধর্ম প্রচলিত রয়েছে, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ন্যায়বিচার পাবে না। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়াতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আকারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেকেই মনে করেন, যেখানে সব দেশের সব লোক এক ধর্মে বিশ্বাস করে, সেসব দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যা নেই। এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু আন্তধর্মীয় সংঘাত এড়ানোর জন্য নয়, একই ধর্মের বিভিন্ন গোত্র বা সিলসিলার সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যও তা অত্যাবশ্যক। ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মধ্যযুগে ইউরোপে বেশির ভাগ লোক খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস করত। যখন আধুনিক যুগের প্রথম পর্বে খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে সংস্কারবাদী আন্দোলন দেখা দেয়, তখন বিভিন্ন ধর্মীয় গোত্রের আবির্ভাব ঘটে। একই ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। তার মানে শুধু এক ধর্ম হলেই চলবে না, সবাইকে একই ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বে প্রায় সব ধর্মই মূলধারার যারা

বিরোধী, তাদের ব্যাপারে নির্দয় ও নির্মম। ইসলাম ধর্মে মুরতাদদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। স্পেনের ইনকুইজিশন ক্যাথলিক মতবাদে যারা বিশ্বাস করত না, তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এমনকি শান্তির ধর্ম বৌদ্ধধর্মও এ ব্যাপারে নৃশংস। বৌদ্ধ গ্রন্থ *অশোকবদান*-এ বলা হয়েছে যে সম্রাট অশোক, যিনি কলিঙ্গ যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় অনুতপ্ত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি 'আজিবিক' নামক বৌদ্ধ উপদলের একটি গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধকে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরকে প্রণামরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে শুনে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তিনি পুণ্ড্রবর্ধনের সব আজিবিককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এর ফলে উত্তরবঙ্গে ১৮ হাজার আজিবিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর বদলে কোনো রাষ্ট্রে যদি এক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান (যা তখন পশ্চিম পাকিস্তান ছিল) একটি বহুধর্মীয় রাষ্ট্র হতে প্রায় সম্পূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যেসব অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছে, সেসব অঞ্চলে মুসলমানের হার ছিল ৮০ শতাংশ; জনগোষ্ঠীর শতকরা ২০ ভাগ ছিল শিখ ও হিন্দু। বর্তমানে পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৯৬.৪ শতাংশ মুসলমান। ৩.৬ শতাংশ অমুসলিমের মধ্যে ২.৩ শতাংশ লোক আহমদিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। আহমদিয়ারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে থাকে এবং ১৯৭২ সালের আগে এদের মুসলমান বলে গণ্য করা হতো। সুতরাং ১৯৭২ সালের আগের সংজ্ঞা অনুসারে পাকিস্তানে ৯৮.৭ শতাংশ মুসলমান আর খ্রিষ্টান, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১.৩ শতাংশ মাত্র। তবু অবিভক্ত ভারতে বর্তমান পাকিস্তান অঞ্চলে যে পরিমাণ দাঙ্গা হতো, প্রায় এক ধর্ম রাষ্ট্র পাকিস্তানে তার চেয়ে অনেক বেশি দাঙ্গা ঘটছে। আহমদিয়াদের আক্রমণ করা হচ্ছে, হিন্দু এবং খ্রিষ্টানদের নির্মূল করার প্রয়াস চলছে। তার চেয়েও বড় কথা হলো, ইসলামের দুটি প্রধান ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা প্রায়ই ঘটে থাকে। সেখানে এই দাঙ্গা এত নির্মম যে দাঙ্গাকারীরা বিরোধী গোত্রের মসজিদে প্রার্থনারত অবস্থায় হত্যা করতে দ্বিধা করছে না। বাংলাদেশে একসময় দাঙ্গা শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন হিন্দুদের সংখ্যা কমে গেছে। শিয়াদের, আহমদিয়াদের ও খ্রিষ্টানদের ওপরও হামলা চলছে। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় : শিখ-খ্রিষ্টান ভিন্ন ভাষাভাষী ও আদিবাসী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীও সেখানে সাম্প্রদায়িকতার শিকার।

ধর্ম যেখানেই রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পৃক্ত, সেখানেই মানুষকে প্রতিষ্ঠিত নীতির প্রতি অনুগত হতে বাধ্য করে। মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা রোধ করে। শতকরা

৯৯ বিষয়ে এক হলেও যে ১ শতাংশ বিষয়ে দ্বিমত, সেটাই বড় হয়ে ওঠে। এমনকি শব্দের উচ্চারণ (উদাহরণ : অলাদুয়াল্লিন হবে, না অলাজুয়াল্লিন হবে) নিয়ে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। কাজেই যদি আমরা ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা বহুধর্মের রাষ্ট্রে যেমন প্রয়োজন, তেমনি এক ধর্মের রাষ্ট্রেও অত্যাবশ্যক। ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া মানুষের চিন্তার ও বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার কোনো উপায় নেই।

পিটার বার্গার ধর্মনিরপেক্ষায়ন বা সেক্যুলারাইজেশনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'The process by which sectors of society and culture are removed from the domination of religious institutions and symbols'।[১০] (1973) এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ এবং সংস্কৃতিতে ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান স্বীকার করা হয় এবং যেসব বিষয় ধর্মীয় নয়, সেসব বিষয়ে ধর্মের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের বিপক্ষে; আসলে তা নয়। সব ধর্মের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন। ১৯৬১ সালে জওহর লাল নেহরু লিখেছেন :

> We talk about a secular state in India. It is perhaps not very easy even to find a good word in Hindi for secular. Some people think it means something opposed to religion. That obviously is not correct. ...It is a state which honours all faiths equally and gives them equal opportunities.[১১]

ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই আইনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে আইন এর জন্য যথেষ্ট নয়। প্লেটো বলতেন, যেখানে লোক ভালো, সেখানে কোনো আইনের প্রয়োজন নেই, লোকেরা যে কাজ করবে, সেটাই ভালো হবে। কিন্তু যেখানে লোক খারাপ, সেখানে আইন করেও লাভ হয় না; কারণ, খারাপ লোকেরা আইনকে ফাঁকি দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য তাই প্রয়োজন এমন জনগোষ্ঠী, যারা ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল। যেখানে এ ধরনের মনোবৃত্তি নেই, সেখানে আইন করেও ধর্মনিরপেক্ষতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞতার তুলনা করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা আদালত কর্তৃক বলবৎ করা হয়ে থাকে। তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি যে ধরনের আচরণ করা হয়েছে, তা নজিরবিহীন। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে আইনগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্বীকৃতি নেই। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান, এঙ্গলিকান গির্জার প্রধান এবং ইংল্যান্ডের

গির্জার প্রধান নেতারা হাউস অব লর্ডসের সদস্য। এসব সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকার অনেক শক্তভাবে প্রয়োগ করা হয়। এর কারণ, যুক্তরাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি আইন নয়, এর ভিত্তি মানুষের সংস্কৃতি, যা অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। যে দেশে পরমতসহিষ্ণুতা আছে, সে দেশেই গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব। যে দেশে গণতন্ত্র রয়েছে, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। গণতান্ত্রিক মানুষ সব সময়ই ধর্মনিরপেক্ষ। কাজেই বিলাতে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য কোনো আইন না থাকাতেও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

দ্বিতীয় খণ্ডে দক্ষিণ এশিয়াতে ধর্মনিরপেক্ষতার আইনগত বিধানসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সে বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা বিভিন্ন ধর্মকে কাছাকাছি নিয়ে আসছে না, বরং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে তফাত, সেটাকে চিরস্থায়ী করছে। ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘুদের একটি আত্মরক্ষার হাতিয়ার; কিন্তু শুধু আইন দিয়ে এর সুফল লাভ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় খণ্ডের আলোচনা থেকে দেখা গেছে, ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান থাকা সত্ত্বেও ভারত কিংবা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আদৌ সুফল লাভ করতে পারেনি। যেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকজন ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না, সেখানে আইনে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৈষম্যের শিকার হয়। ভারতে মুসলমানদের আর্থসামাজিক অবস্থা বর্ণহিন্দুদের তুলনায় অনেক নিচে। বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে। বাংলাদেশেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থান নিচের দিকে। শুধু ধর্মনিরপেক্ষতার আইন দ্বারা সংখ্যালঘুর সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এ সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও পরমতসহিষ্ণুতা আইন করলেই রাতারাতি গড়ে ওঠে না: এগুলো গড়ে ওঠে দীর্ঘদিন ধরে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার চটজলদি কোনো সমাধান নেই। তার জন্য পরমতসহিষ্ণুতার সংস্কৃতি গড়ে উঠতে হবে। এটি শুধু ধর্মের ব্যাপারেই নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই মানতে হবে। এখানে জোর করে কিছু চাপানো যাবে না, সবকিছু করতে হবে আইনের মাধ্যমে। তাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে। রাষ্ট্রে ও সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আস্তে আস্তে সংস্কৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই নিবন্ধের প্রথম খণ্ডে আমরা দেখেছি যে যাঁরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে জাহির করতে চান, তাঁরা সব সময় ধর্মনিরপেক্ষ নন। ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার জন্য মানসিকতার পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। এই মানসিক পরিবর্তন অর্জন করতে সময় লাগবে। তাই সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতা চাইলেও অর্জন করা সম্ভব নয়।

সাম্প্রদায়িকতা এত জঘন্য যে সব যুক্তিবাদী মানুষই এর হাত থেকে পুরোপুরি পরিত্রাণ চায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে সমস্যাটা ছোট। যদি পুরোহিত কিংবা মোল্লার নেতৃত্ব না মানা হয়, তাহলেই ধর্মনিরপেক্ষতা সম্ভব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ধরনের মতবাদে বিশ্বাস করতেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি মজার ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কবিগুরু জার্মানি সফরে গেলে সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কবিগুরু সৈয়দ মুজতবা আলীকে বললেন, "তা যাক বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসছেন কাঁচি হাতে করে?

আমি অবাক! মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে। কাঁচি হাতে করে?

হা! হা! কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি নিয়ে সামনের দাড়ি ছেঁটে দেবেন। পিছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আর কতদিন এরকম আলাদা হয়ে থাকবে।"[১২]

এই ঘটনার বিবরণ পড়লে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় অত্যন্ত বিব্রত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই সমস্যার একটি সমাধান হতে পারে যদি পুরোহিতের টিকি ও মোল্লার দাড়ি কেটে সমাজে এদের প্রাধান্য নির্মূল করা হয়। (অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন যে টিকি কিংবা দাড়ি একবার কাটলেই চলবে না, কয়দিন পরপরই তা গজাবে, টিকি বা দাড়ি কেটে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়, এর জন্য একটি স্থায়ী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য সময়ের প্রয়োজন।) দাড়িবিহীন ও টিকিবিহীন মানুষের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে। অথচ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়নি, শুধু যে হয়নি তা-ই নয়, সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা আরও অনেক তীব্র হয়েছে। এখন শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হচ্ছে না, ধর্মের অজুহাতে মুসলমান মুসলমানকে মারছে, হিন্দু হিন্দুকে মারছে, আঘাত হানা হচ্ছে আহমদিয়া, খ্রিষ্টান, শিখ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীকে।

ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যার সমাধান কাঁচি হাতে মহাপুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সমস্যা সাধারণ মানুষের সমস্যা। এর সমাধান সাধারণ মানুষকেই করতে হবে। বৈষম্যের সমস্যার সমাধান কীভাবে করতে হবে, সেটা রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই জানতেন। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে 'অপমানিত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
> সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, বৈষম্যের ওপর যে ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, তা কখনো টিকে থাকতে পারে না এবং এ ধরনের প্রয়াসের ফলাফল হয় ভয়ংকর। তাই তিনি লিখেছেন :

যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

সবার অধিকার স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় নিজের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে, অন্যথায় নিজের মতের প্রতিও অশ্রদ্ধা দেখা দেবে। এই পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের জন্যও অত্যাবশ্যক। যদি বিরোধী দলের মতের প্রতি কোনো দেশে শ্রদ্ধা না দেখানো হয়, তাহলে সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যে দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয় না, সে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কাজেই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা একে অপরের পরিপূরক। গণতন্ত্র ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ সম্ভব নয় আর ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপস্থিতিতে গণতান্ত্রিক সমাজও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক পরিবেশ।

ভারত ও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শ ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

- ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু সেসব রাষ্ট্রের জন্যই প্রয়োজন নয়, যেসব রাষ্ট্রে অনেক ধর্মাবলম্বী নাগরিক আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা যেখানে শুধু একটি ধর্ম আছে, সেখানেও প্রয়োজন। কারণ, একই ধর্মের অনুসারীর মধ্যে বিভিন্ন গোত্র থাকে। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়লে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের মধ্যেও রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ে। তাই মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে হবে।
- আইনে ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকার থাকতে হবে, কিন্তু আইন কখনো ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতার আইন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রভেদ হ্রাস করে না, এই অধিকার বিভিন্ন ধর্মের বিভেদকে চিরস্থায়ী করে তোলে।
- ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে না। বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রকে ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো চটজলদি সমাধান নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য পরধর্মসহিষ্ণু সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের সংস্কৃতি আইন করলেই গড়ে উঠবে না, আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।
- ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণু গণতন্ত্র। যে দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র আছে, সেখানে আইন করে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে না। আর যে দেশে গণতন্ত্র নেই, সে দেশে আইন করেও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

## পাদটীকা

১. সৈয়দ মুজতবা আলী। ২০০১। 'নেড়ে'। *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব)। ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৪৬৩-৪৬৬
২. সৈয়দ মুজতবা আলী। ২০০১। 'The Origin of the Khojahs and Their Religious Life Today' *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড (প্রথম পর্ব)। ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৩১৫-৪২৬
৩. তপন রায় চৌধুরী। ২০০৩। *রোমন্থন অথবা ভীমরতি প্রাপ্তর পরচরিত চর্চা।* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১২। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী।* ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১-১৩
৫. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১২। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী।* ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ৩৩
৬. টি, এন, মদন। ১৯৮৭। Secularism in Its Place. *The Journal of Asian Studies*. vol-16. No. 4 (Nov.1987), ৭৪৭-৭৫৯
৭. ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট, ভারত সরকার। ২০০৬। Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India (Sachar Committee Report), নয়াদিল্লি।
৮. আলী রীয়াজ। ২০১৪। *ভয়ের সংস্কৃতি।* ঢাকা, প্রথমা, ১০৪-১০৫
৯. প্রাগুক্ত। আলী রীয়াজ। ২০১৪। *ভয়ের সংস্কৃতি।* ঢাকা, প্রথমা, ১০৩
১০. পিটার এল বার্গার। ১৯৭৩। *The Social Reality of Religion* । লন্ডন : এলেন লেইন। ১১৩
১১. গোপাল, এস, সম্পাদিত। ১৯৮০। *Jawaharlal Nehru: An Anthology*। দিল্লি : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৩৩০
১২. সৈয়দ মুজতবা আলী। ২০০১। 'গুরুদেব'। *সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব), ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২৫৬।

# ৪

# সমাজতন্ত্র : পথের শেষ কোথায়?

## ৪.১ সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক বিবর্তন

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্য নিয়ে একটি চুটকি প্রচলিত আছে। প্রশ্ন করা হয়, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে তফাত কী? উত্তর হলো : পুঁজিবাদে মানুষ মানুষকে শোষণ করে। সমাজতন্ত্রে এর উল্টোটি ঘটে। 'মানুষ মানুষকে শোষণ করে' বাক্যকে উল্টালে দাঁড়ায় 'করে শোষণ মানুষকে মানুষ'। যথা পূর্বং তথা পরং। সারকথা হলো, সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদের মধ্যে কোনো তফাত নেই, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র কোনোটিই মানুষকে স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে দিতে পারবে না।

দীর্ঘ স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে আজ বাম ও ডান ঘরানার অর্থনীতিবিদদের অনেকেই ওপরের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন। কিন্তু গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে বাংলাদেশের অজেয় মুক্তিসেনারা যখন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অস্ত্র হাতে তুলে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তখন কিন্তু সমাজতন্ত্রের এ মূল্যায়নের সঙ্গে বামের কোনো অর্থনীতিবিদই একমত হতেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চার দশক ছিল সমাজতন্ত্রের অব্যাহত জয়যাত্রার লগ্ন। রাশিয়া, চীন, পূর্ব ইউরোপ, কিউবা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ভিয়েতনামে পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে মহাকাব্যিক সংঘর্ষে পৃথিবীর শোষিত মানুষের সমর্থন নিয়ে সমাজতন্ত্র জয়লাভ করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের এ বিজয় টিকে থাকতে পারেনি। আশির দশকের শেষ দিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধসে পড়ে। যাঁরা একসময় সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা নিয়ে তত্ত্বের জাল বুনেছেন, তাঁদের কেউই সমাজতন্ত্রের দ্রবীভবন নিয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য বক্তব্য এখন পর্যন্ত দেননি।

সমাজতন্ত্রের সোনালি যুগের তাত্ত্বিকেরা বিশ্বাস করতেন যে সমাজতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী শুধু এ জন্য নয় যে সমাজতন্ত্র মানুষের জন্য কল্যাণকর; সমাজতন্ত্রের জয় ইতিহাসের অমোঘ বিধান। ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা যায় এবং এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে নতুন শক্তি জয়লাভ করে। পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কার্ল মার্ক্স প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে পুঁজিবাদের তিরোধান এবং সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান অনিবার্য। চারটি অনুমানের ভিত্তিতে কার্ল মার্ক্স এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

কার্ল মার্ক্সের প্রথম অনুমান হলো, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণি সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রাক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহ থাকত শ্রমিকশ্রেণির নিয়ন্ত্রণে, যদিও তাঁরা সব সময় এর মালিক হতেন না। কিন্তু পুঁজিবাদী কারখানায় সব উপকরণ থাকে মালিকের নিয়ন্ত্রণে। এর ফলে শ্রমিকেরা উৎপাদনব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতা বা alienation শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে পুঁজিবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, কার্ল মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণি নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে। মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি অবশ্য শর্ত হলো শ্রমিকশ্রেণিসমূহের ক্রমবর্ধমান দুর্দশায়নের সূত্র (Law of immiserization of the working classes)। নিরন্তর কারিগরি পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকের চাহিদা ক্রমাগত কমছে। বেকার সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। শ্রমিকদের মজুরির হার কমছে। বিরামহীন প্রতিযোগিতায় মুনাফার হারও কমছে। এ অবস্থায় শ্রমিকদের ওপর শোষণের মাত্রা বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান দুর্দশায়নের ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যে শ্রমিকদের বিদ্রোহ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

তৃতীয়ত, শিল্পবিপ্লবের আগে শ্রমিকশ্রেণি ঘরে বসে উৎপাদন করত। তারা সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত। শিল্পবিপ্লবের পর শ্রমিকেরা পল্লি অঞ্চল থেকে উৎপাটিত হয়ে ছিন্নমূল মানুষ হিসেবে ভিড় জমিয়েছেন শহরের কারখানাগুলোতে। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রেণির একটি বড় অংশ অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলে জমায়েত হয়। এর ফলে সর্বহারাদের রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত করা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

চতুর্থত, শুধু শোষণের মাত্রা বাড়লেই শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় না। শোষিতদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার জন্য রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন রয়েছে। ইতিহাসের এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুদয় ঘটেছে। এই কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিতের বিদ্রোহ অবশ্যই সফল হবে।

বিংশ শতাব্দীর একপর্যায়ে মনে হয়েছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচ্যুতি দেখা দিলেও ইতিহাসের মূলধারা মার্ক্সের প্রক্ষেপিত পথ ধরেই এগোচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে প্রহসনে। এই অবস্থাতে মার্ক্সের তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখানে তিন ধরনের মতবাদ দেখা যাচ্ছে।

একধরনের মতবাদে বিশ্বাস করে প্রাচীনপন্থী কমিউনিস্টরা। তারা মনে করে না যে সমাজতন্ত্র হেরে গেছে। তারা মনে করে, সমাজতন্ত্রের সাময়িক পরাজয় ঘটেছে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতন্ত্র জয়লাভ করবে। কাজেই তারা বিশ্বাস করে যে মার্ক্সের বিশ্লেষণ অভ্রান্ত এবং এর কোনো সংশোধনের প্রয়োজন নেই। যারা এই মতবাদে বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে যুক্তির ভিত্তিতে তর্ক করার কোনো জো নেই।

দ্বিতীয় ঘরানার বামপন্থীরা বিশ্বাস করে যে মার্ক্সের ব্যাখ্যা অভ্রান্ত; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন মার্ক্সের অপব্যাখ্যার ওপরে গড়ে ওঠেছিল। এ ধরনের ব্যাখ্যা দেখা যাবে লর্ড মেঘনাদ দেশাইয়ের *Marx's Revenge* গ্রন্থে।[১] এই তত্ত্ব অনুসারে মার্ক্স পুঁজিবাদের অসাধারণ উৎপাদনশীলতায় বিশ্বাস করতেন এবং মার্ক্স মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিবাদ উৎপাদনশীল থাকবে, তত দিন সমাজতন্ত্রের জয় হবে না। মার্ক্সের মতে, সমাজতন্ত্র তাই আত্মপ্রকাশ করবে সেসব দেশে, যেখানে পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছেছে। অথচ বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদ ছিল একটি দুর্বল শক্তি। মার্ক্সের বিশ্লেষণে এ ধরনের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। বিংশ শতাব্দীতে মার্ক্সের ব্যাখ্যার সঙ্গে আরও একটি তত্ত্ব যুক্ত হয়। এই তত্ত্বটি হলো সাম্রাজ্যবাদ। মার্ক্স সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তত্ত্ব প্রণয়ন করেননি; এই তত্ত্বের জন্ম হয়েছে লেনিন, রোজা লুক্সেমবার্গ ও হবসনের মতো বামপন্থী দার্শনিকদের হাতে। সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের বক্তব্য ছিল যে পুঁজিবাদ তার উৎপাদনশীলতার ফলে টিকে নেই; এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে। যখন উপনিবেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্ত হবে, তখন পুঁজিবাদী বিশ্বেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটে, কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত থাকে। এ ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা বলেন যে সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব ছিল ভুল, মার্ক্স সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের উদ্ভাবন করেননি। সুতরাং বিশ শতকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য মার্ক্সকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

তৃতীয় ঘরানার সমালোচকেরা বলেন, সমাজবিপ্লব সম্পর্কে মার্ক্সের যে বক্তব্য, তাতে কিছু ত্রুটি রয়েছে। মার্ক্সের বক্তব্য ছিল যে শোষক ও শোষিতের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এ সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সব শোষিত মানুষকে একত্র করে তুলছে। মার্ক্স মনে করতেন, সব শোষিত মানুষই হচ্ছে সমজাতীয় (homogeneous), এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই এদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা মোটেই দুরূহ নয়। এ ধারণা সত্য নয়। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে শুধু সামাজিক একক বন্ধন (mono-sociality) দেখা যায়। একটি হাতি শুধু একটি পালের সদস্য, একটি পাখি শুধু একটি ঝাঁকের অংশ। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের সমাজে রয়েছে বহুবিদ বন্ধন (multisociality)। পল্লি অঞ্চল হতে উৎপাটিত একজন ছিন্নমূল মানুষ শুধু কারখানার শ্রমিক নন, তাঁর ধর্মীয় সত্তা রয়েছে, তাঁর ভাষাগত সত্তা রয়েছে, তাঁর আঞ্চলিক সত্তা রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকেরা নানা ভাষায় কথা বলেন। একই ভাষার শ্রমিকের মধ্যে একধরনের বন্ধন থাকে। আবার শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মের বিভিন্নতা থাকে। একই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে। কাজেই শ্রমিকেরা ভিন্ন ভিন্ন উপাসনালয়ে যান। তাই শ্রমিকদের সামাজিক বন্ধনে পার্থক্য ঘটে। সব শ্রমিক সমজাতীয় নন, তাঁরা বহুজাতীয়। বহুজাতীয় জনগোষ্ঠীর সংগঠন সহজ নয়। এদের মধ্যে তাই দেখা দেয় নানাবিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভাষার ভিন্নতার জন্য বিহারি-বাঙালি শ্রমিকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, ধর্মের ভিন্নতার জন্য হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকেরা একে অপরকে হামলা করেন। এমনকি জেলার ভিন্নতার জন্য, অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিন্নতার (যথা শিয়া/সুন্নি) জন্য হানাহানি দেখা দেয়। তাই শোষিত শ্রেণি সম্মিলিতভাবে শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে নিজেরাই অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। মার্ক্স অনুমান করেছিলেন যে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণির কাছে শোষণই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কাজেই অন্য সব সামাজিক সত্তা সর্বহারাদের শ্রেণিচেতনায় হারিয়ে যাবে। কিন্তু মার্ক্সের এ অনুমান মোটেও সঠিক নয়। দীর্ঘদিনের সমাজতান্ত্রিক নিরীক্ষার পর আজও সার্বিয়ার শ্রমিকশ্রেণি বসনিয়ার শ্রমিকশ্রেণির ওপর আক্রমণ সমর্থন করছে। সোভিয়েত রাশিয়া অথবা চীনে ধর্মীয় বা আঞ্চলিক জাতীয় চেতনা কোনোটাই হারিয়ে যায়নি।

দ্বিতীয়ত, মার্ক্স সমাজে মাত্র দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন : শোষক ও শোষিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব শ্রেণিকেই দুটি শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। মার্ক্সীয় তত্ত্বে তাই অন্তর্বর্তী (Intermediate) শ্রেণির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দক্ষ কারিগর শ্রেণি (Artisan),

ক্ষুদ্র নিয়োগকারী (Small employer), পাতি বুর্জোয়া, কারখানাতে তত্ত্বাবধানকারী ব্যবস্থাপক এবং পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মার্ক্স মনে করতেন, শ্রেণিসংগ্রামের মেরুকরণের প্রক্রিয়াতে অন্তর্বর্তী শ্রেণিসমূহ শোষক বা শোষিত শ্রেণির মধ্যে আত্মীভূত হয়ে যাবে, কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে অন্তর্বর্তী শ্রেণি মুছে যায়নি, ইতিহাসের প্রক্রিয়াতে আরও শক্তিশালী হয়েছে। মার্ক্স অনুমান করেছিলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে বেশির ভাগ কর্মসংস্থান হবে প্রক্রিয়াজাত শিল্পে মজুরিভিত্তিক কাজে। প্রকৃতপক্ষে এ অনুমান সঠিক হয়নি। বেশির ভাগ মানুষ প্রক্রিয়াজাত শিল্পে কাজ করে না, কাজ করে সেবা খাতে এবং এদের অনেকেই শ্রমিক নয়। এরা বেশির ভাগ স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত। ১৯৯০ সালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে ৩০ শতাংশ শ্রমিক শিল্পে কাজ করেন, ৬০ শতাংশ শ্রমিক কাজ করেন সেবা খাতে আর ১০ শতাংশ কাজ করেন কৃষি খাতে। সেবা খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫—এই দশকে শিল্পোন্নত দেশসমূহের মোট শ্রমশক্তিতে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যার অনুপাত ৪২ শতাংশ থেকে ৩৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

তৃতীয়ত, মার্ক্স শুধু কারখানার মালিকদের শোষণ নিয়ে আচ্ছন্ন ছিলেন না, তিনি ধনীদের ওপর গরিবদের শোষণ নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু দরিদ্ররাও যে দরিদ্রদের শোষণ করে, সে কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। দরিদ্ররা সবাই সমশ্রেণির নয়, এর ফলে দরিদ্রদের শুধু ধনীরাই শোষণ করে এ কথা সত্য নয়, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল দরিদ্ররাও শোষণ করে। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন, সমাজে একটি স্তরে শোষক আর শোষিতেরা জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু তিনি লক্ষ করেননি, সমাজের স্তরে স্তরে শোষক আর শোষিতের সংঘর্ষ চলছে। এক স্তরে যিনি শোষক, পরবর্তী স্তরে তিনিই শোষিত। তাই সমাজে সর্বহারা শ্রেণিচেতনা ঘনীভূত হতে পারে না। বাংলাদেশে শ্রমিকশ্রেণি ভূমি সংস্কারের বিরোধিতা করে। মার্ক্সের ব্যাখ্যা অনুসারে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত শ্রমিকেরা সর্বহারা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এরা বিশেষ সুবিধাভোগী সামাজিক গোষ্ঠী। কৃষি অথবা অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তুলনায় আনুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় অনেক বেশি। এর ফলে অনেক শ্রমিকের পক্ষেই মজুরির টাকা জমিয়ে গ্রামে ভূসম্পত্তি কেনা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে ড. কামাল সিদ্দিকী ও তাঁর সহকর্মীদের ঢাকা শহরের আনুষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্যাদি স্মরণ করা যেতে পারে।[২] ঢাকা শহরে আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের শতকরা ৮০ ভাগের গ্রামে ভিটা ও জমি রয়েছে। যাঁদের জমি আছে, তাঁদের গড় জমির

পরিমাণ ১.৩ একর। তাঁদের বেশির ভাগই গ্রামে ভাগচাষি। অথবা ভূমিহীন শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করান। ১৯৮৮ সালের বাজারমূল্যে তাঁরা প্রত্যেকে গ্রামের ভূসম্পত্তি থেকে গড়ে বছরে ৪ হাজার টাকা আয় করেন। আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিকই হলেন গ্রামাঞ্চলে অনুপস্থিত ভূস্বামী। শহরে তাঁরা মালিকদের বিপক্ষে স্লোগান দিলেও তাঁদের অবস্থান ভাগচাষি ও ভূমিহীন শ্রমিকদের বিপক্ষে। এ ধরনের সমাজব্যবস্থাতে সর্বহারার চেতনা দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

কারণ যা-ই হোক, স্নায়ুযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জয়লাভ করেনি। এর অর্থ এই নয় যে সমাজতন্ত্রের যে স্বপ্ন, তা-ও মুছে গেছে। সমাজতন্ত্রের মূল স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ও সর্বহারা শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। এ স্বপ্নগুলো যত দিন বাস্তবায়িত না হবে, তত দিন এরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে। অর্থনৈতিক চিন্তার ঐতিহাসিক স্কট গর্ডন যথার্থই বলেছেন :

> Empires rise and fall; races and nations flourish and then disappear, preachers of new doctrines are crucified or burnt at the stake, heretical books are destroyed, but basic ideas never die. The culture absorbs them. Like an organism digesting the nutriment essential to its existence, and the elements reappear, time and again, in new forms.[৩]

সমাজতন্ত্রের মূল ধারণাসমূহ মৌল ধারণা। কমিউনিজমের আতঙ্ক অপসৃত হলেও এসব ধারণা পরিবর্তিত হবে না। কমিউনিজম মরে গেলেও নতুন করে সমাজতন্ত্রকে আবিষ্কার করতে হবে।

ওপরে সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক বিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে সমাজতন্ত্রে মত ও পথ নিয়ে কোনো ঐকমত্য নেই। যদি কোনো রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দল সমাজতন্ত্র বাস্তবায়ন করতে চায়, তবে তাকে নিজের মতো করে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার মূল্যায়ন করা এবং নতুন কী কী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করা। প্রবন্ধটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের বিবর্তন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই পর্যালোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সমাজতন্ত্রের কোনো সংজ্ঞা নেই। দ্বিতীয় অংশে তাই বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশেও দলভেদে সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা ভিন্ন। সৌভাগ্যবশত বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। তবে বিশ্বায়নের যুগে এসব লক্ষ্য অর্জন কতটুকু সম্ভব, সে সম্পর্কে বিতর্কের সুযোগ রয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের সংবিধানের

আলোকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রকে অর্থবহ করার জন্য আর কী কী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

## ৪.২ বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় তৃতীয় অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১০ম অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বিধান করা হয় :

'মানুষের ওপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।' উপরন্তু রাষ্ট্রের নাম করা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা সরকারের দায়িত্ব। অবশ্য ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সমাজতন্ত্র নিয়ে নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা উদ্ভব হয়। সামরিক শাসকেরা সংবিধানের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করেন এবং এর স্থলে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিম্নরূপ বক্তব্য প্রতিস্থাপন করেন। 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।' এই পরিবর্তনের তাৎপর্য হলো, তৎকালীন সরকার সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে সরে আসে। কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকে। অবশ্য সামরিক শাসকেরা সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র একেবারে বাদ দেননি। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয় :

> জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১৯৭৮ সালে সামরিক শাসক কর্তৃপক্ষ মূলনীতিসমূহ পরিবর্তন করেনি, তবে সংবিধান সংশোধন করে সমাজতন্ত্র শব্দটির একটি ব্যাখ্যা দান করে। এই

ব্যাখ্যা অনুসারে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের অর্থ করা হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার। তবে সংবিধানের প্রস্তাবনায় শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার থেকে যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সামরিক শাসকদের বক্তব্য ছিল দুটি। প্রথমত, সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের তাৎপর্য হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার, এর পেছনে কোনো তাত্ত্বিক মতবাদ নেই। পরবর্তীকালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সংসদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ অনেক অনুচ্ছেদে পুনরায় বিবৃত হয়েছে। সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দুই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: প্রথমটি হলো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তবায়নের লক্ষ্য এবং দ্বিতীয়টি হলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।' সংবিধানের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রাম অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করবার জন্য গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৯.১ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে সব নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৯.২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' এ ছাড়া সংবিধানে কর্ম সম্পর্কে নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছে। "কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী'—এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।" সংবিধানের উপরিউক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে।

সংবিধানে শুধু আদর্শগত লক্ষ্যই নির্ধারণ করা হয়নি, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যও সরকারকে সুস্পষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিম্নলিখিত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। 'রাষ্ট্রের

অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়।'

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার।

(গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য।

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য।

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সংবিধানের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মূলত সংবিধানে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছে তার পেছনে কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নেই। সংবিধানের কোথাও মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ বা মাওবাদের মতো কোনো তত্ত্ব উল্লেখিত হয়নি। এর কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের আগে একটি সমাজতান্ত্রিক দল ছিল না।

বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেছেন।[৪] বঙ্গবন্ধু যখন খুলনা জেলে ছিলেন, তখন খুলনার সিভিল সার্জন ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন সাহেব। সিভিল সার্জনরা জেলা জেলের এক্স-অফিসিও সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তিনি খুলনা জেল পরিদর্শন

করতে এসে শোনেন যে শেখ মুজিব এই জেলে রয়েছেন। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান। এর পরের ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমি যেয়ে দেখি তিনি বসে আছেন। আমাকে বসতে বললেন তাঁর কাছে। আমি বসবার সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেন জেল খাটছেন।" আমিও উত্তর দিলাম, "ক্ষমতা দখল করার জন্য।" তিনি আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "ক্ষমতা দখল করে কী করবেন?" বললাম, "যদি পারি দেশের জনগণের জন্য কিছু করবো। ক্ষমতায় না যেয়ে কি তা করা যায়?" তিনি আমাকে বললেন, "বহুদিন জেলের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। অনেক রাজবন্দির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। অনেকের সাথে আলাপ হয়েছে, এভাবে কেউ আমাকে উত্তর দেয় নাই, যেভাবে আপনি উত্তর দিলেন। সকলের ঐ একই কথা, জনগণের উপকারের জন্য জেল খাটছি। দেশের খেদমত করছি, অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না বলে প্রতিবাদ করেছি, তাই জেলে এসেছি। কিন্তু আপনি সোজা কথা বললেন, তাই আপনাকে ধন্যবাদ দিলাম।'" বঙ্গবন্ধুর উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে তাঁর রাজনৈতিক প্রণোদনা স্পষ্ট। তিনি প্রথমে ক্ষমতায় যেতে চান। ক্ষমতায় যাওয়ার পর তিনি জনগণের উপকার করতে চান। জনগণের কী উপকার করতে চান, তার তালিকা বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের লোকের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যসমূহে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক চাহিদার বাইরেও সংবিধানে কিছু আদর্শগত লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঘোষণা করা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান।' সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন করিবার জন্য এবং সুষম সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' এই সব প্রতিশ্রুতির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে। তবে এর কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো সংবিধানে নেই। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতেও এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। তবে পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমি নিজে কমিউনিস্ট নই, তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতোদিন দুনিয়ায় থাকবে ততোদিন দুনিয়ার মানুষের ওপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না।'[৫] সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায়, তার সংজ্ঞা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কিছু লিখেননি। তবে যেসব আদর্শবাদী বক্তব্য (যথা মেহনতি মানুষের শোষণ হইতে মুক্তি) সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে সে সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য

নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। তবু দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কের ফলে ডান ও বামের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি লক্ষ্য নিয়ে সব ধরনের অর্থনীতিবিদেরাই একমত।

১. **মানুষের মৌল চাহিদা পূরণে সরকারের ভূমিকা :** পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা মনে করতেন যে মানুষের সব সমস্যার সমাধান হবে বাজারপদ্ধতির মাধ্যমে। দারিদ্র্য দূরীকরণে তাই সরকারের কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে এখন বাম এবং ডান ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা সবাই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে একমত। শুধু অর্থনীতিবিদেরাই নন, রাজনীতিবিদেরাও এ সম্পর্কে একমত। প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে সরকারের ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা স্বীকার করা হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে শুধু দারিদ্র্য নিরসনই যথেষ্ট নয়, দারিদ্র্যের অর্থবহ পরিবর্তন ঘটাতে হলে স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে পরিবর্তন আনতে হবে। এর ফলে জাতিসংঘ কর্তৃক সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium development goals) গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যথেষ্ট নয় টেকসই উন্নয়নের জন্য, আরও নতুন লক্ষ্যমাত্রার প্রয়োজন রয়েছে। তাই বর্তমানে এসডিজি (Sustainable development goals) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অনেক দাবি মেটাতে পারে।

২. **বেকার সমস্যা :** সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি বড় কারণ হলো শ্রমিকশ্রেণির ক্রমবর্ধমান দুর্দশায়ন। দুর্দশায়নের একটি বড় কারণ হলো বেকার সমস্যা। কারিগরি পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকদের চাহিদা কমে যাচ্ছে। এর ফলে শ্রমিকেরা চাকরি হারাচ্ছেন এবং নতুন চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা চলতে থাকলে ক্রমে দেশে বেকারের সমস্যা বাড়তে থাকবে। কাজেই পরিকল্পিত উপায়ে বেকার সমস্যা সমাধান না হলে শোষিত শ্রেণির পক্ষে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিকল্পিত উপায়ে শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদিও সমাজতন্ত্রের উদ্যোগ বাস্তবায়নে জরুরি।

৩. **আর্থিক অসাম্য হ্রাস :** সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমাজে অসাম্য বেড়েই চলেছে। এক ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন যে এ অসাম্য সব সময় বাড়বে না এবং একসময় কমে আসবে। আবার আরেক ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন যে এই অসাম্য বাড়তেই

থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির ওপর ব্যক্তির মুনাফা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি থাকবে। তবে বর্তমানে বেশির ভাগ দেশেই অসাম্যের হার প্রকট এবং এই অসাম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন সম্পর্কে বাম ও ডানের অনেক অর্থনীতিবিদই একমত।

সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োজন কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলই সমাজতন্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নিয়ে আসেনি। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিকল্প ব্যাখ্যা না আসে, ততক্ষণ সমাজতন্ত্রের দাবি বাস্তবায়নের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ, বেকার সমস্যা দূর ও অর্থনৈতিক অসাম্য হ্রাস করাকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি।

## ৪.৩ বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ

রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব; অথচ এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী লীগ, যা সমাজতান্ত্রিক দল ছিল না। পার্টির উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডার ছাড়া সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। অথচ ক্ষমতাসীন দলের কোনো সমাজতান্ত্রিক ক্যাডার ছিল না। উপরন্তু আধা সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণ ছিল একটি জটিল উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সমাজব্যবস্থার উত্তরণ হবে পর্যায়ক্রমিক। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত রণকৌশল নির্ধারণ করা হয়:

> Reforms to such an end are needed to be worked out in phases. In landownership, cooperatives among small and landless farmers, in large, heavy and basic industries ascendancy of the public sector, in trade, both domestic and international as well as in housing, transport and distribution, state and cooperatives will largely rule leaving small enterprises in private hands. In such a society, where the functions of the state is usually more than in a welfare state, the public sector perforce will be expanded.[৬]

সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন ছাড়াও পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক উদ্যোগের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে পর্যায়ক্রমিক উত্তরণের বদলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নাটকীয় সম্প্রসারণ ঘটে। ১৯৭০ সালে শিল্প খাতে মোট পরিসম্পদের ৩৪ শতাংশের মালিক ছিল সরকার; ১৯৭২ সালে সরকারি মালিকানার হার ৯২ শতাংশে দাঁড়ায়। এর মধ্যে ৩৪ শতাংশ বাংলাদেশ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রের মালিকানায় ছিল; ৪৩ শতাংশ ছিল পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং ১৫ শতাংশের মালিক ছিল বাংলাদেশিরা।

পাট, বস্ত্র, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, প্রকৌশল, জাহাজ নির্মাণ, সার, ওষুধ, রসায়ন, তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ, কাগজ, বনজ শিল্পসহ ২৫৪টি কারখানা জাতীয়করণ করা হয়। এসব খাতে ১৫ লাখ টাকার বিনিয়োগ রয়েছে এ ধরনের সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। এ ছাড়া ১ হাজার ১৭৫টি শাখাসহ সব ব্যাংক ও বিমাপ্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশের জাতীয়করণ করা হয়।

গণখাতের এই অভূতপূর্ব সম্প্রসারণের লক্ষ্য ছিল তিনটি। প্রথমত, এই ব্যবস্থার ফলে নতুন ধনিকশ্রেণির অভ্যুদয় ঘটে। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল, এসব খাতের মুনাফা দিয়ে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থের জোগান দেওয়া। এই লক্ষ্য অর্জনে জাতীয়করণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ সত্ত্বেও বেশির ভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠান অদক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে বিপুল পরিমাণ লোকসানের বোঝা রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেয়। অনেক প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের পরও এবং সরকার থেকে বিপুল পরিমাণ পুঁজি ও ভর্তুকি দেওয়ার পরও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন শিল্পসমূহ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে, কমপক্ষে ৮৮৩ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। বস্তুত এই লোকসানের হিসাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর সব রকম দায়দেনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রকৃত লোকসানের মাত্রা অনেক বেশি। কাজেই জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এর লাভ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের অর্থের সংস্থান করার লক্ষ্য কখনো অর্জিত হয়নি। পক্ষান্তরে এই সব প্রতিষ্ঠান চালু রাখার জন্য রাষ্ট্রকে অন্য খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যয় করতে হয়েছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে জাতীয়করণ করা হয়, সেসব প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু বিপুল পরিমাণ জাতীয় সম্পদের অপচয়ই ঘটায়নি, এই সব খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

জাতীয়করণের তৃতীয় লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা ও ট্রেড ইউনিয়নকে মেহনতি মানুষের স্বার্থে শক্তিশালী সংগঠনরূপে গড়ে তোলা। দুর্নীতি ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যর্থতার ফলে জাতীয়কৃত শিল্পে শ্রমিকদের স্বার্থ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে ট্রেড ইউনিয়নের স্বল্পসংখ্যক নেতা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থাপকদের সহযোগে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুট করেন। জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানসমূহে ট্রেড ইউনিয়ন মার্ক্সের কল্পিত বিপ্লবের অগ্রদূত হওয়ার পরিবর্তে মনসুর অলসন বর্ণিত 'বন্টনমূলক কোয়ালিশন' (distributional coalition) রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৭] এদের কোয়ালিশন স্বল্পসংখ্যক নেতার জন্য অনুপার্জিত মুনাফার ব্যবস্থা করে। যে সমাজে এ ধরনের

কোয়ালিশন প্রাধান্য লাভ করে, সে সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে অনীহা দেখা দেয়; অলসন এর নাম দিয়েছেন 'institutional sclerosis'. জাতীয়কৃত শিল্পসমূহ বাংলাদেশের অগ্রগতির অগ্রদূত না হয়ে ব্যক্তিস্বার্থভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। ব্যাংক জাতীয়করণ করে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ সৃষ্টি করে এসব প্রতিষ্ঠানকে প্রায় দেউলিয়া করে তোলে। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তাড়াহুড়া করে ক্যাডারবিহীন রাষ্ট্রে জাতীয়করণের যে মহাযজ্ঞ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়, তা শুধু ব্যর্থই হয়নি; তা ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে।

বাংলাদেশে মেহনতি মানুষের শাসন কায়েম না হলেও মানুষের মৌল চাহিদা পূরণে অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কৃষি উৎপাদনে পশ্চাৎপদ থাকার ফলে বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে ক্ষুধার সমস্যা ছিল প্রকট। গত চার দশকে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে মোট এক কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হতো। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অনেক কৃষিজমি অকৃষি খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর ফলে মোট কৃষিজমির পরিমাণ কমে গেছে। তবু ২০১৪ সালে ৩.৪ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। অবশ্য এ উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিসংস্কার করা হয়নি। সমবায়ী উৎপাদন ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়নি। বড় বড় যন্ত্রপাতিনির্ভর কোনো যৌথ খামারও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। শুধু নতুন প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে ক্ষুদ্র কৃষকেরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই এই সাফল্য অর্জন করেছেন। সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশে তিনটি ক্ষেত্রে জরুরি ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে :

(১) জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, (২) বেকার সমস্যা হ্রাস, (৩) সম্পদের অসম বণ্টনের প্রবণতা প্রতিহত করা এবং সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

### ১) জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ

দ্বিতীয় খণ্ডে দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশের সংবিধানে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার রয়েছে। এই অঙ্গীকার পূরণের জন্য গত চার দশকে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর সামগ্রিক ফলাফল দেখা যাবে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের হারের ওপর। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের হার নির্ধারণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এখানে তিনটি পদ্ধতিতে প্রাক্কলিত হার সারণি-৪.১-এ পেশ করা হয়েছে।

## সারণি-৪.১
## বাংলাদেশে দারিদ্র্যের গতিধারা

| বছর | চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার | দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার | নিম্ন পর্যায়ের আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার |
|---|---|---|---|
| ১৯৯০-৯১ | - | - | ৭০.২ |
| ১৯৯১-৯২ | ৪১.১ | ৫৬.৭ | |
| ১৯৯৫-৯৬ | ৩৫.২ | ৫০.১ | |
| ২০০০ | ৩৪.৩ | ৪৮.৯ | |
| ২০০৫ | ২৫.১ | ৪০.০ | |
| ২০১০ | ১৭.৬ | ৩১.৫ | ৪৩.৩ |
| ২০১৫ | ১২.৯ | ২৪.৮ | |

উৎস : বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা

যাদের খাদ্য এবং অখাদ্য খাতে মোট ব্যয় ২ হাজার ১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহণের জন্য যে পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন, তার কম বা সমান তাদের চরম দরিদ্র চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সারণি-৪.১ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে এই হার ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৪১.১ শতাংশ। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রক্ষেপণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই হার ২০১৫ সালে ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমার প্রাক্কলন হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ৫৬.৭ শতাংশ থেকে ২৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। চরম দারিদ্র্যের হার অপেক্ষাকৃত বেশি হ্রাস পেয়েছে। তবে নিম্ন আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার ভিত্তিতে যে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ৭০.২ শতাংশ থেকে ৪৩.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এখানেও দারিদ্র্যের হার হ্রাসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তবে এই পরিমাপ অনুসারে বাংলাদেশে এখনো দারিদ্র্যের হার বাংলাদেশের জাতীয় দারিদ্র্যের উচ্চহারের চেয়ে বেশি।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে গত চার দশকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেছে। তবে যেহেতু শুরুতেই বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ, তাই দারিদ্র্যের হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য

দেশের তুলনায় এখনো দারিদ্র্যের পরিমাণ বেশি। তাই জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য এই হার ভবিষ্যতে আরও অনেক কমাতে হবে। প্রশংসনীয় অর্জন হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই অর্জন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। দারিদ্র্যের হার হ্রাসে বাংলাদেশকে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস করাই যথেষ্ট নয়, এখানে পুষ্টি পরিস্থিতি এখনো মোটেও সন্তোষজনক নয়। এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশদূষণের সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশ দূষণের প্রভাব প্রধানত দরিদ্রদেরই বহন করতে হয়। কাজেই শুধু দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা হ্রাস করলেই বাংলাদেশে দরিদ্রদের মৌলিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না। বাংলাদেশে পরিবেশ খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে যখন নগর দারিদ্র্যের সংখ্যা প্রকট হচ্ছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। এ সম্পর্কে কিছু তথ্য সারণি-৪.২-এ দেখা যাবে।

**সারণি-৪.২**

**শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি**

| অর্জনের বিষয় | ১৯৯০-৯১ | ২০১৫ |
|---|---|---|
| গড় আয়ুর প্রত্যাশা | | ৭০.৭ |
| বয়স্কদের শিক্ষার হার | ৩৭.২ | ৬১ |
| প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার | ৬০.৫ | ৯৭.৭ |
| ৫ বছরের কম বয়স্ক কম ওজনের শিশুদের হার | ৬৬ | ৩২.৫ |
| ৫ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জনে) | ১৪৬ | ৪৬ |
| মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি লাখে) | ৫৭৪ | ১৭০ |
| জন্মনিরোধক ব্যবহারের হার | ২৯.৭ | ৬২.৪ |

উৎস : বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

গত চার দশকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অবশ্যই পরিমাণগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে পরিমাণগত উন্নতিই যথেষ্ট নয়, এখানে মানের উন্নতির প্রশ্নও রয়েছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বিশ্বের তুলনায় মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। এর ফলে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য এই খাত দুটির মানোন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

### ২) বেকার সমস্যা হ্রাস

বাংলাদেশের সংবিধানে কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যারা বেকার, তাদের পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের সংবিধানের ২০(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তৃত্ব এবং সম্মানের বিষয় এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতা অনুসারে ও প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী'—এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।" বেকার সমস্যা হ্রাস করা তাই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশে বেকারত্বের হার নির্ধারণে একটি বড় সমস্যা রয়েছে। পাশ্চাত্যের শ্রমবাজার বাংলাদেশের শ্রমবাজারের চেয়ে ভিন্ন। কাজেই পাশ্চাত্যে যে ভিত্তিতে বেকারের হার নির্ধারণ করা হয়, সেই ভিত্তি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অচল। বাংলাদেশে যাঁরা সপ্তাহে এক ঘণ্টার জন্যও কাজ করেননি অথচ সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজছিলেন, শুধু তাঁদেরই বেকার বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে পাশ্চাত্য জগতের মতো বেকারদের জন্য কোনো ভাতা নেই এবং সামাজিক নিরাপত্তাজালের বেষ্টনীও সীমিত। তাই অনেককেই বেঁচে থাকার জন্য অনানুষ্ঠানিক খাতে কিছু করতে হয়। এ ধরনের কাজকে কোনোক্রমেই কর্মসংস্থান বলে গণ্য করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশে যেসব ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে চাকরি খোঁজ করে, তাদের বেশির ভাগই গৃহশিক্ষক হিসেবে খণ্ডকালীন কাজ করে থাকে। খণ্ডকালীন কাজের এই আয় তার নিজের বেঁচে থাকার জন্যই যথেষ্ট নয়। এ ধরনের ব্যক্তিরা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অথচ সরকারের হিসাবে এরা চাকরি করছে। এ ধরনের ব্যক্তিরা কাজ করছে, এই হিসাব মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এর ফলে বাংলাদেশের বেকারত্ব সম্পর্কে যেসব তথ্য রয়েছে, তা প্রায় অর্থহীন। (সারণি-৪.৩ দেখুন)

সারণি-৪.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে মাত্র ৪ শতাংশ লোক বেকার। অথচ শিল্পোন্নত দেশ বা OECD দেশগুলোতে বেকারত্বের হার ৮.২ শতাংশ। একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ৮.৩ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যে ছিল ৮.২ শতাংশ। বাংলাদেশে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বেকারত্বের হার কম, এ ধরনের বক্তব্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে বেকার নয়, এ ধরনের জনসংখ্যার মধ্যে দরিদ্রের হার অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে কর্মরত ব্যক্তিদের ৭০.৪

## সারণি-৪.৩
## কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্বের হার

| দেশ | বেকারত্বের হার (%) | বছর |
|---|---|---|
| উন্নত দেশগুলো | ৮.২ | (২০১২ : প্রথম তিন মাস) |
| ইউরো অঞ্চল | ১০.৮ | " |
| ফ্রান্স | ১০.০ | " |
| জার্মানি | ৫.৬ | " |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮.৩ | " |
| যুক্তরাজ্য | ৮.২ | (২০১২ : জানুয়ারি) |
| বাংলাদেশ | ৪. | (২০১০) |
| ইন্দোনেশিয়া | ৭.৯ | (২০০৯) |
| থাইল্যান্ড | ১.০ | (২০১০) |
| পাকিস্তান | ৫.৬ | (২০১০) |
| ভারত | ৩.৬ | (২০০৯-১০) |
| ভিয়েতনাম | ২.৭ | (২০১০) |

উৎস: রিজওয়ানুল ইসলাম, ২০১৫, *উন্নয়ন ভাবনায় কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার।* ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। ২০১০ সালে এই হার ৪১.৭ শতাংশে নেমে আসে।[৮] যে ব্যক্তি কাজ করেও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে, তাকে কর্মরত বলে গণ্য করা যায় না।

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের বেকারের হারের সংজ্ঞা গ্রহণ না করে নিম্নলিখিত দুটি সংজ্ঞা বিবেচনা করা যেতে পারে :

১. যারা সপ্তাহে কমপক্ষে এক ঘন্টা কাজ করে এবং যাদের আয় আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে, তাদের কর্মরত গণ্য করা যেতে পারে। এই হিসাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশে যে ৯৬ শতাংশ ব্যক্তি কাজ করে, তাদের ৪১.৭ শতাংশের আয় দারিদ্র্যসীমার নিচে। অর্থাৎ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস যে ৯৬ শতাংশ ব্যক্তিকে কর্মরত গণ্য করছে, তার মধ্যে আয়ের দিক থেকে ৩৯ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এই ৩৯ শতাংশকে বেকার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের ৪ শতাংশ বেকারত্বের হার। এই ভিত্তিতে হিসাব করলে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার প্রায় ৪৩ শতাংশ। কোনোমতেই ৪ শতাংশ নয়।

২. ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস বাংলাদেশে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছে। বাংলাদেশের শ্রমশক্তির জরিপে দৃশ্যমান প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের পরিমাপ করা হয়। এই জরিপে যারা সপ্তাহে গড়ে ৩৫ ঘণ্টার কম কাজ করে, তাদের দৃশ্যমান প্রচ্ছন্ন বেকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য যারা ৩৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করে, তাদের অনেকের আয়ও আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে হতে পারে। প্রচ্ছন্ন বেকারত্বে মজুরির হার সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয় না। কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে কি না, শুধু সেটিই দেখা হয়। বাংলাদেশে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার সারণি-৪.৪-এ দেখা যাবে।

**সারণি-৪.৪**

**বাংলাদেশে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার**

| এলাকা | ১৯৯৯-২০০০ | ২০০২-২০০৩ | ২০০৫-২০০৬ | ২০১০ |
|---|---|---|---|---|
| জাতীয় | ১৬.৬ | ৩৪.২ | ২৪.৫ | ২০.৩ |
| পল্লি অঞ্চল | ১৭.৮ | ৩৬.৪ | ২৭.৮ | ২২.৭ |
| শহর অঞ্চল | ১২.২ | ২৬.৭ | ১৩.৯ | ১২.৪ |

উৎস : বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে ২০০২-০৩ সালে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার কেন এত দ্রুত বেড়েছে, তার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। যদি আমরা বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের হার মেনে নিই, তাহলেও বাংলাদেশে ২০১০ সালে ২০.৩ শতাংশ লোক প্রচ্ছন্ন বেকার ছিল। এর সঙ্গে ৪ শতাংশ বেকার যোগ করলে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার দাঁড়ায় ২৪.৩ শতাংশ।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে প্রকৃত বেকারত্বের হার কমপক্ষে ২৪.৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ বেকারের হার ৪৩ শতাংশ। ১৯৩০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। এই পরিস্থিতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Great depression বা মহামন্দার যুগ বলা হয়ে থাকে। সরকারি হিসাবের ভিত্তিতেই বাংলাদেশে এখনো শ্রমবাজারে মহামন্দা বিরাজ করছে। তবে এখানে উল্লেখ করতে হয় যে এই পরিস্থিতি আরও অনেক ভয়াবহ ছিল। দুটি কারণে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। প্রথমত, প্রায় ৯০ লাখ থেকে ১ কোটি বাঙালি দেশের বাইরে কর্মরত। সুতরাং

এই জনসংখ্যার জন্য দেশে কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়নি। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে অনেক নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। তবু এখনো বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে।

### ৩) অর্থনীতিতে অসাম্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অসাম্যের হার বাড়ছে। এ সম্পর্কে তথ্য সারণি-৪.৫-এ দেখা যাবে।

**সারণি-৪.৫**

**বাংলাদেশে আয়ের অসাম্যের প্রবণতা, ১৯৮৩-২০১০**

| অর্থবছর | জিনি সহগ |
|---|---|
| ১৯৮৩-৮৪ | ০.৩৬ |
| ১৯৮৫-৮৬ | ০.৩৭৯ |
| ১৯৮৬-৮৮ | ০.৩৭৯ |
| ১৯৯১-৯২ | ০.৩৮৮ |
| ১৯৯৫-৯৬ | ০.৪৩২ |
| ২০০০ | ০.৪৫১ |
| ২০০৫ | ০.৪৬৭ |
| ২০১০ | ০.৪৬ |

উৎস : Statistical Yearbook of Bangladesh

অর্থনৈতিক অসাম্য পরিমাপ করা হয় জিনি সহগ বা Gini coefficient-এর ভিত্তিতে। জিনি সহগ সূচকটির নামকরণ ইতালিয়ান পরিসংখ্যানবিদ কোরাদো জিনির (১৮৮৪-১৯৬৫) সম্মানে করা হয়েছে। এ সূচকের বিশেষত্ব হলো যে এই সূচক সর্বনিম্ন শূন্য হতে পারে এবং সর্বাধিক ১ হতে পারে। জিনিসূচক তখনই শূন্য হবে, যখন সমাজে সব মানুষ আয়ের দিক থেকে সমান হবে এবং মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য থাকবে না। জিনি সূচক যখন ১ হবে, তখন সমাজে চরম বৈষম্য বিরাজ করবে। এমন সমাজে সব আয় বা সম্পদ একজন ব্যক্তি দখল করে এবং সমাজের অন্য সবার আয় হবে শূন্য। জিনি সূচক তাই সব সময় একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা হয়। এই ভগ্নাংশ যখন কমবে, তখন ধরে নেওয়া হবে যে অসাম্য কমেছে। যখন জিনি সূচক বাড়বে, তখন বুঝতে হবে যে সমাজে অসাম্য

বাড়ছে। সারণি-৪.৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে জিনি সূচক ০.৩৬ থেকে বেড়ে ০.৪৬৭-এ উন্নীত হয়েছে। ২০১০ সালের প্রাক্কলন থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই হার আর বাড়ছে না, বরং ০.৪৬-এ স্থির রয়েছে। ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৩-৮৪ সালে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ লোক মোট জাতীয় আয়ের ১.২ শতাংশ ভোগ করত। এই হার ২০১০ সালে ০.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে দেশের সচ্ছলতম ৫ শতাংশ ব্যক্তির আয় ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ১৮.৩ শতাংশ। এই হার ২০১০ সালে ২৪.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে নিম্নতম ৫ শতাংশ এবং উর্ধ্বতম ৫ শতাংশ আয়ের ব্যবধান অনেক বেড়ে গেছে।

জিনি সূচকের প্রাক্কলন থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অসাম্য বেড়েছে। এই বৃদ্ধির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আরও কিছু তথ্য উল্লেখ করতে হবে। পৃথিবীতে কোনো দেশেই জিনি সূচক শূন্য বা এক হয় না। পরিপূর্ণ সাম্য বা অসাম্য কোথাও নেই। ২০০৬ সালে বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে জিনি সহগ সম্পর্কে নিম্নরূপ চিত্র পাওয়া যায়।

**সারণি-৪.৬**
**বিভিন্ন দেশে জিনি সহগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ**

| জিনি সহগের পরিমাণ | দেশের সংখ্যা | এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত শতকরা হিসাবে দেশের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ০.০০০১ থেকে ০.২ | ২ | ১.৫% |
| ০.২-এর উর্ধ্বে ০.৪-এর কম | ৮২ | ৬৪% |
| ০.৪ থেকে ০.৬-এর কম | ৪০ | ৩১.২৫% |
| ০.৬-এর বেশি | ৪ | ৩.২৫% |
| মোট | ১২৮ | ১০০ |

উৎস : World Development Report, 2007

সারণি ৪.৮ থেকে দেখা যায় যে পৃথিবীর প্রায় ৯৫ ভাগ দেশে জিনি সহগ ০.২ থেকে ০.৬-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাত্র ১.৫% দেশে জিনি সহগ ০.২-এর কম ও ৩.২% দেশে এই সংখ্যা ০.৬-এর বেশি। মূলত জিনি সহগের ভিত্তিতে দেশসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেসব দেশে জিনি সহগ ০.২ থেকে ০.৪-এর মধ্যে সীমিত, সেসব দেশকে নিম্ন পর্যায়ের অসাম্যের দেশ গণ্য করা যেতে পারে। আর যেসব দেশে জিনি সহগ ০.৪ থেকে ০.৬-এর মধ্যে রয়েছে,

সেসব দেশ হলো মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের অসাম্যের দেশ। সারণি-৪.৬ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯১-৯২ সময়কাল পর্যন্ত বাংলাদেশে অসাম্য নিম্ন পর্যায়ে ছিল।

১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশ একটি মধ্য পর্যায়ের অসাম্যের দেশে পরিণত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৯৫-৯৬-এর পর এ সহগের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে জিনি সহগের পরিমাণ ছিল ০.৪৬৭। এই অঙ্ক ০.৫ অতিক্রম করলে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় একটি উচ্চ অসাম্যের দেশে পরিণত হবে। কাজেই বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অসাম্য দ্রুত বাড়ছে।

## ৪.৪ উপসংহার

বাংলাদেশে শাসনতন্ত্রে সমাজতন্ত্রকে একটি জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে সমাজতন্ত্র অর্জিত হবে, তার কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো শাসনতন্ত্রে নেই। সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করতে হবে। সুতরাং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যসমূহ এমন হতে হবে, যা দেশের সব মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দ্বিতীয়টি হলো দেশের সব মানুষের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ এবং তৃতীয়টি হলো মানুষে মানুষে অসাম্য বৃদ্ধি হ্রাস করা। প্রথম দুটি কাজে রাষ্ট্র কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে কিন্তু তৃতীয় লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লক্ষ করা যায়নি। পূর্ব খণ্ডের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে মৌলিক চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সাফল্য অর্জন করেছে। ক্ষুধিতের হার কমেছে, দরিদ্রের হার কমেছে, শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছে ও স্বাস্থ্যসেবারও সম্প্রসারণ ঘটেছে। মনে রাখতে হবে যে এই সাফল্য বাংলাদেশের অতীতের তুলনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কিন্তু যদি আন্তর্জাতিক মানের ভিত্তিতে বাংলাদেশে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। এ কথা সত্য যে আন্তর্জাতিক মানে দারিদ্র্যের হার বাংলাদেশে প্রায় ৭০.২ শতাংশ থেকে ৪৩.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এ অর্জন প্রশংসনীয়, কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার বিশ্বের তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশে এখনো পৃথিবীর একটি দারিদ্র্যের বড় গহ্বর রয়েছে। বাংলাদেশে তাই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার

কমিয়ে আনার জন্য আরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতিও সজাগ থাকতে হবে :

(১) বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেলেও পুষ্টি পরিস্থিতি এখনো অত্যন্ত অসন্তোষজনক। সুষম পুষ্টিযুক্ত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস বাংলাদেশে দ্রুত বাড়াতে হবে। উপরন্তু বাংলাদেশে জলের আধিক্য সত্ত্বেও সুপেয় পানীয়ের অভাব রয়েছে। এই অভাব দূর করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

(২) বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের সমস্যা নাটকীয়ভাবে বাড়ছে। পরিবেশদূষণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষেরা। কাজেই পরিবেশদূষণ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশকে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে।

(৩) পরিমাণগত দিক থেকে বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে প্রশংসনীয় অর্জন ঘটেছে। কিন্তু এই অর্জন যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মান অত্যন্ত নিচু। এই মানোন্নয়নের জন্য অনেক সময় ও সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক খাতে অনেক নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক খাতেও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেড়েছে। উপরন্তু প্রবাসে কর্মসংস্থানের ফলে এখানে বেকার সমস্যা হ্রাস পেয়েছে। তবু বাংলাদেশে বেকার সমস্যা এখনো অত্যন্ত প্রকট। বাংলাদেশকে বেকার সমস্যার দিক থেকে মহামন্দা বা Great Depression-এর পর্যায়ের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বেকার সমস্যার ফলে বাংলাদেশের নবীন জনগোষ্ঠী সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তাতে বড় ধরনের সামাজিক অসন্তোষের আশঙ্কা রয়েছে। এর জন্য বাংলাদেশে দ্রুত টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। এ কাজ জটিল এবং এ কাজ অনেক দিন ধরে করে যেতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের বড় সমস্যা হলো অসাম্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি হ্রাস করা। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। অসাম্যের ব্যাপকতা বাড়লে সামাজিক অসন্তোষ দেখা দেয়। অন্যদিকে এটা কমাতে গেলে অর্থনীতির ওপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। অবশ্য অসাম্য বাড়লে তার কী প্রভাব অর্থনীতির ওপর পড়বে, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদেরা একমত নন। এই অসাম্যের ফলাফল নিয়ে তিন ধরনের মতবাদ দেখা যাচ্ছে।

প্রথম ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা সান্ত্বনা দিয়ে বলে থাকেন যে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাড়লে অসাম্য বাড়তে থাকে। দেশ যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে, তখন অসাম্যের ফলে সৃষ্ট সমস্যা হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর উত্তরণের পর অসাম্য কমতে থাকবে। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েল কুজনেৎস। কুজনেৎসের বক্তব্য হলো,

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে অসাম্য বেড়ে যাওয়াতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। কুজনেৎসের এই সূত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের উল্টা ইউ (U) রেখা (Inverse U Curve) নামে পরিচিত। ইংরেজি অক্ষর ইউকে ওল্টালে যে রেখাচিত্র দেখা যাবে, তার তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে বাম দিক থেকে ডান দিকে রেখাটি দ্রুত ওপরের দিকে উঠে যাবে। এর তাৎপর্য হলো, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে অসাম্য দ্রুত বেড়ে যাবে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে একটি সোজা অংশ, যেখানে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও অসাম্য স্থির থাকে। অর্থাৎ উন্নয়নের উচ্চস্তর পর্যায় অর্জিত হলে অসাম্য বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয় অংশে রেখাটি বাম দিক থেকে ডান দিকে নেমে আসে। এর তাৎপর্য হলো, উচ্চস্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অসাম্য হ্রাস পেতে থাকে। দীর্ঘদিন কুজনেৎসের এই বক্তব্যকে অভ্রান্ত গণ্য করা হতো। কিন্তু সম্প্রতি এই সূত্রের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।

কুজনেৎসের বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানির মতো কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু পরবর্তীকালে যেসব দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করেছে, তাদের অসাম্য বাড়েনি, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে, যথা দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে অর্থনৈতিক অসাম্য লক্ষণীয়ভাবে না বাড়িয়েও দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। এমনকি চীনে, যেখানে বছরে ৯ থেকে ১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, ১৯৮৮ সালে গ্রামাঞ্চলে জিনি সহগ ছিল ০.৩৪, ২০০২ সালে এই সহগ বেড়ে মাত্র ০.৩৮-এ দাঁড়িয়েছে। অবশ্য শহরাঞ্চলে অসাম্য কিছুটা বেড়েছে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতাও এ ক্ষেত্রে আশাপ্রদ। কাজেই কুজনেৎসের উল্টো ইউ রেখা কতটুকু অবশ্যম্ভাবী, সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

সম্প্রতি ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনীতির অসাম্য সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৯] পিকেটি কুজনেৎসের বক্তব্যের সঙ্গে মোটেও একমত নন। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এক দিকে মানুষের জ্ঞান এবং নৈপুণ্য বৃদ্ধির ফলে আয়ের বৈষম্য কমছে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত পুঁজির ওপর ফিরতি হার জাতীয় প্রবৃদ্ধি হারের চেয়ে বেশি। এর ফলে পুঁজির মালিকদের হাতে অধিকতর সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে প্রবৃদ্ধির হার সাময়িকভাবে উন্নত হলেও দীর্ঘ মেয়াদে উঁচু হারে প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই পুঁজির ওপর ফিরতির হার যে দেশে প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হবে, সেখানে সরকার পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সম্পদ ক্রমাগত পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে পুঞ্জীভূত হবে। পিকেটির মতে, এ ব্যবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো পুঁজির ফিরতির ওপর করের হার বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, প্রকৃত আর্থিক অসাম্যের চেয়ে সুযোগের অসমতার অপসারণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য সম্ভব নয়। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা গড়পড়তা লোকের চেয়ে বেশি আয় করবেন, এটাই স্বাভাবিক, এটা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সুযোগের সমতার অভাবে যদি কেউ প্রতিযোগিতা না করতে পারার জন্য দারিদ্র্যের গহ্বরে আটকে থাকে, তাহলে অশান্তি অনেক বেড়ে যায়। বিশেষত বিশ্বায়িত ব্যবস্থায় জ্ঞানভিত্তিক সমাজে সাধারণ মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েও অতি অল্প সময়ে শুধু জ্ঞানের ভিত্তিতে বড়লোক হওয়া সম্ভব। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বিল গেটস চার দশকের কম সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে স্থান লাভ করেছেন।

বিশ্বব্যাংক তাই ২০০৬ সালে বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক সাম্যের পরিবর্তে সুযোগের সমতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। শুধু অর্থনৈতিক সাম্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, ক্ষমতার অসাম্য সমাজকে আরও অনেক বেশি পঙ্গু করে। ক্ষমতার অসাম্য থেকে যে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী লাভবান হয়, তারা এই অসাম্যকে চিরস্থায়ী করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলে। এভাবেই ভারতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য বর্ণব্যবস্থা, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও অনেক কৃষিপ্রধান দেশে সামন্তবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্যের ফাঁদ সৃষ্টি করা হয়। যেসব দুর্বল জনগোষ্ঠী এসব ফাঁদে আটকা পড়ে, তারা এই ফাঁদ থেকে আর বের হতে পারে না।

দারিদ্র্যের ফাঁদ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা। ন্যায়নীতির স্বার্থে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা বিধানের প্রয়োজন রয়েছে: (১) শিক্ষা, (২) স্বাস্থ্য, (৩) সামাজিক বৈষম্য (যথা কর্মে বৈষম্য) দূরীকরণ, (৪) লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস, (৫) বিচারব্যবস্থায় দুর্বল জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, (৬) সবার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যবহারের সুযোগ, (৭) আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা। বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবে সামাজিক বৈষম্য সীমাবদ্ধ। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও ঋণপ্রাপ্তির বৈষম্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রিয়াকাণ্ডে ও সরকারের উদ্যোগে কমে এসেছে। স্বাস্থ্য ও বিচার ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে। তবে এ দুটি ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র সবার জন্যই সেবার মান অত্যন্ত অসন্তোষজনক।

তৃতীয় ঘরানার অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হলো, অর্থনৈতিক অসাম্য বিশ্বায়নের ফলে বাড়ছে। বর্তমানে এই পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ স্টিগলিজ এই অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন '১ শতাংশের দ্বারা ১ শতাংশের জন্য পরিচালিত ১ শতাংশ লোকের অর্থনীতি।'

(of the 1% by the 1% for the 1%)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান অসাম্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> The simple story of America is this: the rich are getting richer, the richest of the rich are getting still richer, the poor are becoming poorer and more numerous, and the middle class is being hollowed out.[১০]

স্টিগলিজের মতে, অর্থনৈতিক অসাম্য তিনটি কারণে অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক। প্রথমত, অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে দরিদ্রদের জন্য সুযোগ হ্রাস পায়। এর ফলে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী যথাযথভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়ত, যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে ওঠে, সেখানে একচেটিয়া ব্যবসা ও ধনীদের জন্য সুবিধাজনক কর হার ইত্যাদি বেড়ে ওঠে। এর ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। তৃতীয়ত, যে সমাজে অসাম্য বেশি, সে সমাজে collective action বা সবার উদ্যোগে গৃহীত ব্যবস্থা হ্রাস পায়। এর ফলে অবকাঠামোতে বিনিয়োগ নেমে আসে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, যারা সমাজে ধনী, তারা রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রসঙ্গে স্টিগলিজ লিখেছেন :

> The personal and the political are today in perfect alignment. Virtually all U.S. senators, and most of the representatives in the House, are members of the top 1 percent when they arrive, are kept in office by money from the top 1 percent, and know that if they serve the top 1 percent well they will be rewarded by the top 1 percent when they leave office. By and large, the key executive-branch policymakers on trade and economic policy also come from the top 1 percent. When pharmaceutical companies receive a trillion-dollar gift-through legislation prohibiting the government, the largest buyer of drugs, from bargaining over-price it should not come as cause for wonder. It should not make jaws drop that a tax bill cannot emerge from Congress unless big tax cuts are put in place for the wealthy. Given the power of the top 1 percent, this is the way you would expect the system to work.[১১]

অর্থনৈতিক অসাম্যের প্রভাব সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গবেষণাতেও উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে। তাত্ত্বিকদের মতে, অর্থনৈতিক অসাম্যের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের চেয়ে এর স্বল্পমেয়াদি সামাজিক প্রভাব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ হার্সম্যান (Hirschman) ও রথচাইল্ড (Rothschild) একটি কল্পিত কাহিনির মাধ্যমে একটি সুন্দর তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। এ তত্ত্বটি সুড়ঙ্গ তত্ত্ব বা tunnel theory নামে পরিচিত।[১২] গল্পটি হলো : একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে শুধু এক দিকে গাড়ি যায়। সুড়ঙ্গের মধ্যে দুটি লেন আছে। হঠাৎ দুটি লেনের মধ্যেই যানজট হয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমে বাম ও ডানের দুই লেনেরই চালকেরা

একই ধরনের হতাশায় ভুগতে থাকেন। তারপর দেখা যায়, ডানের লেনটি খুলে দেওয়া হয়েছে অথচ বামের লেনটি বন্ধই রয়ে গেছে। বামের লেনের চালকেরা প্রথমে আশা করতে থাকেন যে তাঁদের লেনটিও কিছুক্ষণের মধ্যে খুলে দেওয়া হবে। অনেকক্ষণ ধরে দেখা গেল, শুধু ডানের লেনের গাড়ি চলছে এবং বামের গাড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। একপর্যায়ে বামের লেনের চালকেরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা ডানের লেনে ঢুকতে চেষ্টা করেন। এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে দুটি লেনই বন্ধ হয়ে যায়। উন্নয়নের সুফল থেকে যাঁরা বঞ্চিত হন, তাঁরা প্রথমে বাম লেনের চালকদের মতো ভাবতে থাকেন যে তাঁরাও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল পাবেন। কিন্তু এ ধরনের ধৈর্য বেশি দিন থাকে না। তাই একপর্যায়ে বঞ্চিতরা যখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, তখন অর্থনীতিতে সুড়ঙ্গের মতো বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে প্রবৃদ্ধির চাকা থেমে যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মৌলিক চাহিদা পূরণ, বেকারত্ব হ্রাস ও আর্থিক অসাম্য হ্রাস—সমাজতন্ত্রের এই তিনটি লক্ষ্য পূরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। এই লক্ষ্যসমূহ স্থির ও সুনির্দিষ্ট নয়। আর্থসামাজিক পরিবেশের বিবর্তনের ফলে এসব লক্ষ্যমাত্রা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একটি বড় সত্য হলো এর শেষ কোথায়, তা জানা নেই। কবির ভাষায়: 'পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে'। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের তিনটি লক্ষ্যপূরণে অগ্রগতি হয়েছে, তবে এ অগ্রগতি যথেষ্ট নয়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ জরুরি :

১. মৌলিক চাহিদা পূরণে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তুলনীয় সাফল্য অর্জন করতে হবে এবং স্বল্প মেয়াদে অপুষ্টির হার দ্রুত কমাতে হবে। পরিবেশদূষণ ও নগর দারিদ্র্যের হার দ্রুত হ্রাস করতে হবে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করতে হবে।
২. বেকার সমস্যার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে হবে এবং এ সমস্যা হ্রাসে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩. আর্থিক অসাম্য হ্রাসের জন্য সরকারের সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

## পাদটীকা

১. Meghnad Desai. 2002. *Marx's Revenge*. London: New York: Verso
২. Kamal Siddiqui et al. 1990. *Social Formation in Dhaka City*. Dhaka: University Press Ltd.

৩. Scott Gordon. 1993. *The History and Philosophy of Social Science*. London: Routledge.

৪. শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

৫. শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২, প্রাগুক্ত, ২৩৪

৬. Bangladesh Planning Commission. 1974. *First Five Year Plan*. Dhaka.

৭. Mancur Olsorn. 1982. *The Rise and Decline of Nations*. New Haven. Yale University Press.

৮. Bangladesh Planning Commission. 2015. *Millenium Development Goals: Bangladesh Progress Report*. Dhaka 119.

৯. Thomas Piketty. 2014 *Capital in the 21st Century*. Translated by Arthur Goldhammer. London: the Beknep Press of Harvard University

১০. Joseph E. Stigligz. 2013. *The Price of Inequality*. New York, London: W. W. Norton and Company, 9

১১. Joseph E. Stigligz. 2011. 'of the 1 % by the 1% for the 1%. *Vanity fair*. 2011. http//www.vanityfair.com/news/2011/05/top one %, 20115.

১২. A. G Hirshman and M. Rothschild. 1973. 'The changing tolerance for income inequity in the course of economic development: With Mathematical Appendix' in *Quarterly Journal of Ecomomics* 87, 45 to 566

# ৫

# গণতন্ত্র : গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণ

## ৫.১ অবতরণিকা

১৯৭৯ সালে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্রবীভবনের পর মার্কিন বুদ্ধিজীবী ফ্রান্সিস ফুকোইয়ামা 'The End of History' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধের বক্তব্য হলো, স্নায়ুযুদ্ধের শেষে ইতিহাস তার পূর্ণতা লাভ করেছে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় সমাজতন্ত্র বনাম উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব চলছিল। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে উদার গণতন্ত্র জয়লাভ করে। তিনি বলেছেন :

> What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.[১]

ফুকোইয়ামার বক্তব্যের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথমত, প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্বে সমাজতন্ত্র ধোপে টেকেনি। এ বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, পশ্চিমা জগতের উদার গণতন্ত্র সারা বিশ্বে গৃহীত হয়েছে। এই বক্তব্য নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

গণতন্ত্রের কোনো সর্বজনীন রূপ নেই। রাষ্ট্রভেদে গণতন্ত্রের প্রকার, আচার ও আচরণে ভিন্নতা ঘটে। সব দেশই সমানভাবে গণতান্ত্রিক নয়। রাষ্ট্রভেদে গণতন্ত্রের হেরফের হয়। ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী অ্যান্থনি গিডেন্স এ সম্পর্কে ঠিকই লিখেছেন, 'Democracy isn't an all or nothing thing. There can be different forms, as well as different levels, of democratisation.'[২] বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের রূপ এবং পর্যায় ভিন্ন। এমনকি সংস্কৃতিভেদেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারতম্য ঘটে। যেমন ধরুন, বিলাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেখানে অভিজাত শ্রেণির দাপট অনেক বেশি। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের ভূমিকাই মুখ্য। এ সম্পর্কে একটি চুটকি প্রায়ই শোনা যায়। একজন আমেরিকান পরিব্রাজক বিলাতে গিয়ে দেখতে পান যে সেখানে অভিজাত শ্রেণির লোকেরা দেশ শাসন করছে। তিনি এক ব্রিটিশ নাগরিককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কীভাবে এ ধরনের লোকদের সরকারে নির্বাচিত করো, যারা তোমাদের মতো সাধারণ মানুষকে খাওয়ার দাওয়াত দিতে রাজি হয় না? উত্তরে ব্রিটিশ নাগরিক বলল, তোমরা কীভাবে সে ধরনের ব্যক্তিদের নির্বাচিত করো, যাদেরকে তোমাদের নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিতে অপমানবোধ করো (অর্থাৎ মার্কিন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিম্নশ্রেণির)?

গণতন্ত্র জয়যুক্ত হয়েছে, ফুকোইয়ামার এ বক্তব্য সঠিক নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পৃথিবীর অনেক দেশেই এখনো চূড়ান্ত রূপ নেয়নি। উপরন্তু দেশভেদে গণতন্ত্রের রূপও ভিন্ন। কাজেই সমাজতন্ত্রের পরাজয় ঠিকই হয়েছে কিন্তু গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় এখনো হয়নি। পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র নিয়ে নানা নিরীক্ষা চলছে।

এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূল স্তম্ভ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করা এবং সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করা। প্রবন্ধটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। অবতরণিকার পর দ্বিতীয় খণ্ডে গণতন্ত্রের ধারণার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। সে জন্য প্রথমেই গণতন্ত্র কী, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন রয়েছে। গণতন্ত্র কী, শুধু তা জানলেই চলবে না; গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য কী, সে সম্পর্কে আলোচনার দরকার রয়েছে। তাই তৃতীয় খণ্ডে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য সুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গণতন্ত্রের বিকল্প ব্যবস্থার বিপরীতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লাভ-ক্ষতি তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করার জন্য কিছু সুপারিশ রাখা হয়েছে।

## ৫.২ গণতান্ত্রিক ধারণার বিবর্তন : প্রত্যক্ষ, প্রতিনিধিত্বশীল, উদার ও অনুদার গণতন্ত্র

আধুনিক অর্থে গণতন্ত্রের জন্ম হয়েছে প্রাচীন গ্রিসে। কিন্তু গ্রিসের কোনো কোনো রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও গ্রিক দার্শনিকেরা গণতন্ত্র মোটেও পছন্দ করতেন না। প্লেটো তাঁর স্বপ্নরাজ্যে শাসক করতে চেয়েছেন দার্শনিক রাজাদের। দার্শনিক রাজারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন না। অ্যারিস্টটল বলছেন, গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থায় যাঁরা নেতা হন, তাঁরা সাধারণ ঘরের—দরিদ্র এবং অমার্জিত সন্তান। এখানে গরিবেরা শাসন করে এবং ধনীদের অধিকার নেই। এর ফলে এটি আদর্শ ব্যবস্থা নয়।

গ্রিসে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি গ্রিক দার্শনিকদের লেখায় পাওয়া যাবে না। গণতন্ত্রের সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এথেন্স নগরীর নন্দিত জননায়ক পেরিক্লিস। গণতন্ত্র নিয়ে এই ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন যুদ্ধে নিহত এথেনিয়ানদের স্মরণে স্মৃতিসভার বক্তৃতায়। পেরিক্লিসের বক্তব্য থুকিডিডিস তাঁর অমর গ্রন্থ *History of the Peloponnesian War*-এ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। পেরিক্লিস তাঁর বক্তব্যে বলেন যে শহীদেরা এথেন্সের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এরপর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কী, সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> Our constitution is called a democracy because power is in the hands not of a minority but of the whole people. When it is a question of settling private disputes, everyone is equal before the law; when it is a question of putting one person before another in positions of public responsibility, what counts is not membership of a particular class, but the actual ability which the man possesses. No one, so long as he has it in him to be of service to the state, is kept in political obscurity because of poverty. And, just as our political life is free and open, so is our day-to-day life in our relations with each other. We do not get into a state with our next-door neighbour if he enjoys himself in his own way, nor do we give him the kind of black looks which, though they do no real harm, still do hurt people's feelings. We are free and tolerant in our private lives; but in public affairs we keep to the law. This is because it commands our deep respect.[৩]

পেরিক্লিসের এথেন্সে গণতন্ত্রের বিশ্লেষণের সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনা করলে গণতন্ত্রের বিকাশের মূল সমস্যাগুলো সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। প্রথমত পেরিক্লিস বলছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা সংখ্যালঘুদের হাতে থাকে না, ক্ষমতা থাকে The whole people বা সমগ্র জনগোষ্ঠীর হাতে। আজকের গণতন্ত্রের সঙ্গে এথেন্সের গণতন্ত্রের এটি সবচেয়ে বড় তফাত। এথেন্সের গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। যেখানে সব ভোটার সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করতে পারত। এথেন্সে সমগ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ সম্ভব ছিল, কারণ পেরিক্লিস যাঁদের সমগ্র জনগোষ্ঠী বলছেন, তাঁরা হচ্ছেন সেই সব ব্যক্তি, যাঁদের রাজনৈতিক অধিকার ছিল। এথেন্সের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল দাস। দাসদের রাজনৈতিক অধিকার ছিল না, নারীদের রাজনৈতিক অধিকার ছিল না, দরিদ্রদের রাজনৈতিক অধিকার

ছিল না। উপরন্তু এথেন্স ছিল একটি নগর রাষ্ট্র। এর আয়তন ছিল সীমিত। কাজেই এথেন্সে পেরিক্লিস যাকে whole people বা সমগ্র জনগোষ্ঠী বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। তাদের সবার পক্ষে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে জড়িত হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু আজ পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই জনসংখ্যা অনেক বেশি ও সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত। তার ফলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এথেন্সে যে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাকে এখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা direct democracy বলা হয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বা representative democracy-এর মাধ্যমে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পক্ষে প্রধান যুক্তি হলো যে যেহেতু সব ভোটারের অনুমতি নিয়ে বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়, সেহেতু ভোটারদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের দুটি মারাত্মক কুফল রয়েছে। প্রথমত পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই প্রতিনিধিরা সংখ্যাগুরুর ভোটে নয়, সংখ্যালঘুর ভোটে নির্বাচিত হন (এ প্রসঙ্গে এই বইয়ের ১১ অধ্যায়ে আলোচনা দেখুন)। তাই নির্বাচিত সরকার মানে সংখ্যাগুরু ভোটারদের সরকার না-ও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘুদের দ্বারা নির্বাচিত সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনিচ্ছুক সংখ্যাগুরুর ওপর চাপিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষ নির্বাচন-ব্যবস্থায় এটি সম্ভব নয়; প্রতিটি সিদ্ধান্ত সবার অংশগ্রহণে হয়। তাই জনগণের ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, পেরিক্লিস বলছেন যে এথেন্সের নাগরিকেরা একে অপরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সহনশীল এবং উদার; সবাই আইনের শাসন মেনে চলে। আইনের শাসন হলো এথেনীয় গণতন্ত্রের প্রাণ। এ ধরনের গণতন্ত্রকে আধুনিক বিশ্বে লিবারেল ডেমোক্রেসি বা উদার গণতন্ত্র বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বর্তমান বিশ্বে উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক রাষ্ট্রে অনুদার গণতন্ত্র রয়েছে। এসব রাষ্ট্রে শুধু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা নেই। এবং বিরোধী দলের নাগরিক অধিকারসমূহ সব সময় মেনে চলা হয় না। তাই অনুদার গণতন্ত্রে সরকার নির্বাচিত হয় ঠিকই কিন্তু সেখানে আইনের শাসন দুর্বল এবং জনগণের নাগরিক এবং শাসনতান্ত্রিক অধিকারের মর্যাদা নেই। বর্তমান পৃথিবীতে অনুদার গণতন্ত্রের সংখ্যা বাড়ছে। একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে ফরিদ জাকারিয়া বলছেন, ১৯৯০ সালে ২২ শতাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনুদার গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ১৯৯২ সালে এই হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯৯৭ সালে এই হার ৫০ শতাংশে ওঠে, যা পরে সামান্য নেমে আসে। তবে এখন অনুমান করা হচ্ছে যে পৃথিবীর প্রায় ৫০ শতাংশ দেশে বিভিন্ন ধরনের অনুদার গণতন্ত্র রয়েছে।[৪]

তৃতীয়ত, পেরিক্লিস বলছেন যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের জন্য যাঁদের নির্বাচন করা হয়, তাঁরা শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্বাচিত হন। নির্বাচিত ব্যক্তিরা কোন শ্রেণির, তা বড় কথা নয়, রাষ্ট্রের প্রতিটি যোগ্য ব্যক্তি তাঁদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এ ধরনের নির্বাচন এথেন্সে সম্ভব ছিল; কারণ, সেখানে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল সীমিত। আজকের বিশ্বে বেশির ভাগ নির্বাচনী পদে অনেক ভোট সংগ্রহ করতে হয়, এর ফলে যোগ্যতম লোকেরাই নির্বাচিত হবে, এ নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়।

পেরিক্লিসের বর্ণিত এথেন্সের গণতন্ত্র ও আজকের বিশ্বে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তুলনা করলে গণতান্ত্রিক ধারণার বিবর্তনের মূল ধারাগুলো বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

## প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বনাম প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র

তাত্ত্বিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে অধিকাংশ ভোটারের অনুমতি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না। এই ব্যবস্থা এথেন্সের মতো একটি ছোট নগরীতে নেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু আধুনিক বিশ্বে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জনমত যাচাই করতে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে যাবে। তাই তাত্ত্বিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র শ্রেয় হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র চালু করা হয়েছে। টমাস জেফার্সন বলেছেন: 'A democracy [is] the only pure republic, but impracticable beyond the limits of a town.' মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস বুকানন এবং গর্ডন টুলক লিখেছেন, 'Direct democracy, under almost any decision-making rule, becomes too costly in other than very small political units when more than a few isolated issues must be considered.'[৫]

যেহেতু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়, সেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র চালু করা হয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রধান যুক্তি হলো, যেহেতু সব ভোটারের অনুমতি নিয়ে বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়, সেহেতু ভোটারদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হন (এ প্রসঙ্গে এ বইয়ে একাদশ অধ্যায়ের আলোচনা দেখুন)। এ অবস্থায় সংখ্যালঘুদের দ্বারা নির্বাচিত সরকারও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনিচ্ছুক সংখ্যাগুরুদের ওপর চাপিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের জন্য কতটুকু সহায়ক, সে সম্পর্কে প্রশ্ন

উঠেছে। যেসব দেশে এক ভোট বেশি পেলে কেউ নির্বাচিত বলে গণ্য হয় (যাকে ইংরেজিতে first- past- the post rule বলে), সেসব দেশে সংখ্যালঘুদের ভোটে নির্বাচিত সরকারের পক্ষে বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

এর প্রতিকারস্বরূপ পৃথিবীর অনেক দেশেই আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন প্রবর্তন করা হয়েছে। সংখ্যাগুরুর ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমর্থন ছাড়া এ ধরনের সরকার পরিচালনা করা যায় না। পক্ষান্তরে আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে অসুবিধাও রয়েছে। এই পদ্ধতিতে দলের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে সংসদে আসন বণ্টন করা হয়। এর ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দলের প্রতি অনুগত হন, কিন্তু কোনো নির্বাচনী এলাকার জনগণের সমর্থন অর্জন করার বাধ্যবাধকতা সাংসদদের থাকে না। এবং এতে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সাংসদদের মধ্যে কোনো বন্ধন গড়ে ওঠে না। এ ধরনের ব্যবস্থা তাই অনেক ক্ষেত্রেই ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত সরকারও একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়। কাজেই সঠিক নির্বাচন-পদ্ধতি কী হবে, সেটি আজকের বিশ্বে গণতান্ত্রিক বিবর্তনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হচ্ছে।

নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্দিষ্ট মেয়াদে, যথা পাঁচ বছর বা চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রতিনিধিরা জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারেন। আস্থা হারালেও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের মেয়াদ পূর্ণ করেন, আইনত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের এ ব্যাপারে কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত সরকার এক দিনের ভোটে চার-পাঁচ বছরের জন্য দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে যান এবং তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামাফিক দেশ শাসন করেন। এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার হতে পারে যখন কোনো সরকার তাদের জনপ্রিয়তা হারায়, তখনই তাদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। তবে এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে দেশে সরকার অত্যন্ত অস্থিতিশীল হবে এবং সরকারের পক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। তবু কোনো কোনো দেশে 'রিকল' (recall) ব্যবস্থা বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহারের জন্য ভোট অনুষ্ঠানের বিধান করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুফল পাওয়া সম্ভব, কিন্তু এর কুফল এত বেশি যে কোনো রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারে এখন পর্যন্ত রিকল ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯টি অঙ্গরাজ্যে, যেমন ক্যালিফোর্নিয়াতে রিকল ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ২০০৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে গ্রে ডেভিস গভর্নর পুনর্নির্বাচিত হওয়ার এক মাস পর তাঁকে 'রিকল' করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'রিকলে'

গভর্নর গ্রে ডেভিস পরাজিত হন এবং পরবর্তী সময়ে পুনর্নির্বাচিত না হতে পারায় ডেভিস তাঁর পদ হারান। তবে এ ধরনের 'রিকল' (recall) ব্যবস্থার নজির এখনো অত্যন্ত সীমিত।

আধুনিক বিশ্বে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালু করার পক্ষে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর পেছনে দুটি ধারা কাজ করছে। এক, তথ্যপ্রযুক্তিতে বিপ্লবের ফলে জনগণ অতি কম ব্যয়ে অনেক তথ্য জানতে পারেন। তাঁদের পক্ষে রাজনীতিবিদদের ছাড়াই অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করেছে। দুই, আজকের বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে শিক্ষার হার অনেক বেড়ে গেছে। এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে চায়। অধ্যাপক মাতসু সাকা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নিম্নরূপে সংজ্ঞা দিয়েছেন :

> Direct democracy is an umbrella term that covers a variety of political processes, all of which allow ordinary citizens to vote directly on laws rather than candidates for office.[৬]

প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনে ভোটাররা বিশেষ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভোটারদের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে ভোটাররা নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এসব নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নীতিনির্ধারণের জন্য referendum বা plebiscite বা গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন এথেন্সে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নগর সভায় বা town meeting-এ গৃহীত হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চার ধরনের গণভোট দেখা যায়।

ক. Ballot Measure বা Proposition: এই ব্যবস্থায় ব্যালটে উল্লেখিত আইন ভোটাররা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করেন।

খ. Initiative বা উদ্যোগ : পূর্বনির্ধারিত-সংখ্যক ভোটার কোনো ক্ষেত্রে নতুন আইন দাবি করতে পারে এবং এই দাবির ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

গ. Referendum বা Petition Referendum: সংসদে কর্তৃত্ব অনুমোদিত আইন অনুমোদনের জন্য Referendum অনুষ্ঠিত হয়। এই Referendum পূর্বনির্ধারিত-সংখ্যক ভোটারের দাবিতে অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ. Legislative Referendum: জনমত যাচাইয়ের জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এ ধরনের গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান বিশ্বে referendum-জাতীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। তবে কোথাও সরকার প্রত্যক্ষভাবে

ভোটারদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার-ব্যবস্থাতেই গণভোট অনুষ্ঠান করে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুবিধা অর্জনের চেষ্টা চলছে।

তবে গণভোটের মতো প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অসুবিধাও রয়েছে।[৭] প্রথমত, কোনো কোনো সমাজে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘুদের শোষণ করতে চায়। সে ধরনের সমাজে গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত সংখ্যাগুরুর দুঃশাসন বা Tyranny of the majority প্রতিষ্ঠা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র পরিচালনা করেন পেশাদার রাজনীতিবিদেরা। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ অনেক সিদ্ধান্ত ভালো করে বিচার-বিশ্লেষণ না করে আবেগের ভিত্তিতে নিতে পারে। পক্ষান্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনীতিবিদেরা সঠিক বিচার-বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদেরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আপসের উদ্যোগও নিতে পারেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে এসব সুবিধা থেকে সমাজ বঞ্চিত হতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানে গণভোটের বিধান রয়েছে, তবে সংবিধানে ব্যবস্থা না থাকলেও সরকার অথবা সংসদ গণভোটের উদ্যোগ নিতে পারে। অনেক দেশে গণভোটের সুযোগের অপব্যবহার হয়ে থাকে। ঘন ঘন অহেতুক গণভোট সরকারকে অচল করে দিতে পারে। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কাদের অনুরোধে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কে সংবিধানে (অথবা অন্য কোনো আইনে) বিধান থাকা বাঞ্ছনীয়।

উইকিপিডিয়ার হিসাব অনুসারে বর্তমানে বিশ্বে কমপক্ষে ৫০টি দেশে গণভোট চালু রয়েছে (আফ্রিকায় ৩টি, এশিয়াতে ১৩টি, ইউরোপে ২৪টি, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ৮টি ও অস্ট্রেলিয়ায় ২টি দেশে)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদিও কেন্দ্রীয় সরকারে গণভোটের বিধান নেই কিন্তু রাজ্য সরকারে এবং স্থানীয় সরকারে প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রেও গণভোটের বিধান রয়েছে। তাইওয়ানে গণভোটের বিধান রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতে গণভোটের বিধান রয়েছে। ব্রিটেনে অতি সম্প্রতি দুটি উল্লেখযোগ্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি গণভোটে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রস্তাব অল্প ভোটে হেরে যায়। আর একটি গণভোটে ব্রিটেনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয় এবং বর্তমানে এ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন চলছে।

গণভোট সরকারের কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণে শুধু সহায়কই হয় না, এর ফলে কতগুলো অতিরিক্ত সুবিধাও পাওয়া যায়। প্রথমত, এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ

জনগণ উপকৃত হন, করের ক্ষেত্রে যেখানে গণভোটের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে করের হার হ্রাস হয় এবং সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ে। উপরন্তু গণভোট থাকলে দেশে সহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজন হয় না। গণভোটের মাধ্যমে অনেক বিতর্কিত প্রশ্নের সমাধান হতে পারে।[৮] যেমন বাংলাদেশে বর্তমানে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে একটি বড় বিতর্ক রয়েছে। এ বিতর্কে দুটি বিরোধী রাজনৈতিক দল জড়িত রয়েছে। তারা তাদের পছন্দমতো ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায়। এ ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে না দিয়ে যদি গণভোটের মাধ্যমে জনগণের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করা অনেক সহজ হতে পারে।

## উদার গণতন্ত্র বনাম অনুদার গণতন্ত্র

পেরিক্লিসের এথেন্সে উদার গণতন্ত্র ছিল। বর্তমান বিশ্বে উদার এবং অনুদার দুই ধরনের গণতন্ত্র রয়েছে। ফরিদ জাকারিয়া উদার গণতন্ত্রের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন :

> A political system marked not only by free and fair elections, but also by the rule of law, a separation of power and protection of basic liberty, of speech, assembly, religion and property.[৯]

উদার গণতন্ত্রের জন্য শুধু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন : সংবিধানের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষমতা নির্দিষ্টকরণ। আরও প্রয়োজন বাকস্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা। এর জন্য একদিকে যেমন আইনের শাসনের প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি পরমতসহিষ্ণু সংস্কৃতির প্রয়োজন রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত যেসব দেশে নতুনভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে, সেসব দেশে এই শর্ত প্রতিপালন করা সম্ভব হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে যে আইনের শাসন ও কার্যকর পরমতসহিষ্ণুতার ক্রমিক অবক্ষয় ঘটছে। এর ফলে দেশে দেশে গড়ে উঠছে Illiberal democracy বা অনুদার গণতন্ত্র। উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাতারাতি গড়ে ওঠে না। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যথাযথ প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। এর ফলে পৃথিবীর অনেক দেশেই চটজলদি উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না।

## সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের উপযুক্ত কাজে নির্বাচন

পেরিক্লিস দাবি করছেন যে এথেনীয় গণতন্ত্রে যারা যে কাজের উপযুক্ত, তাদের সে কাজে নির্বাচিত করা হতো। নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেরিক্লিসের মতে রাজনৈতিক

বিবেচনা প্রাধান্য লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ পদে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রার্থী নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। তবে এতে সব সময় যে সমস্যা হবে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এত বেশিসংখ্যক উপযুক্ত প্রার্থী থাকেন যে তাঁদের যে কেউ সরকারের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ। তবু বর্তমান বিশ্বে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতা বনাম রাজনৈতিক বিবেচনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। তবে এর কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সরকারি পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক নিয়োগ এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবশ্যশর্ত। সাংবিধানিক পদসমূহেও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে বর্তমান বিশ্বে সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের উপাদান চালু করা না গেলেও অনেক ক্ষেত্রেই এর অনেক উপাদান চালু করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে অনেক রাষ্ট্রেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সমন্বয় করা হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গণভোটের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে অনেক বড় ধরনের প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলো শুধু রাজনীতিবিদদের পক্ষে নিরসন করা সম্ভব নয়। এই অবস্থাতে বড় বড় নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে গণভোটের ব্যবস্থা করা উচিত এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এর ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং রাজনীতিবিদেরা শুধু সম্পদের ভাগ-বাঁটোয়ারাতে ব্যস্ত না হয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

## ৫.৩ প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের জয়যাত্রা

যদিও সম্প্রতি বিশ্বের অনেক দেশ প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের (রেফারেন্ডাম বা রিকল) সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তবু কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর গড়ে তোলার সংগ্রাম চলছে। অনেক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার সংকুচিত ছিল। এর ফলে সব নির্বাচিত সরকার প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধিত্বশীল ছিল না। আর শুধু নির্বাচিত সরকারই যথেষ্ট নয়। কাদের ভোটে সরকার নির্বাচিত, সেটি ছিল মূল প্রশ্ন। বর্তমান বিশ্বে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকারকেই গণতান্ত্রিক সরকারের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু এই সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যাপারটি অতি সম্প্রতি স্বীকৃতি লাভ করেছে। সারণি-৫.১-এ বিভিন্ন রাষ্ট্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের সময় দেখা যাবে।

## সারণি-৫.১
## উন্নত দেশসমূহে গণতন্ত্রের বিকাশ

| দেশ | পুরুষদের সর্বজনীন ভোটাধিকার | মহিলা ও পুরুষদের সর্বজনীন ভোটাধিকার |
|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | ১৯০৩ | ১৯৬২ |
| অস্ট্রিয়া | ১৯০৭ | ১৯১৮ |
| বেলজিয়াম | ১৯১৯ | ১৯৪৮ |
| কানাডা | ১৯২০ | ১৯৭০ |
| ডেনমার্ক | ১৮৪৯ | ১৯১৫ |
| ফিনল্যান্ড | ১৯১৯ | ১৯৪৪ |
| ফ্রান্স | ১৮৪৮ | ১৯৪৬ |
| জার্মানি | ১৮৪৯ | ১৯৪৬ |
| ইতালি | ১৯১৯ | ১৯৪৬ |
| জাপান | ১৯২৫ | ১৯৫২ |
| নেদারল্যান্ড | ১৯১৭ | ১৯১৯ |
| নিউজিল্যান্ড | ১৮৮৯ | ১৯০৭ |
| নরওয়ে | ১৮৯৮ | ১৯১৩ |
| পর্তুগাল | - | ১৯৭০ |
| স্পেন | - | ১৯৭৭ (১৯৩১)** |
| সুইডেন | ১৯১৮ | ১৯১৮ |
| সুইজারল্যান্ড | ১৮৭৯ | ১৯৭১ |
| যুক্তরাজ্য | ১৯১৮ | ১৯২৮ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৬৫ (১৮৭০) | ১৯৬৫ |

। : Ha Joon Chang. 2002. *Kicking Away the Ladder,* London Anthen Press

ওপরের সারণিতে ১৯টি উন্নত দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের তারিখ া যাবে। এই তালিকা অনুসারে প্রথম নারী ও পুরুষদের সর্বজনীন টাধিকার স্বীকৃত হয় নিউজিল্যান্ডে, ১৯০৭ সালে। আর এই অধিকার সর্বশেষ ৃত হয় সুইজারল্যান্ডে, ১৯৭১ সালে। পুরুষদের সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রথম ৃত হয় ফ্রান্সে, ১৮৪৮ সালে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার সহজে মেনে নেওয়া হয়নি। অনেক দেশেই এ নিয়ে ল গণ-আন্দোলন করতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাধিকার সম্প্রসারণের ইতিহাস স্মরণ করা যেতে পারে। যদিও মার্কিন রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেয়, তবু প্রথম দিকে সেখানে

ভোটাধিকার ছিল খুবই সংকুচিত। কৃষ্ণাঙ্গ ও মহিলাদের ভোটাধিকার ছিল না। ১৮৬০ সালে যখন লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫টি অঙ্গরাজ্য ছিল। সেগুলোতে মহিলাদের কোনো ভোটাধিকার ছিল না। নিউ ইংল্যান্ডের পাঁচটি রাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার স্বীকৃত ছিল আর নিউইয়র্কে কালোদের জন্যও ভোটাধিকার ছিল, যদিও সম্পত্তির শক্ত শর্ত জুড়ে কালোদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়। লিঙ্কন যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন আমেরিকার সব নাগরিকের মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশের বেশি লোকের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। এই ভোটারদের ৪০ শতাংশ ভোট, অর্থাৎ মোট নাগরিকদের ১৬ থেকে ১৮ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। লিঙ্কনের সংজ্ঞা অনুসারে গণতন্ত্র হচ্ছে 'government of the people, by the people, for the people'। অথচ সংকুচিত ভোটাধিকার আইনের জন্য তিনি ছিলেন একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। কৃষ্ণাঙ্গদের ও মহিলাদের ভোটাধিকার সম্প্রসারণ সহজে ঘটেনি; এর জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করতে হয়েছে। ১৮৭০ সালে ফেডারেল সরকার আইন করে কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার দেয়। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষী রাজ্য সরকারগুলো সে আইনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ও বেআইনিভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার ঠেকিয়ে রাখে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবাধিকার আন্দোলন Civil Rights Movement গড়ে ওঠে। দীর্ঘ সময় ধরে এই আন্দোলনের কর্মীরা মাঠে কাজ করেন। ১৯৬৫ সালে Voting Rights Act পাস হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্যেও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তুমুল গণ-আন্দোলন করতে হয়েছে। ইংল্যান্ডে এই আন্দোলন চার্টিস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের ফলে যুক্তরাজ্যে দুটি সংস্কার আইন পাস করতে হয়।

ভোটাধিকার সম্প্রসারণের আগে সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই ভোটাধিকার ছিল সীমিত। ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব সত্ত্বেও ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে মোট জনসংখ্যার এক শতাংশেরও ভোটাধিকার ছিল না। ১৮৩২ সালে সংস্কার আইনের ফলে ইংল্যান্ডের মোট পুরুষ নাগরিকদের ১৮ শতাংশ ভোটাধিকার পায়। সীমিতসংখ্যক ভোটারের নির্বাচন-ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ইংল্যান্ডে ১৮৫৩-৫৪ সালের আগে নির্বাচনে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কোনো আইন ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশির ভাগ দেশেই গোপন ব্যালটের ব্যবস্থা ছিল না। ফ্রান্সে ১৯১৩-এর আগে গোপন ব্যালট প্রথা চালু ছিল না। ফ্রান্সে ১৯১৩ সালে গোপন ব্যালট প্রথা চালু করা হয়। নির্বাচন-ব্যবস্থার এই সংস্কার এমনি হয়নি। এর জন্যও অনেক দেশে আন্দোলন করতে হয়েছে।

পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র এগিয়ে যাচ্ছে না। কোথাও কায়েমি স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রে গণতন্ত্র পিছিয়েও যাচ্ছে। উন্নত দেশসমূহে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্রের স্ববিরোধিতা বা paradox of democracy। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জয়যাত্রা চলছে। যেসব রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না, তারা উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকরণ করছে। অন্যদিকে উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধা দেখা যাচ্ছে। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটারদের উপস্থিতির হার লক্ষণীয়ভাবে কমে যাচ্ছে। তবু গণতন্ত্রের পক্ষে দুটি সুসংবাদ রয়েছে। প্রথমত, উন্নত দেশসমূহের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার কমলেও এখনো গণতন্ত্রের ওপর আস্থা অটুট রয়েছে। সমাজতত্ত্ববিদ গিডেন্স জানাচ্ছেন যে সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, রাজনীতিবিদদের ওপর আস্থা কমে গেলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ৯০ শতাংশ লোক এখনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতায় আস্থাশীল। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ রাজনীতি বর্জন করছেন না; অনেক রাষ্ট্রেই তরুণেরা রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে। বিশেষত সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নাগরিক সংগঠন বা civic group-সমূহ কার্যকর রয়েছে। এ ধরনের সংগঠনসমূহই গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলে।[১০]

## ৫.৪ গণতন্ত্র ও উন্নয়ন : লি কুয়ান ইউ বনাম অমর্ত্য সেন

১৯৯৩ সালে ভিয়েনাতে সর্বজনীন মানবাধিকার সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে চীন, সিঙ্গাপুরসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ সব দেশের জন্য অভিন্ন মানবাধিকারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এদের বক্তব্য হলো, উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য রাজনৈতিক অধিকারের চেয়ে অর্থনৈতিক অধিকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই পৃথিবীর সর্বত্র একই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা মানবাধিকারের প্রয়োজন নেই। এই বক্তব্যের পক্ষে তিনটি বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

প্রথমত, রাজনৈতিক অধিকার ও মানবাধিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক সরকারের চেয়ে কর্তৃত্ববাদী সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উপযোগী। কয়েক দশক ধরে কর্তৃত্ববাদী সরকারের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এ মতবাদের সমর্থন করে। এ বক্তব্য প্রথম জোরালোভাবে তুলে ধরেন সিঙ্গাপুরের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ। এই বক্তব্য তাই 'লি থিসিস' বা লির বক্তব্য নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়ত, এ কথা জোর দিয়ে দাবি করা হয় যে দরিদ্র মানুষেরা অর্থনৈতিক অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকারের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। বিদ্রোহী কবি কাজী

নজরুল ইসলাম লিখেছেন, 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় শুধু ভাত একটু নুন।' অনেকে আরও বলে থাকেন, দরিদ্রদের কেউ কেউ গণতান্ত্রিক অধিকার চাইলেও সামগ্রিকভাবে দরিদ্রদের জন্য অর্থনৈতিক অধিকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্ম ও বিকাশ পাশ্চাত্য জগতে। এই মূল্যবোধ এশিয়ানদের জন্য প্রযোজ্য নয়। পশ্চিমা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যক্তির অধিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ান মূল্যবোধে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য অনেক মূল্যবান। কাজেই এশিয়ার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গণতন্ত্র অচল।

প্রথমে লির বক্তব্য নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। এ কথা সত্য যে চীন, সিঙ্গাপুরের মতো কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধির হার গণতান্ত্রিক ভারতের চেয়ে বেশি। এর অর্থ এই নয় যে গণতন্ত্র যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে প্রবৃদ্ধির হার বেশি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে প্রবৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার কারণ ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন বলছেন যে কর্তৃত্ববাদী সরকারের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়নি। এই দেশগুলো উন্মুক্ত বাজারে প্রতিযোগিতা করেছে; এরা আন্তর্জাতিক বাজারকে ব্যবহার করেছে; এরা সাক্ষরতার হার বাড়িয়েছে এবং স্কুলশিক্ষার সম্প্রসারণ করেছে। এরা সাফল্যের সাথে ভূমি সংস্কার করেছে এবং বিনিয়োগ, রপ্তানি ও শিল্পায়নের জন্য উৎসাহ দিয়েছে। অমর্ত্য সেন তাই লিখেছেন :

> The economic policies and circumstances that led to the economic success of East Asian economies are by now reasonably well understood. While different empirical studies have varied in emphasis, there is by now a fairly agreed general list of 'helpful policies' that includes openness to competition, the use of international markets, a high level of literacy and school education, successful land reforms and public provision of incentives for investment, exporting and industrialization. There is nothing whatsoever to indicate that any of these policies are inconsistent with greater democracy and actually had to be sustained by the elements of authoritarianism that happened to be present in South Korea or Singapore or China.[১১]

ইতিহাসে অনেক দেশ দেখা যায় যেখানে কর্তৃত্ববাদী সরকার শাসন করেছে কিন্তু সেখানে কোনো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়নি। পক্ষান্তরে এমন উদাহরণও রয়েছে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকা মহাদেশের বতসোয়ানা নামক একটি দেশের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে। ভারতে সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধি থেকে প্রমাণিত হয় যে গণতন্ত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধকতা নয়। উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক

নিয়ে একটি সমীক্ষায় অ্যাডাম প্রেজওরস্কি (Adam Przeworski) এবং ফার্নান্ডো লিমোগনো (Fernando Limogno) যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'We do not know whether democracy fosters or hinders economic growth'[১২]। গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছলদের ধীরে ধীরে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রবৃদ্ধি সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদী সম্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের বিপক্ষে বলা হয় যে গণতন্ত্র দ্রুত ভোগের পরিমাণ বাড়ায়, এর ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদী সরকার সঞ্চয় বাড়ায় ঠিকই, কিন্তু উদ্বৃত্ত অর্থ তাদের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগত প্রকল্পে ব্যয় করে। যুক্তি দুদিকেই আছে। কাজেই গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

লি প্রমাণ করতে পারেননি যে কর্তৃত্ববাদী সরকার হলেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে। তবে অমর্ত্য সেন দেখাচ্ছেন যে দেশে গণতন্ত্র নেই, সে দেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বেড়ে যায়। তিনি লিখছেন :

> Indeed, no substantial famine has ever occurred in a democratic country—no matter how poor. This is because famines are extremely easy to prevent if the government tries to prevent them, and a government in a multiparty democracy with elections and free media has strong political incentives to undertake famine prevention. This would indicate that political freedom in the form of democratic arrangements helps to safeguard economic freedom (especially freedom from extreme starvation) and the freedom to survive against famine mortality.[১৩]

অমর্ত্য সেন বলছেন যে ১৯৪৭ সালে ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি। প্রতিতুলনায় ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সময়কালে চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ ঘটে, যাতে প্রায় তিন কোটি লোক প্রাণ হারায়। চীনে দুর্ভিক্ষ ঘটেছে এ কারণে যে সেখানে কর্তৃত্ববাদী সরকার ছিল, যার কোনো জবাবদিহি ছিল না। চীনের গণমাধ্যম ছিল নিয়ন্ত্রিত, তাই এ নিদারুণ দুর্ভিক্ষ নিয়ে সেখানে কোনো আলোচনাও হয়নি। পক্ষান্তরে ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষিত ছিল। কাজেই দেশে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে হইচই পড়ে যেত এবং সরকারকে যেভাবেই হোক, খাদ্য সংগ্রহ করতে হতো। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবে এবং স্বাধীন গণমাধ্যম না থাকায় চীনের এ দায় ছিল না। তাই চীনে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়নি। অমর্ত্য সেন এ বিষয়ে আরও অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে লির পরামর্শ গ্রহণ করে গণতন্ত্রকে খর্ব করলে শুধু যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত না হতে

পারে তা নয়; গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করলে গরিব দেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বেড়ে যাবে।

কর্তৃত্ববাদী শাসনের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি হলো, গরিব মানুষেরা অর্থনৈতিক উন্নতি চায়; রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। অনেক কর্তৃত্ববাদী নেতাই এ মতবাদে বিশ্বাস করেন। প্রকৃতপক্ষে এর কোনো ভিত্তি নেই। জনগণ কোথাও কর্তৃত্ববাদী শাসনকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয়নি। দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে জনসাধারণ আন্দোলন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। চীনকে বাদ দিলে কর্তৃত্ববাদী সরকার এখনো মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে শাসন করছে। কিন্তু মালয়েশিয়াতে এখনো গণতান্ত্রিক অসন্তোষ বিরাজ করছে। সিঙ্গাপুরে লির সাফল্যের কারণ হলো যে তিনি সেখানে চীনাভাষীদের কর্তৃত্ব রক্ষা করেছেন। তাই চীনাভাষীদের সমর্থনে সেখানে কর্তৃত্ববাদী সরকার এখনো টিকে আছে।

গণতন্ত্রের সমালোচকেরা বলে থাকেন যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পাশ্চাত্যের সামাজিক পরিবেশে লালিত হয়েছে। এই মূল্যবোধের সঙ্গে প্রাচ্যের জনগণের মূল্যবোধের কোনো সম্পর্ক নেই। এই মতবাদ ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে আসেনি, এই মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন সেসব রাজনীতিবিদ, যাঁরা কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁরা প্রাচ্যের মূল্যবোধের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। চীনের কনফুসিয়াস যেমন সামাজিক শৃঙ্খলার ওপর জোর দিয়েছেন, তেমনি তিনি আবার রাষ্ট্রের প্রতি অন্ধ আস্থায় বিশ্বাস করতেন না। ভারতে বৌদ্ধ দর্শন গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। কাজেই এশীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে, তার অধিকাংশই মনগড়া।

অমর্ত্য সেন যথার্থই বলেছেন যে তিন ধরনের কারণে গণতন্ত্র মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, গণতন্ত্র মানুষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অমর্ত্য সেন একে আখ্যা দিয়েছেন Instrumental role বা হাতিয়ারস্বরূপ ভূমিকা। এই ভূমিকা নিয়ে লি ও অমর্ত্য সেনের বক্তব্য ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, গণতন্ত্র মানুষের প্রয়োজন নির্ধারণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্মুক্ত বিতর্কের মাধ্যমে মানুষ তাদের ভাবের লেনদেন করে এবং এই লেনদেনের প্রক্রিয়ায় মানুষের চাহিদা অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মানুষ শুধু অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই চায় না, তারা মানবাধিকার নিশ্চিত করতে চায়। মানবাধিকারের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক সারণি-৫.২-এ দেখানো হয়েছে।

## সারণি-৫.২
## গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সংযোগ

| গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশেষত্ব | সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারের উদাহরণ |
|---|---|
| ১. অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা | রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকার<br>স্বাধিকারের অধিকার<br>বক্তব্য প্রকাশের অধিকার<br>রাষ্ট্রীয় কর্মপরিচালনার অধিকার<br>ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার |
| ২. সক্রিয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, নির্বাচকসহ নির্বাচিত সংসদ | রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার<br>সমতার অধিকার<br>বৈষম্য থেকে মুক্তির অধিকার<br>ভোটাধিকার ও নির্বাচনের অধিকার |
| ৩. স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং বিচারপ্রাপ্তি | বৈষম্য থেকে মুক্তির অধিকার<br>দাসত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্তির অধিকার<br>স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার<br>আইনের সম-অধিকার<br>বর্ণবাদী বৈষম্য থেকে মুক্তির অধিকার |
| ৪. সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন | জীবনের অধিকার<br>আইনের সমান অধিকার<br>চিন্তা ও ধর্মের অধিকার<br>ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার |
| ৫. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম | বক্তব্য প্রকাশের অধিকার<br>সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক বিমার অধিকার<br>যথাযথ জীবনযাত্রার মানের অধিকার<br>কর্মের অধিকার |
| ৬. বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সিভিল সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ | সরকারের ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার<br>বক্তব্য প্রকাশের ও চিন্তার অধিকার<br>নারীর প্রতি বৈষম্য ও বর্ণবাদী বৈষম্যবিরোধী সব চুক্তির বাস্তবায়নের অধিকার<br>সমাবেশ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা |
| ৭. জবাবদিহি, স্বচ্ছ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ কর্মসূচির বাস্তবায়ন | কর্মের অধিকার<br>উন্নয়নের অধিকার<br>সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক বিমার অধিকার<br>খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ যথাযথ জীবনযাত্রার অধিকার |
| ৮. কেন্দ্র থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতার এবং আর্থিক সম্পদের নিম্নস্তরে বিকেন্দ্রীকরণ | সরকারি ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার<br>সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অধিকার<br>স্বাধিকার<br>সমাবেশ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা<br>যথেষ্ট খাদ্য<br>বাসস্থান, বস্ত্রের অধিকারসহ যথাযথ জীবনযাত্রার মানের অধিকার। |

ৎস : Compiled from the UNDP and Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights Manual (New York: UNDP, 2000).

নাগরিকের জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য গণতন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্মুক্ত বিতর্কের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব। এর ফলে বিতর্কিত প্রশ্নসমূহ নিয়ে ঐকমত্য অথবা প্রায় ঐকমত্য গড়ে তোলাও সম্ভব। দেশের মানুষের মধ্যে মানুষের চাহিদা সম্পর্কে ঐকমত্য না থাকলে সেখানে সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত কষ্টকর। কাজেই এ বিষয়ে গণতন্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এ কথা সত্য যে গণতন্ত্র হলেই সব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না। তবে গণতন্ত্রের যেসব বিকল্প রয়েছে, সেসব ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি ত্রুটি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের ১১ নভেম্বর উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গণতন্ত্রের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছেন, তা স্মরণ করা যেতে পারে :

> Many forms of governments have been tried and will be tried in the world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all wise. It has been said the democracy is the worst form of government except for those all other forms of government that have been tried from time to time.[১৪]

গণতন্ত্র পরিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা নয়, কিন্তু গণতন্ত্রের বিকল্প শাসনব্যবস্থাসমূহ নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের চেয়ে দুর্বল ও অকার্যকর।

## ৫.৫ বাংলাদেশে গণতন্ত্র

পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্য জগৎ থেকে আমদানি করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে প্রাচীনকাল থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশ এ ব্যতিক্রমধর্মী রাষ্ট্রের মধ্যে একটি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ভারতের পূর্বাঞ্চলে শাসকদের নির্বাচিত করা হতো। আনুমানিক ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পাল বংশের রাজা গোপাল সিংহাসনে বসেন। কিন্তু গোপাল গায়ের জোরে রাজা হননি, দেশের জনগণ তাঁকে রাজা করেছে। এই বিবরণ দুটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। প্রথমত, খালিমপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে গোপালের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে দেশে মাৎস্যন্যায় বা অরাজকতা বিরাজ করছিল। এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশের জনগণ গোপালকে রাজা নির্বাচিত করে। বৌদ্ধ লেখক লামা তারানাথ ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত তাঁর গ্রন্থে গোপালের নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেছেন। উপরিউক্ত তথ্য বিবেচনা করে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

About the middle of the eighth century A.D. a heroic and laudable effort was made to remedy the miserable state of things. The people at last realized that all their troubles were due to the absence of a strong central authority and that this could be set up only by voluntary surrender of powers to one popular leader by the numerous chiefs exercising sovereignty in different parts of the country. It reflects no small credit upon the political sagacity and spirit of sacrifice of the leading men of Bengal that they rose to the occasion and selected one among themselves to be the sole ruler of Bengal to whom they all paid willing allegiance. It is not every age, it is not every nation, that can show such a noble example of subordinating private interests to public welfare. The nearest parallel is the great political change that took place in Japan in A.D. 1870. The result was almost equally glorious and the great bloodless revolution ushered in an era of glory and prosperity such as Bengal has never enjoyed before or since.[১৫]

আইয়ুব খানের আমলে ড. মোহর আলীর নেতৃত্বে কোনো কোনো ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদারের এই বর্ণনাকে অতিরঞ্জিত বলে দাবি করেন।[১৬] তাঁদের বক্তব্য ছিল যে অষ্টম শতাব্দীতে রাজা নির্বাচিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এই সমালোচনা সঠিক নয়। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আসামে একটি পাল বংশ রাজত্ব করেছে। আসামের পাল বংশের ইতিহাসেও বলা হয়েছে, সেখানে গোপাল নামে এক রাজা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৭] ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও রাজা নির্বাচিত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। এ দেশে যেমন রাজতন্ত্র ছিল, তেমনি গণতান্ত্রিক ধারাও প্রচলিত ছিল। তবে এই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য সংখ্যাগুরুদের প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় বসানো নয়, এর উদ্দেশ্য ছিল ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠা। যে অর্থে পেরিক্লিস গণতান্ত্রিক সরকারকে সব নাগরিকের সরকার বলে আখ্যা দিয়েছেন, সে ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে বাঙালিদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। ইংরেজ শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যার মধ্যে রয়েছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ওয়াহাবি বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ ইত্যাদি। এ আন্দোলনগুলো যদিও সরাসরি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল না, তবু এদের লক্ষ্য ছিল জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। পরবর্তীকালে কৃষক বিদ্রোহ ও উপজাতীয়দের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিশ শতকের প্রথম থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহ পরিচালিত হয়। ১৯০৫ সালে শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ

বিরোধী আন্দোলন। এরপর আসে খেলাফত আন্দোলন, আসে অসহযোগ আন্দোলন, আসে ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের একটি লক্ষ্য ছিল দেশে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৪৭ সালে ভারতকে দুভাগে ভাগ করে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। পাকিস্তান অঞ্চলে মুসলিম লীগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এলেও তারা ক্ষমতায় যাওয়ার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে আসে। এর ফলে বাংলাদেশ অঞ্চলে নতুন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ। এ আন্দোলন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দেশে বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। মুসলিম লীগ পাকিস্তানকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ১৯৫০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেছিলেন :

> I have always said, rather it has always been my firm belief, that the existence of the league not only the existence of the league, but its strength is equal to the existence and strength of Pakistan. So far, as I am concerned, I had decided in the very beginning, and I reaffirm it today, that I have always considered myself as the Prime Minister of the League. I never regarded myself as the Prime Minister chosen by the members of the Constituent Assembly.[১৮]

এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* লিখেছেন :

> তিনি জনগণের প্রধানমন্ত্রী হতে চান নাই, একটা দলের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছেন। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল যে এক হতে পারে না, এ কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকতে পারে এবং আইনে এটা থাকাই স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয়, লিয়াকত আলী খানের উদ্দেশ্য ছিল যাতে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল পাকিস্তানে সৃষ্টি হতে না পারে। 'যো আওয়ামী লীগ করেগা উসকো শের কুচাল দে গা'—এ কথা একমাত্র ডিকটেটর ছাড়া কোনো গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লোক বলতে পারে না। জিন্নাহর মৃত্যুর পর সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছিলেন।[১৯]

একদলীয় স্বৈরাচারের বিপক্ষে বঙ্গবন্ধু সব সময়ই বহুদলীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* তাই লিখেছেন, 'বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।'[২০] উপরন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো নেতা যদি অন্যায় কাজ করে, তবে তার প্রতিকার করার অধিকার জনগণের রয়েছে। তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* তিনি লিখেছেন, 'কোনো নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে

বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। যেমন হযরত ওমরকে (রা.) সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বড় জামা পরেছিলেন বলে।'[২১] আওয়ামী লীগ মূলত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিশ্বাস করত এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের বদলে যুক্ত নির্বাচন এবং তরুণ জনগণের ভোটাধিকার দেওয়াতে বিশ্বাসী ছিল। তবে গণতন্ত্রের বিভিন্ন দুর্বলতা সম্বন্ধে আওয়ামী লীগের কোনো সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ বা বক্তব্য ছিল না।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে কর্তৃত্ববাদী ও গণতন্ত্রপন্থী দুটি ধারা দেখা যায়। দুর্ভাগ্যবশত কর্তৃত্ববাদী ধারার সূচনা ঘটে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একদলীয় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান সামরিক শাসকেরা—সামরিক শাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও পরবর্তীকালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ এই কর্তৃত্ববাদী ধারা সহজেই মেনে নেয়নি। গত চার দশকে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করলে নিম্নলিখিত দুর্বলতাসমূহ সহজেই ধরা পড়ে।

ক. অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা। অনেক নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন শাসকদলের পাতানো খেলায় পর্যবসিত হয়। শুধু যেসব নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়, সেসব নির্বাচন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়।

খ. সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত নয় এমন সরকার কর্তৃক দেশ শাসন। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সাংসদেরা নির্বাচিত হন। আনুপাতিক ভিত্তিতে নির্বাচন না হওয়ার ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ ভোটে নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এর ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না।

গ. প্রতিনিধিত্বশীল সরকারে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সব গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সমাধানের দায়িত্ব সাংসদদের। গণভোট বা referendum-এর ব্যবস্থা না থাকাতে (শুধু সামরিক শাসকেরা তাঁদের শাসনকে বৈধ করার জন্য পাতানো গণভোটের ব্যবস্থা করেন) কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জনমত যাচাই করা হয় না। রাজনীতিবিদেরা সাধারণত দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে বিরোধী দলের বক্তব্য কোনো কাজে লাগে না। বিরোধী দলের পক্ষে হরতাল দেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে হরতালের রাজনীতির প্রকোপ কমতে পারে।

ঘ. জনমত অগ্রাহ্য করার অনুদার মূল্যবোধ। এক দিনের নির্বাচনে জয়লাভ

করলে পুরো মেয়াদে দেশ শাসন করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে সরকার একবার নির্বাচনে জিতলে জনমতকে অগ্রাহ্য করে দেশ শাসন করতে পারে।

ঙ. বাংলাদেশে অনুদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সংঘাতের রাজনীতিতে বিরোধী বক্তব্যের কোনো স্থান নেই। উদার গণতন্ত্র যেসব মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার বেশির ভাগই বাংলাদেশে অনুপস্থিত। এখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, নির্বাহী, বিচার ও সংসদের ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিভাজন নেই।

## ৫.৬ উপসংহার

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার চারটি মূল স্তম্ভ হলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র। এই চারটি লক্ষ্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গণতন্ত্র। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে লালিত হয়েছে। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কায়েম করতে হবে। উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। কাজেই জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুষ্ঠু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। অথচ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বারবার ব্যাহত হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পাশ্চাত্য থেকে ধার করা হয়নি। এখানে প্রাচীনকাল থেকে গণতান্ত্রিক ধারা প্রচলিত। বাংলাদেশ অঞ্চলের সবচেয়ে স্থিতিশীল ও বৃহৎ সাম্রাজ্য পাল সাম্রাজ্যের প্রথম নৃপতি গোপাল জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ বারবার বৈদেশিক শাসন প্রত্যাখ্যান করেছে। ঐকমত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সুষ্ঠু সমাধান। যদিও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উদ্ভব, তবু বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই হয়েছে।

গণতন্ত্রের জন্য আত্মত্যাগের পরও বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখনো পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বিকশিত হয়নি। ফ্রিডম হাউস নামে একটি মার্কিন সংগঠন পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহকে গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে: (ক) পূর্ণ গণতান্ত্রিক বা স্বাধীন, (খ) আংশিক গণতান্ত্রিক বা আংশিক স্বাধীন, (গ) অগণতান্ত্রিক বা স্বাধীন নয়। ২০১৬ সালে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (সারণি-৫.৩ দেখুন)

## সারণি-৫.৩
## ফ্রিডম হাউসের মূল্যায়নে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অবস্থান

| রাষ্ট্রের শ্রেণি | মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা | দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের নাম | সার্বিক মূল্যায়নে দক্ষিণ এশিয়াতে অবস্থান (সার্বিক মূল্যায়নের নম্বর) |
|---|---|---|---|
| স্বাধীন | ৮৬ | ভারত—স্বাধীন | ১ম (সার্বিক মূল্যায়ন—৭৭) |
| আংশিকভাবে স্বাধীন | ৫১ | শ্রীলঙ্কা—আংশিকভাবে স্বাধীন<br>ভুটান—আংশিকভাবে স্বাধীন<br>নেপাল—আংশিকভাবে স্বাধীন<br>বাংলাদেশ—আংশিকভাবে স্বাধীন<br>মালদ্বীপ—আংশিকভাবে স্বাধীন<br>পাকিস্তান—আংশিকভাবে স্বাধীন | ২য় (সার্বিক মূল্যায়ন—৫৬)<br>২য় (সার্বিক মূল্যায়ন—৫৬)<br>৩য় (সার্বিক মূল্যায়ন—৫৪)<br>৪র্থ (সার্বিক মূল্যায়ন—৪৯)<br>৫ম (সার্বিক মূল্যায়ন—৪৩)<br>৬ষ্ঠ (সার্বিক মূল্যায়ন—৪১) |
| স্বাধীন নয় | ৫০ | ---- | ---- |
| মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা | ১৯৫ | ---- | ---- |

উৎস : Freedom House. *2016 Freedom in the World 2016*

দক্ষিণ এশিয়ার সাত দেশের গণতন্ত্রের মূল্যায়নে বাংলাদেশের স্থান পঞ্চম। মালদ্বীপ ও পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের অবস্থান বাংলাদেশের ওপরে। ভারত ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূল্যায়নের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও নেপালের নিচে। বাংলাদেশ সার্বিক মূল্যায়নে মাত্র ৪৯ নম্বর পেয়েছে, অথচ পরিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক দেশের মূল্যায়নে ১০০ নম্বর পেয়েছে এমন দেশও রয়েছে। শুধু মূল্যায়নের দিক থেকেই বাংলাদেশের অবস্থান উদ্বেগজনক নয়, ২০১৬ সালের মূল্যায়ন থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে।[২২]

এ অবনতির মূল কারণ হলো বাংলাদেশে মানবাধিকারের লঙ্ঘন ও জঙ্গিবাদের তৎপরতার ফলে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

গত চার দশকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অনেক উত্থান ও পতন ঘটেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থাসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

- অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত। বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। শুধু নির্বাচন কমিশনের সংস্কার করে নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করা যাবে না, এর জন্য নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কেও জাতীয় ঐকমত্যের প্রয়োজন রয়েছে।
- আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন। বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সংখ্যাগুরু ভোটভিত্তিক নির্বাচন-ব্যবস্থা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য করে। এর ফলে এ ধরনের প্রতিনিধিরা স্থানীয় সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে আনুপাতিক হারে নির্বাচিত সাংসদদের এ ধরনের প্রবণতা থাকে না। তবু একটি কারণে বাংলাদেশে সম্পূর্ণ আনুপাতিক হারে অথবা আনুপাতিক হার ও সংখ্যাগুরুভিত্তিক নির্বাচনের মিশ্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত, যেখানে নির্বাচনী এলাকায় এক ভোট বেশি পেলে নির্বাচিত হওয়া যায়, সেখানে ভোট জালিয়াতির আশঙ্কা বাড়ে। বাংলাদেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচনে একটি আসনলাভের জন্য তিন লাখ ভোট জাল করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বর্তমানে সংঘাতের রাজনীতি বিরাজ করছে। প্রধান দলগুলোর মধ্যে কোনো লেনদেন নেই। আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে দেখা দেবে। এর ফলে সংঘাতের রাজনীতি যে অবিশ্বাসের দেয়াল গড়ে তুলেছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই ভেঙে যাবে। আনুপাতিক হারে নির্বাচন বাংলাদেশে রাজনীতিতে পুনরায় সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তৃতীয়ত, আনুপাতিক হারে নির্বাচনের ফলে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের প্রতিফলন ঘটবে। চতুর্থত, আনুপাতিক হারে নির্বাচনে দলগুলো বিশেষজ্ঞদের মনোনয়ন দিতে পারে। এতে সংসদেও কাজের মান উন্নত হবে।
- বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণ। এ ব্যবস্থায় দেশের জনগণ এক দিনের রাজা। শুধু ভোটের দিন জনমতকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বাকি সময় রাষ্ট্র নির্বাচিত দল পরিচালনা করে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেয়। বড় বড় রাজনৈতিক প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। গণভোট ও প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের সমন্বয় সম্ভব। তবে 'রিকল' বা নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের সমন্বয় সম্ভব নয়। তাই যদি অনেক ক্ষেত্রে 'রিকল' ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা যায়, তবু এ মুহূর্তে তা প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় হবে না।

- উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসার। অনুদার গণতন্ত্রকে উদার গণতন্ত্রে রূপান্তর করতে হবে। বাংলাদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদার গণতন্ত্রের মূল্যবোধ অনুপস্থিত। আইনের শাসন, ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করতে হবে। এর জন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন করতে হবে।
- সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করতে হয়। সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। এ আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলো সহযোদ্ধা হতে পারে। কিন্তু শক্তিশালী সিভিল সমাজ ছাড়া গণতন্ত্রকে সুসংহত করা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম প্রসঙ্গে অ্যান্থনি গিডেন্স যথার্থই লিখেছেন, 'Nothing comes without struggle. But the furtherane of democracy at all levels is worth fighting for and it can be achieved.'[২৩]

## পাদটীকা

১. Francis Fukuyama. 1989. 'The End of History?' *The National Interest*. Summer 1989

২. Anthony Giddens. 1999. *Runaway World, How Globalization Is Reshaping Our World.* London: Profile Books, 69

৩. Thucydides. 1954. *History of the Pelopponesian War.* Translated by Rex Warner. London: Penguin Book, 141

৪. Farid Zakariah. 2003. *The Future of Fredom.* New York: Viking, 1999

৫. James Buchanon and Gordon Tullok. 1962. *The Calculus of Consent.* Ann Arbor. University of Michigan Press, 213

৬. John G Matsusaka. 2005. `Direct Democracy Works'. *The Journal of Ecnomic Perspective.* Spring 2005, 187

৭. এ প্রসঙ্গে দেখুন Joshoua J. Doyck and Edward L. Lascher Jr. 2009 'Direct democracy and political efficiency Reconsidered'. *Political behavior.* December 2009; 401, 427

৮. John J. Matsusaka. 2005 'The Eclipse of Legislator. Direct Democracy in the 21st Century'. *Public Choice.* July 2005, 157 to 169

৯. Farid Zakaria. 1992. 'The Rise of Liberal Democracy'. *Foreign Affairs.* November, December 1992

১০. Anthony Giddens. 1999 *প্রাগুক্ত*, ৭১, ৭২

১১. Amartya Sen. 1999 *Development as Freedom.* New York. Alfred A. Knopf, 151

১২. Adam Przeworski and Fernando Limogno. 1993 'Political regimes and economic growth. *Journal of Economic Perspectives.* Summer 1993, 51-69

১৩. Amartya Sen. 1999 প্রাগুক্ত, ৫১-৫২

১৪. Quoted in Reichard M. Lanworth. http // reichardlanworth.com/worst-from-of-government

১৫. R. C. Majumdar. 1959 *The Age of Imperial Kanau: History and culture of Indian people vol-4.* Bombay, 44

১৬. Abdul Momen Chowdhury. 1967 *Dynastic History of Bengl. Dacca: Asiatic society of Pakistan*

১৭. Debabrata Datta. 1986 *History of Assam.* Calcatta: Sreevhumi Publishing Company

১৮. উদ্ধৃত শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১২। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী।* ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৩৪

১৯. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১২। প্রাগুক্ত, ১৩৩-৩৪

২০. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১২। প্রাগুক্ত, ২১৪

২১. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১২। প্রাগুক্ত, ১০০

২২. Freedom House. 2016 *Freedom in the World 2016,* 18

২৩. Anthony Giddens. ১৯৯৯ প্রাগুক্ত, ৮২

## তৃতীয় খণ্ড

# রাষ্ট্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ : লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে

Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the king's horses and all the king's men
Could not put Humpty Dumpty together again.

—Nursery Rhyme

লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

# বঙ্গভবনে বাঁটকু : নির্বাহী বিভাগ কি 'নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রে'র পথে চলছে?

## ৬.১ সূচনা

Do you think the *Batku* (dwarf) sitting in Banga Bhavan is running your country?

প্রশ্নটি করেছিলেন আমাকে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মরহুম এম সাইফুর রহমান। প্রশ্নটির তাৎপর্য বুঝতে হলে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বলতে হয়। ১৯৯১ সালের শেষ দিকে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে অর্থনৈতিক পরামর্শক (Economic Minister) পদ থেকে বদলি হয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে যোগ দিই। অর্থ বিভাগে যোগ দেওয়ার দুই-তিন দিন পর অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি কোনো একটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন এবং তাঁকে অপসারণ করে তাঁর জায়গায় জ্যেষ্ঠতম উপব্যবস্থাপনা পরিচালককে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করে ফাইল পেশ করতে পরামর্শ দেন। আমি অফিসে ফিরে আসি এবং সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সন্তুষ্ট হই যে মন্ত্রীর অভিযোগসমূহের অনেকাংশেরই সত্যতা রয়েছে। আমি যুগ্ম সচিবকে অবিলম্বে মন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে ফাইল প্রস্তুত করতে অনুরোধ করি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফাইল আমার টেবিলে চলে আসে। নথিতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য একটি সারসংক্ষেপ পেশ করা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের পরিবর্তন সংক্রান্ত ফাইল রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হতো। কিন্তু এরশাদের পতনের পর সংবিধান সংশোধন করে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার সাংবিধানিকভাবে চালু করা হয়। সংবিধান সংশোধন হলেও

তখনো কার্যবিধিমালা সংশোধিত হয়নি। সংবিধান সংশোধনের আগের পাঠে কার্যবিধিমালায় নির্দেশ ছিল যে ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমতি লাগবে। যেহেতু তখনো সংবিধান ও কার্যবিধিমালার মধ্যে অসংগতি ছিল, সেহেতু এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমতির প্রয়োজন আছে কি না, সে সম্পর্কে ক্যাবিনেট ডিভিশনের নির্দেশনা চাওয়া হয়। আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্যাবিনেট বিভাগ জানায় যে যত দিন পর্যন্ত কার্যবিধিমালা সংশোধিত না হবে, তত দিন পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিতে হবে। যুগ্ম সচিব আমাকে নথি দেখালেন। আমি সন্তুষ্ট হয়ে রাষ্ট্রপতির জন্য তৈরি করা সারসংক্ষেপ অর্থমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিই।

পরের দিন মন্ত্রী অফিসে আসার পর তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী আমাকে খবর দিলেন যে আমি যেন মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করি। আমি মন্ত্রীর কক্ষে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থমন্ত্রী আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি কেন রাষ্ট্রপতির জন্য সারসংক্ষেপ পেশ করলাম? দেশে যে মন্ত্রিসভাশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়েছে, সেটা সম্পর্কে কি আমি অবগত নই? সেই প্রসঙ্গেই তিনি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন যে আমি কি মনে করি বঙ্গভবনে উপবিষ্ট বাঁটকু সত্যি সত্যিই দেশ পরিচালনা করছেন? আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে এ কাজ করা হয়েছে বলার পর তাঁর রাগ গিয়ে পড়ল আইন মন্ত্রণালয়ের ওপর। তিনি আইনসচিবকে টেলিফোনে গালিগালাজ করলেন এবং আমাকে বললেন যে নথি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো যাবে না। আমি বললাম, আপনি লিখে দেন যে প্রধানমন্ত্রীর জন্য সারসংক্ষেপ পেশ করা হোক। তিনি লিখে দিলেন এবং তদনুসারে আবার নথি তাঁর কাছে ফিরে গেল এবং তাঁর ও প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে ব্যবস্থা গৃহীত হলো।

বিভাগীয় কাজের সমাধান ঠিকই হলো, কিন্তু আমার মনে একটা বড় খটকা জেগে উঠল। তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক ভালো ছিল না। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি খর্বাকৃতির ছিলেন। কিন্তু বাঁটকু শব্দটি ব্যবহার করে অর্থমন্ত্রী শুধু খর্বাকৃতিকেই পরিহাস করেননি, এর ভেতর অর্থমন্ত্রীর রাজনৈতিক দর্শনও নিহিত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, মন্ত্রিসভাশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা গৌণ। মন্ত্রিসভার সদস্যরা যদি দৈত্যের মতো ক্ষমতাবান হন, তাহলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেহাত বাঁটকুর মতো।

অথচ এ অবস্থা কিন্তু সব সময় ছিল না। ১৯৭৩ সালে আমি যখন বৃত্তি নিয়ে কানাডাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যাই, তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তাঁর সময়ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠেছিল, যার সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশত আমিও জড়িয়েছিলাম।

ঘটনাটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত। তত দিনে দেশে কলাবরেটরদের

শাস্তি দেওয়ার জন্য আইন পাস হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকের হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার বিভিন্ন অভিযোগ আসতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তখন ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। তাঁর মতে, এসব অভিযোগ সঠিক ছিল না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য পুলিশের কর্মকর্তারা উপযুক্ত নন। কাজেই তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছে একটি নথি নিয়ে যান। সেখানে প্রস্তাব করা হয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 'কলাবরেটর' আইনে পুলিশ কোনো তদন্ত করবে না। এ বিষয়ে তদন্তের ভার দেওয়া হবে চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটিকে। মোজাফফর আহমদ চৌধুরী এ ফাইল স্বাক্ষরের জন্য সরাসরি গণভবনে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আলী সাহেবকে ডেকে পাঠান। ড. চৌধুরী ও প্রফেসর ইউসুফ আলীর সঙ্গে পরামর্শ করে বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত কমিটির সদস্যদের তালিকাও মৌখিকভাবে অনুমোদন করেন। তারপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ সম্পর্কে নথি অবিলম্বে পেশ করার জন্য নির্দেশ দেন।

আমি তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উচ্চশিক্ষা, শিক্ষা সংস্কার, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও যুবসংক্রান্ত বিষয়ের উপসচিব। শিক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে ফিরে এসে আমাকে ডেকে পাঠান এবং অনুমোদিত কমিটির তালিকাটি আমার হাতে দিয়ে এ সম্পর্কে একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন। আমি শিক্ষামন্ত্রীকে জানাই যে এ ধরনের কমিটির আইনগত বৈধতা পরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এখন আর আইন মন্ত্রণালয়ের কোনো পরামর্শের প্রয়োজন নেই। তিনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নথি তৈরি করতে বলেন।

আমি আমার অফিসে ফিরে আসি এবং শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে একটি বিজ্ঞপ্তির খসড়া প্রস্তুত করে টাইপিস্টকে টাইপ করার জন্য দিই। তারপর আমি আমার বক্তব্য লিখি। সেই নোটে আমি লিখি, শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশক্রমে আমি এই বিজ্ঞপ্তির খসড়া পেশ করছি। তবে বিষয়টি আইনসম্মত কি না, সে সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন রয়েছে এবং সেই প্রশ্নগুলোও অতি সংক্ষেপে আমি নোটে লিখি এবং সবশেষে লিখি যে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি অনুমোদনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানোর জন্য নথি পেশ করা হলো। আমার স্বাক্ষর করার পর শিক্ষাসচিব এবং শিক্ষামন্ত্রী কিছু না লিখে শুধু স্বাক্ষর করে ফাইল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকেও তড়িৎগতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে ফাইলটি পাঠানো হয়।

আশা করা হচ্ছিল যে রাষ্ট্রপতির অফিস থেকে ফাইলটি এক দিনের মধ্যে বেরিয়ে আসবে। দুই-তিন দিন পরও যখন ফাইলটি ফেরত আসে না, তখন

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চান যে ফাইলের কী হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আমাকে বঙ্গভবনে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেন। আমি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি আমাকে জানান যে তাঁরা ফাইল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এই ফাইল স্বাক্ষর করেননি। আমি শিক্ষামন্ত্রীকে এই তথ্য জানিয়ে দিই। দিন দশেক পর হঠাৎ শিক্ষামন্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি আমাকে বললেন যে রাষ্ট্রপতি তাঁকে ডেকেছিলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রশ্ন করেন, যে বিজ্ঞপ্তি আমার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন, সেই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে যে নোট আছে, তা পড়েছেন কি? শিক্ষামন্ত্রী বললেন, স্যার, পড়েছি। এটি একজন উপসচিব লিখেছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা এবং আবেগপ্রবণ।

রাষ্ট্রপতি বললেন, মোটেও আবেগপ্রবণ নন, তাঁর এই নোট পড়ে আমার মনেও প্রশ্ন জাগে এবং এ বিষয়ে আমি হাইকোর্ট লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়াশোনা করেছি। আমার ধারণা, তিনি যা লিখেছেন, সেটা সঠিক এবং আমি এই কমিটির অনুমোদন করতে পারব না। আপনি মেহেরবানি করে বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দেবেন। ইউসুফ আলী সাহেব বঙ্গবন্ধুর কাছে যান। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেন, রাষ্ট্রপতি একজন সাবেক বিচারপতি এবং তিনি যদি এটা আইনসম্মত মনে না করেন, তাহলে এটা না করাই ভালো। সুতরাং ফাইলটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্বাক্ষরিত অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী ফেরত নিয়ে আসেন। তিনি ফাইলটি আমার হাতে দিয়ে বললেন যে এ বিষয়ে আর কিছু করার নেই। তিনি আরও বললেন, রাষ্ট্রপতি আপনাকে সাহসী নোট লেখার জন্য অভিনন্দন জানাতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও শেষ পর্যন্ত মর্যাদা নিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে টিকে থাকতে পারেননি। তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রপতির পদের অবমূল্যায়ন শুরু হয়।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিভাজন বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তনের একটি বড় বিষয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে। ক্ষমতার দিক থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ফ্রান্সের বুরবন সম্রাট, রাশিয়ার জার ও মোগল বাদশার সঙ্গে তুলনীয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বাড়ছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ নেই। তবে এই ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি সীমা থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে Thomas Paine যথার্থই বলেছেন :

> No country can be called free which is governed by an absolute power and it matters not whether it be an absolute royal power or an absolute legislative power as the consequences will be the same to the people.

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অবশ্যই বাড়াতে হবে। কিন্তু এ ক্ষমতা বাড়িয়ে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করা চলবে না। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন অবশ্যই থাকতে হবে। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশে saparation of power বা ক্ষমতার বিভাজনের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

এই নিবন্ধে সুশাসন ও নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। সূচনা খণ্ডের পর দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও তাঁর সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে সাংবিধানিক ক্ষমতার ভারসাম্যের ওপর কোনো প্রভাব পড়েছে কি না, সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ খণ্ডে নির্বাহী বিভাগের পুনর্গঠন সম্পর্কে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

## ৬.২ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৭২ সালের ৪৮ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধান করা হয়:

> ৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।
>
> (২) রাষ্ট্রপতিরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।
>
> (৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা-অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।[১]

বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে এই ধারার বিভিন্ন পরিবর্তন করা হয়। সংবিধানের সর্বশেষ পাঠ অনুসারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিম্নরূপ:

> ৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।
>
> (২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।[২]

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রের অন্য সব ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে সংবিধানে ৪৮(৩) ধারায় সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া তাঁর জন্য সব দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হবে। মূল সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে বস্তুত প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া আর কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সংবিধান সংশোধন আইন ১৯৯১-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করতে পারবেন। এই দুই ক্ষেত্র ছাড়া রাষ্ট্রপতির নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। এ ধরনের ব্যবস্থার পক্ষে প্রধান যুক্তি হলো যে দেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি নেতৃত্ব থাকতে হবে। নেতৃত্বের বিভক্তির ফলে দেশে অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে। তবে এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

রাষ্ট্রপতির কাছে কোনো প্রস্তাব পেশ করা হলে রাষ্ট্রপতি যদি এর চেয়েও কোনো ভালো প্রস্তাব থাকে, তা বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদের কাছে পেশ করার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ নির্বাহী বিভাগের সব কর্মকর্তারই তাঁদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। তবে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতিকে এ সুযোগ দেওয়া না হলেও পরোক্ষভাবে এ ক্ষমতা সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৪৮(৫) অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।' রাষ্ট্রপতিকে যেকোনো বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে কোনো নথির সুপারিশ সম্পর্কেও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভায় আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে পারেন। এ ব্যবস্থার সুবিধা হলো এই যে এ ধরনের সুপারিশ হবে অনানুষ্ঠানিক এবং গোপন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। বাংলাদেশে গত চার দশকে রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য কোনো প্রস্তাব পেশ করেছেন কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

এই ব্যবস্থার বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক) প্রথমত, রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দিতে হলে সেটা সংবিধানে লিখিতভাবে দেওয়াই হবে বিধেয়। যেহেতু আমাদের লিখিত সংবিধান রয়েছে, সেহেতু

কোনো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির মতদ্বৈধতা প্রকাশের সুযোগ লিখিতভাবে দিতে হবে। কমনওয়েলথের কোনো কোনো রাষ্ট্রের সংবিধানে এ ধরনের বিধান রয়েছে।

খ) দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যদি বাংলাদেশে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার থাকে, তবে সে পরামর্শ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে পাকিস্তান ও ভারতের সংবিধানে কী নির্দেশ আছে, সে বিষয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতে যখন মূল সংবিধান গৃহীত হয়, তখন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপর কোনো সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। ধরে নেওয়া হয় যে যেহেতু ভারতে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেহেতু এই ধরনের সরকারি রীতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি রাজত্ব করবেন কিন্তু শাসন করবেন প্রধানমন্ত্রী। অবশ্য কোনো কোনো শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ এ মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, যেহেতু সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি, সেহেতু রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র প্রধান (figurehead) নন এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে তিনি রাষ্ট্রের পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন। মূল ভারতীয় সংবিধানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রীতিনীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। ব্রিটেনে কোনো লিখিত সংবিধান নেই। ব্রিটেনে রাজার ক্ষমতার ওপর কোনো বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু কার্যত ব্রিটেনের রাজা নিজে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তার মানে এই নয় যে রাজার ক্ষমতা নেই, বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজা তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এর ফলেই ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীরা এমন কোনো কাজ করেননি, যা রাজা অনুমোদন দেবেন না।

দীর্ঘদিন ধরে রাজা এবং প্রধানমন্ত্রীর মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটেনে একটি সুস্থ রাজনৈতিক ধারা গড়ে উঠেছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে ব্রিটেনের রাজার মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় কোনো শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নেই। এখানে ঐতিহাসিক বিবর্তনে সুস্থ রীতিনীতিও গড়ে ওঠেনি। এর ফলে ১৯৭৬ সালে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন, তখন তিনি সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হ্রাস করেন। সংবিধানের ৪২ নম্বর সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৭৪ সংশোধন করা হয় এবং বলা হয় 'The President of India is bound by the advice of the Council of Ministers.'[৩] সুতরাং বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ভারতের রাষ্ট্রপতির মতোই খর্বিত। তবে ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ শুনতে বাধ্য। বাংলাদেশে তাই প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছে :

> Article 48(1) In the excrcise of his functions, the President shall act [on and] in accordance with the advice of the Cabinet [or the Prime Minister]|
>
> [Provided that [within fifteen days] the President may require the Cabinet or, as the case may be, the Prime Minister to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall [within ten days] act in accordance with the advice tendered after such reconsideration/]
>
> (2) Notwithstanding anything contained in clause (1), the President shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he is empowered by the Constitution to do so [and the validity of anything done by the President in his discretion shall not be called in question on any ground whatsoever].[8]

লক্ষণীয়, পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রিপরিষদের সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে এ ধরনের আদেশ নথিপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রিপরিষদ পুনর্বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত দেবে, সেই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে ১০ দিনের মধ্যে অনুমোদন করতে হবে। সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার ফলে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও চার ধরনের সমস্যা রয়েছে। প্রথম হলো, রাষ্ট্রপতি শুধু রাষ্ট্রের প্রথম নাগরিক নন, তিনি রাষ্ট্রের অভিভাবক। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে সংঘাতের রাজনীতি বিরাজ করছে, সেখানে এমন শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দিতে পারে, যার সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো সমাধান নেই। এ অবস্থাতে ব্রিটেনের মতো রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট না করাই ভালো। কিন্তু ব্রিটেনে লিখিত সংবিধান নেই। বাংলাদেশে লিখিত সংবিধানে এ ধরনের অস্পষ্টতা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে, সেটা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগে আরেকটি সমস্যা হলো, শাসনতান্ত্রিক অথবা কার্যত অনুরূপ পদে নিয়োগ। সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে শুধু প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারকের নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদ রয়েছে, যেখানে যোগ্য এবং অবিতর্কিত প্রার্থী নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। এসব পদের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, (শাসনতান্ত্রিক পদের বাইরে) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, মানবাধিকারের চেয়ারম্যান ও

সদস্য, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে এসব পদে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এই সব পদে নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া যেতে পারে। তবে সমস্যা হলো, এতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং তাঁর কাছে এটা গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। অবশ্যই দেশের শাসনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বিবেচনায় নিতে হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে, তবে শর্ত থাকবে যে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ ব্যতীত প্রধান বিচারপতির পদ ছাড়া অন্য কোনো পদ রাষ্ট্রপতি নিজ উদ্যোগে পূরণ করতে পারবেন না। এর তাৎপর্য হলো যে রাষ্ট্রপতি কোনো মনোনয়ন অনুমোদন না করলে তাঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী নতুন মনোনয়ন দেবেন। তবে প্রধানমন্ত্রী কাউকে মনোনয়ন না দিলে রাষ্ট্রপতি সেসব পদে নিজ উদ্যোগে নিয়োগ দিতে পারবেন না।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে: '(৪৯) কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।' বাংলাদেশে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের এই অধিকার রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে অপব্যবহার করা হয়। নির্বাহী বিভাগ তাদের সুবিধা অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায়। কিন্তু এই ক্ষমতার অপব্যবহার হলে দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা কমে যাবে। কাজেই এই ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

সবশেষে জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের বিধান রয়েছে। গত তিন দশকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অপসারণ করা হয়েছে। এতে দেশের প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ন্যায়বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কোনো কর্মকর্তার অপসারণ প্রস্তাব করলে তা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। এর ফলে যে সুপারিশ আসে, সেই সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়। এখানেও প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান বা শাস্তির পরিমাণ হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া যেতে পারে।

তবে সংবিধান সংশোধন করলেই যে রাষ্ট্রপতি যথাযথভাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রথমত, রাষ্ট্রপতিকে এমন এক ব্যক্তিত্ব হতে হবে, যাঁর রাষ্ট্রপতিসুলভ গুণাবলি রয়েছে। যদি অযোগ্য ব্যক্তিকে এ পদে নিয়োগ করা হয়, তবে সংবিধান সংশোধন করেও সুফল পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, যোগ্য ব্যক্তিত্ব পাওয়া গেলেও সাহসী ব্যক্তিত্বের অভাব বাংলাদেশে রয়েছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করতে

হবে। রাষ্ট্রপতির কার্যকলাপ নিয়ে অহেতুক বিতর্ক হলে তাঁর পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রপতি মূলত সরকারি দলের সমর্থন নিয়ে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন সংসদ সদস্যরা এবং ক্ষমতাসীন দলেরই সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করার পর সরকারি দলের উচিত তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করে রাষ্ট্রের অভিভাবকরূপে তাঁর ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করা। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদকেও অনেক ক্ষেত্রে দলীয়করণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচনের পর তিনি কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করলে বিএনপি তাঁকে অভিশংসনের হুমকি দেয়। অভিশংসিত হওয়ার বদলে জনাব চৌধুরী পদত্যাগ করেন। অন্যদিকে নির্দলীয় প্রার্থী বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে আওয়ামী লীগ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। কিন্তু ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী পরাজয়ের পর আওয়ামী লীগ নিজেই জনাব আহমদকে বিতর্কিত করে তোলে। এসব উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির পদ দলীয়করণ করার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

## ৬.৩ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

বিশ্বব্যাপী নির্বাহী বিভাগের প্রধানের ক্ষমতা বেড়ে চলেছে। দেশরক্ষার প্রয়োজনে শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য শক্তিমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দরকার। নিরাপত্তার সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য শক্তিশালী নির্বাহী প্রধানের প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত গড়ে তোলার জন্যও শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন। এসব মিলে রাষ্ট্রপতিশাসিত এবং মন্ত্রিসভাশাসিত উভয়ের ব্যবস্থাতেই নির্বাহী বিভাগের প্রধানের ক্ষমতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। এসব গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বেশির ভাগ দেশেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা উচ্চ পর্যায়ের। ১৯৯৪ সালে আর্থার কিং ২২টি দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিশ্লেষণ করেন।[৫] এই বিশ্লেষণে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। ১. নিম্ন পর্যায়ের ২. মধ্যম পর্যায়ের ৩. উচ্চপর্যায়ের। ২০০৭ সালে Eoin O'malleyও এই ২২টি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিশ্লেষণ করেন।[৬] এই বিশ্লেষণে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে ১ থেকে ১০ নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। ৫.৩

তাংশের নিচে যেসব দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা মূল্যায়িত হয়েছে, সেসব দশকে নিম্ন পর্যায়ের ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ৫.৯৫ থেকে ৬.৭৮ যেসব দেশের ধানমন্ত্রীর মূল্যায়ন, তাদের মধ্যম পর্যায়ের এবং ৬.৭৯ এর উর্ধ্বে যেসব দেশ, সসব দেশকে উচ্চপর্যায়ের বলে মূল্যায়ন করা হয়। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পাত্ত সারণি-৬.১-এ দেখা যাবে।

**সারণি-৬.১**
**২২টি রাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মূল্যায়ন**

| রাষ্ট্রের নাম | King-এর মূল্যায়নে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অবস্থান | O'Malley-এর মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর | O'Malley-এর মূল্যায়নে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অবস্থান |
|---|---|---|---|
| কানাডা | উঁচু | ৮.২৪ | উঁচু |
| মালটা | উঁচু | ৭.১৬ | উঁচু |
| গ্রিস | উঁচু | ৭.১০ | উঁচু |
| অস্ট্রেলিয়া | উঁচু | ৬.৯৮ | উঁচু |
| স্পেন | উঁচু | ৬.৯২ | উঁচু |
| যুক্তরাজ্য | উঁচু | ৬.৮০ | উঁচু |
| লুক্সেমবার্গ | মধ্যম | ৬.৫০ | মধ্যম |
| জার্মানি | উঁচু | ৬.২৯ | মধ্যম |
| ইসরায়েল | নিম্ন | ৬.২১ | মধ্যম |
| পর্তুগাল | উঁচু | ৬.২০ | মধ্যম |
| নিউজিল্যান্ড | উঁচু | ৬.১৫ | মধ্যম |
| নেদারল্যান্ডস | নিম্ন | ৬.০৯ | মধ্যম |
| আয়ারল্যান্ড | উঁচু | ৬.৮ | মধ্যম |
| বেলজিয়াম | মধ্যম | ৬.৫ | মধ্যম |
| সুইডেন | মধ্যম | ৬.১ | মধ্যম |
| ডেনমার্ক | নিম্ন | ৫.৭৭ | নিম্ন |
| ফিনল্যান্ড | নিম্ন | ৫.৭৬ | নিম্ন |
| নরওয়ে | নিম্ন | ৫.৭২ | নিম্ন |
| অস্ট্রিয়া | মধ্যম | ৫.৪২ | নিম্ন |
| ইতালি | নিম্ন | ৪.৯৮ | নিম্ন |
| জাপান | নিম্ন | ৪.৬১ | নিম্ন |
| আইসল্যান্ড | নিম্ন | ৩.৭৫ | নিম্ন |

ৎস : Eoin O'malley . 'The Power of Prime Minister: results of an expert survey'. 007 *International Political Science Review,* Vol. 21, No.1, 7227

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে একটি সমীক্ষা অনুসারে ২২টি পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ১০টি দেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা উঁচু পর্যায়ের। আর ৫টি দেশের মধ্যম পর্যায়ের। মাত্র ৭টি দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা নিম্ন পর্যায়ের। সমীক্ষা হতে দেখা যাচ্ছে যে বেশির ভাগ সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা উচ্চ পর্যায়ের। কাজেই বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা উচ্চ পর্যায়ের হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ নিয়ে শঙ্কার কোনো কারণ নেই। শঙ্কার কারণ অন্যত্র। এ ক্ষমতার বিশ্লেষণ মূলত আইনগত ক্ষমতার ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা শুধু আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। আইনবহির্ভূত উৎসের ক্ষমতা অনেক বেশি।

**মন্ত্রিসভাশাসিত সরকারের স্থলে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারের উদ্ভব**

বিগত শতাব্দীতে সংবিধান বিশেষজ্ঞ Walter Bagehot প্রথম সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী পদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতো প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার ওপর জোর দেন।[৭] এর ফলে সংসদীয় ব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন দেখা দেয়। এমনিতে সংসদীয় ব্যবস্থায় cabinet from of government বা মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ ধরনের সরকারে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই মন্ত্রিসভার নেতা; কিন্তু তাঁকে তাঁর সহকর্মীদের সম্মতির ওপর নির্ভর করতে হয়। তিনি প্রধান ঠিকই, কিন্তু এই প্রধান হওয়ার অর্থ হলো, তিনি সহকর্মীদের মধ্যে প্রথম, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Primus inter peres'| এর তাৎপর্য হলো, অন্য মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর অধীন নন, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী। প্রধানমন্ত্রী সহকর্মীদের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন ঠিকই কিন্তু তাঁকে সহকর্মীদের সমান মর্যাদা দিতে হয়। তাই মন্ত্রিসভাশাসিত যে সরকার, সে সরকারের দায়িত্ব হলো যৌথ। সব মন্ত্রী মিলে সংসদের কাছে দায়ী থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন সময় জরুরি অবস্থার কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উপরন্তু নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় জনগণ সুদৃঢ় নেতৃত্ব দেখতে চান। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর পদের মর্যাদা তখন মন্ত্রীদের পদের মর্যাদার চেয়ে অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় অনেক দেশেই মন্ত্রিসভাশাসিত সরকারের স্থলে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারের (যাকে ইংরেজিতে prime ministerial government বলা হয়ে থাকে) উদ্ভব হয়। এই ব্যবস্থাতে মন্ত্রীরা যদিও প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী, তবু তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন নন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের অধীন গণ্য করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী যাঁকে খুশি মন্ত্রী করেন, যাঁকে খুশি বাদ দেন, যাঁকে খুশি গুরুদায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব দেন। মন্ত্রীরা

প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন কিন্তু তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ করবেন কি করবেন না, সে ব্যাপারে মন্ত্রীদের কোনো কিছু বলার এখতিয়ার নেই। পৃথিবীর প্রায় সব সংসদীয় রাষ্ট্রেই মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার ক্রমান্বয়ে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারে রূপান্তরিত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৩) অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে যে 'মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবে।' আইনগতভাবে বাংলাদেশে তাই মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার কার্যকর রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সংবিধানের ৫৫(১) ও (৫৫(২) অনুচ্ছেদ স্মরণ করা যেতে পারে :

> ৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত উপায়ে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। (১) কে মন্ত্রী হবেন, সে সিদ্ধান্ত তিনি একাই গ্রহণ করেন এবং কাকে কোন মন্ত্রণালয় দেওয়া হবে, সে সিদ্ধান্তও তিনি নিজে গ্রহণ করেন। যাঁরা মন্ত্রী পদের জন্য অথবা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী, তাঁদের প্রধানমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। (২) সংবিধানের ৫৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মন্ত্রী অনুরূপ অনুরোধ পালনে অসমর্থ হইলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান ঘটাইবার পরামর্শ দান করিতে পারিবেন।' প্রধানমন্ত্রী কোনো মন্ত্রীর আচরণে অসন্তুষ্ট হলে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে পারেন। (৩) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত হয় না। কোন বিষয়ের ওপর কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি কোনো মন্ত্রী সে সিদ্ধান্ত মেনে না নেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে পারেন। এসব বিধানের ফলে সাংবিধানিকভাবে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার কার্যত প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারে পরিণত হয়।

### কার্যবিধিমালায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।' তবে প্রধানমন্ত্রী কীভাবে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশ

সংবিধানে নেই। এ সম্পর্কে ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যবিধি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।' সুতরাং সরকারের কার্যাবলি পরিচালিত হয় মূলত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত কার্যবিধিমালা অনুসারে। এই কার্যবিধিমালায় সব নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। এর কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো :

(১) কার্যবিধিমালায় যেসব বিধি আছে, তা প্রধানমন্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। ৩৩ নম্বর বিধিতে বলা হয়েছে, 'The prime minister may, in any case or classes of cases, permit or condone a departure from these Rules to the extent he deems necessary.'[৮] এই বিধিতে প্রধানমন্ত্রীকে দুই ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, তিনি যদি মনে করেন যে কোনো ক্ষেত্রে কার্যবিধিমালা লঙ্ঘন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অগ্রিম অনুমতি দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, যদি কার্যবিধিমালা লঙ্ঘন করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিংবা সে লঙ্ঘনের জন্য কোনো অনুমোদন না নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলেও তিনি সে সিদ্ধান্ত প্রমার্জন করতে পারেন। এর তাৎপর্য হলো, কার্যবিধিমালা তখনই কার্যকর হবে, যখন প্রধানমন্ত্রী চাইবেন। যদি তিনি কার্যবিধিমালার বিচ্যুতি করে সিদ্ধান্ত নিতে চান, সেই ক্ষেত্রে তাঁর অসীম ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরনের ক্ষমতার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে যে আধুনিক রাষ্ট্রে অনেক জরুরি অবস্থা দেখা দেয় এবং সেই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। পক্ষান্তরে এ বিধির সমালোচকেরা বলে থাকেন, যদি এ ধরনের ক্ষমতা দিতে হয়, তাহলে তা প্রধানমন্ত্রীকে না দিয়ে মন্ত্রিসভাকে দেওয়া যেতে পারে।

(২) বাংলাদেশে কতগুলো মন্ত্রণালয় থাকবে এবং তাদের কী দায়িত্ব হবে, এটি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। কার্যবিধিমালার তৃতীয় বিধিতে বলা হয়েছে, '(i) The Prime Minister may, whenever necessary, constitute a Ministry consisting of one or more Divisions.

(ii) The business of the Government shall be distributed among the Ministries/Government and such other officials subordinate to him, as the Prime Minister may determine.'[৯] এই বিধির ফলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ও দায়িত্ব পরিবর্তন দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব। তবে এর দুটি কুফল দেখা গেছে। প্রথমত, মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ও তাদের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু এ ধরনের বিশ্লেষণের কোনো বিধান নেই, সেহেতু প্রধানমন্ত্রী তাঁর ইচ্ছামতো মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা পরিবর্তন করেন ও মন্ত্রণালয়ের কাজ বণ্টন করেন। যদি প্রধানমন্ত্রী শুধু রাজনৈতিক কারণে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে প্রশাসন দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে ঘন ঘন মন্ত্রণালয়, বিভাগের সংখ্যা ও দায়িত্বের পরিবর্তন করা হয়। এতে কাজের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটে। কোনো কোনো দেশে এ ব্যাপারে সংসদ বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে। জাপানে সর্বোচ্চ মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা সংসদ নির্ধারণ করে। ফলে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যত খুশি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ও তার কার্যবণ্টনের ক্ষমতা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব জাতীয় সংসদকে দেওয়া যেতে পারে।

(৩) কার্যবিধিমালার চতুর্থ তফসিল এবং পঞ্চম তফসিলে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে সিদ্ধান্তের জন্য কোন কোন বিষয়ের নথি পেশ করতে হবে, তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। তফসিল ৭-এ এ ছাড়া কোন কোন প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করতে হবে, সে তালিকাও দেওয়া হয়েছে। কার্যবিধিমালার ১৬ বিধিতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে নথি পেশ করতে হবে, সে সম্পর্কেও বিধান দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা অনেক বড়। এরপরও কার্যবিধিমালার তফসিল ৫-এর ২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা কোনো মন্ত্রণালয়কে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য নথি উপস্থাপনের নির্দেশ দিতে পারেন (any other matter which the prime minister from time to time by general or special order specify)।[১০] এর অর্থ হলো, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়কে যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেসব দায়িত্ব থেকে তিনি প্রয়োজনবোধে যেকোনো দায়িত্ব তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিতে পারেন। ফলে মন্ত্রণালয়গুলোর ক্ষমতা সংকুচিত হতে পারে। যদি দেশে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার থাকে, তাহলে এই ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে যেসব মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তন করা প্রয়োজন, সেখানে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

(৪) সংসদীয় গণতন্ত্রের তত্ত্ব অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের সমর্থন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহি নিশ্চিত করেন সংসদ সদস্যরা। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ ধরনের বিধান রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যদের এই ক্ষমতা নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। ৭০ অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে যে 'যদি কোনো দল কর্তৃক মনোনীত সংসদ সদস্য উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন তাহা হইলে উক্ত সংসদ সদস্য তাহার আসন হারাইবেন।' যেহেতু প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় দলের নেতা, সেহেতু কোনো সংসদ সদস্য সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাবেন না। যদি কেউ এ সাহস দেখান, তাহলে তাঁর ওপর ৭০ অনুচ্ছেদের খড়্গ

নেমে আসতে পারে। তাই বাংলাদেশে সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, বরং প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করেন।

(৫) তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা স্বাধীন। কিন্তু বাস্তবে বিচারব্যবস্থার ওপরও প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব রয়েছে। উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর। নিম্ন আদালতে বদলির ক্ষমতাও সরকারের রয়েছে। সবশেষে অতি সম্প্রতি বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদকে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মহামান্য হাইকোর্ট এই বিধানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদি এই বিধান শেষ পর্যন্ত বলবৎ থাকে, তাহলে বিচারপতিদের ওপর প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

বাংলাদেশে শুধু প্রধানমন্ত্রীর আইনগত ক্ষমতাই বাড়েনি, তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। ভারতে জওহরলাল নেহরু যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি নিজেই অনেকাংশে মন্ত্রণালয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সব মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর সচিবালয়ের কর্মকর্তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণে জড়িয়ে পড়েন। এইভাবে আস্তে আস্তে ভারতে সংবিধানের বাইরে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে PMO বা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের আবির্ভাব ঘটে।[১১] বাংলাদেশে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে ছয়জন মন্ত্রীর পদমর্যাদার উপদেষ্টা, দুজন সচিব পদমর্যাদার বিশেষ সহকারী, একজন মুখ্য সচিব ও দুজন সচিব এবং তাঁদের সমর্থনের জন্য উপযুক্ত অতিরিক্ত যুগ্ম ও সহকারী সচিবের সমন্বয়ে এক বিরাট দাপ্তরিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়, এই সচিবালয়ের কর্মকর্তারা মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত মন্ত্রণালয়সমূহের বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। এর ফলে মন্ত্রীদের ক্ষমতা কমে যায়।

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে প্রায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে এ ধরনের বিধান পৃথিবীর অন্যান্য সংসদীয় সরকারেও রয়েছে। মন্ত্রিসভাশাসিত সরকারসমূহ প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রধানমন্ত্রীর পদটি অনেক শক্তিশালী হয়ে গেছে। বাংলাদেশেও এটি ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর গগনচুম্বী ক্ষমতার উৎস শুধু সংবিধানের বিধানই নয়, সংবিধানের কাঠামো ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এই ক্ষমতাকে আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশে চারটি উপাদানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

১. বাংলাদেশ একটি একক রাষ্ট্র। এখানে কোনো প্রাদেশিক সরকার বা স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব নেই। যেমন ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাহী ক্ষমতা তিনটি পর্যায়ে পরিচালিত হয়। প্রথমত, কাউন্টি পর্যায়ে, যেখানে স্বতন্ত্র পুলিশ ব্যবস্থা এবং স্বতন্ত্র বিচারব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয় হলো রাজ্য পর্যায়। রাজ্য পর্যায়েও নির্বাহী বিভাগ রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশি ও বিচারব্যবস্থাও রয়েছে। সবশেষে ফেডারেল পর্যায়েও এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। কাউন্টি সরকার বা রাজ্য সরকার ফেডারেল প্রেসিডেন্ট পরিচালনা করেন না, পরিচালনা করেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কাজেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়। কাউন্টি বা রাজ্য পর্যায়ে পুলিশ বা বিচার বিভাগ ফেডারেল সরকার দ্বারা পরিচালিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে এক পর্যায়ের সরকার। এ অবস্থাতে সব সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। বাংলাদেশের মতো একক সরকার যুক্তরাজ্যে রয়েছে। তবে যুক্তরাজ্যের বর্তমান শাসনব্যবস্থা দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। যুক্তরাজ্যে যা সম্ভব, তা বাংলাদেশে সম্ভব নয়। ফলে এখানে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়ে গেছে। ভারত কিংবা পাকিস্তানেও এ ধরনের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেনি।

২. নির্বাহী বিভাগের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করতে পারে রাজনৈতিক দলসমূহ। পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার এবং রাজনৈতিক দলের ভিন্ন অস্তিত্ব রয়েছে। রাজনৈতিক দল তার গঠনতন্ত্র অনুসারে কাজ করে ও সরকার সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাত্ত্বিকভাবে রাজনৈতিক দল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে; কারণ, সংসদ সদস্যরা রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হন। সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে রাজনৈতিক দল তা পরিবর্তন করতে সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে। এই নীতি অনুসারে আওয়ামী লীগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন সরকার প্রধান এবং দলের প্রধান হিসেবে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হতো না। একজন ব্যক্তি সরকারপ্রধান হতেন এবং অন্য একজন ব্যক্তিকে দলের প্রধান করা হতো। ফলে তাঁরা একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। কিন্তু বাংলাদেশের সব প্রধান রাজনৈতিক দলে সরকারপ্রধান এবং সংসদে দলের প্রধান একই ব্যক্তি হন। ফলে দলের ভেতরে গণতন্ত্রের কোনো চর্চা হয় না, দল অন্ধভাবে সরকারকে সমর্থন করে। অন্যদিকে সরকারও দলের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এর ফলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শুধু সরকারই নিয়ন্ত্রণ করেন না, তিনি একসঙ্গে রাজনৈতিক দলও পরিচালনা করেন।

৩. বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে বংশভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্মোহনী শক্তির অধিকারী (Charismatic) নেতার বংশধরেরা দলের প্রধানরূপে নির্বাচিত হন। বংশানুক্রমে এ ধরনের নেতাদের দলের অন্য নেতাদের চেয়ে অনেক শ্রেয় ও ক্ষমতাবান মনে করা হয়। ফলে এ ধরনের নেতাদের পক্ষে আইনি ক্ষমতার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব।

৪. বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার চালু রয়েছে। এই সরকারপ্রধানের ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির চেয়েও অনেক বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করার সময় বিধান করা হয় যে কেউ দুই মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। ফলে সর্বাধিক দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি শক্তিশালী থাকলেও তাঁকে নতুন করে নির্বাচিত প্রার্থীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। একই ব্যক্তি যতবার খুশি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারবেন। ফলে রাজনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যায়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারও সম্ভব হতে পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সংবিধানের কাঠামো ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ফলে আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। প্রধানমন্ত্রী এই ক্ষমতা ব্যবহার করবেন কি করবেন না, এটি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু কেউ এ ক্ষমতা ব্যবহার করলে তাঁকে প্রতিরোধ করার কোনো সাংবিধানিক উপায় নেই। ফলে বাংলাদেশে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও সংসদের মধ্যে ত্রিমাত্রিক ক্ষমতা বিভাজন (Separation of power) ব্যবস্থা কাজ করছে না। এ ধরনের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের জন্য একটি বড় হুমকি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন যথার্থই বলেছেন :

> An elective despotism was not the government we fought for; but one in which the powers of government should be so divided and balanced among the several bodies of magistracy as that no one could transcend their legal limits without being effectually checked and restrained by the others.

বাংলাদেশে শুধু প্রধানমন্ত্রীর পদই শক্তিশালী হচ্ছে না, এখানে ক্ষমতার বিভাজন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ বিষয়ে তাই সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

## ৬.৪ উপসংহার

সারা পৃথিবীতেই নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। উপরন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো Presidentialize বা রাষ্ট্রপতিশাসিত করা হচ্ছে। নির্বাচনে জনগণ শুধু সংসদ সদস্য নির্বাচন করেন না, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতে চান। কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটাই নির্বাচনের একটি মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে।

ওপরের আলোচনা থেকে দুটি প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিভাজন নিয়ে বাংলাদেশে সিভিল সমাজে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করা হয়েছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি দেখতে জগন্নাথের মতোই রূপবান, কিন্তু বাস্তবে তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই, তিনি ঠুঁটো। তাঁরা বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকতে হবে। এ ধরনের ক্ষমতা তাত্ত্বিক দিক থেকে ব্রিটেনের রাজার রয়েছে। তবে যেহেতু ব্রিটেনের কোনো সংবিধান নেই, সেহেতু রাজার ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো আইন নেই। কিন্তু বাস্তবে রাজা এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। এই তত্ত্ব স্বীকার করলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, যা রাষ্ট্রের কার্যকারিতা হ্রাস করবে। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই তাই প্রধানমন্ত্রীর হাতেই বেশির ভাগ ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সমান্তরাল শাসন অবাস্তব বলে মনে করা হয়। তাই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খুব বেশি বাড়ানো রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হবে না।

দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খুব একটা কমবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কিছু বিষয়ে তাঁর অবদান রাখতে পারবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানোর ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। তবে যদি পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত না হয়, তবে রাষ্ট্রপতি সেই সুপারিশ অনুমোদন করবেন। হয়তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থেকে যাবে। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে

প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য যে পাকিস্তানের সংবিধানে অনুরূপ একটি বিধান রয়েছে।

২. সংবিধানে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক পদ (যথা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল) এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ (যথা দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থার চেয়ারম্যান ও সদস্য) নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি কোনো মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করলে প্রধানমন্ত্রী নতুন মনোনয়ন দেবেন। তবে এই সব পদে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেই নিয়োগ দিতে হবে। বাইরে থেকে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে না।

৩. ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদ সুপারিশ করতে পারে, কিন্তু সে সুপারিশ বাধ্যতামূলক হবে না। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে এ ধরনের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন।

৪. প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের অপসারণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ রাষ্ট্রপতির জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। রাষ্ট্রপতি অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণ না করলে প্রধানমন্ত্রী অন্য যেকোনো শাস্তির প্রস্তাব করবেন এবং তা রাষ্ট্রপতির জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৫. কার্যবিধিমালায় প্রধানমন্ত্রীকে খুব বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা অন্তত দুটি ক্ষেত্রে হ্রাস করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সুপারিশকৃত কার্যবিধিমালা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে জারি করা হয়। এতে সংসদের কোনো ভূমিকা নেই। কার্যবিধিমালা বিধির মাধ্যমে না করে আইনের মাধ্যমে জারি করার বিধান করা যেতে পারে। এর ফলে এই বিধিমালা প্রণয়নে সংসদের ভূমিকা থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী যেকোনো সময় নতুন মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। অথবা বর্তমানে চালু যেকোনো বিভাগ বা মন্ত্রণালয় তুলে দিতে পারেন। এ কাজটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে সংসদের অনুমোদনের বিধান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার দুটি বড় উৎস রয়েছে। একটি উৎস হলো প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে থাকতে পারেন। এর

ফলে প্রধানমন্ত্রীর কাজে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিতে পারে। দলীয় প্রধান হিসেবে তাঁর দলের সদস্যদের প্রতি একটা আনুগত্য রয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যখন শপথ নেন, তখন তাঁকে ওয়াদা করতে হয় যে তিনি অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। দলীয় প্রধানের পক্ষে এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং, সংবিধানে বিধান করা যেতে পারে যে কেউ দলের প্রধান অথবা সেক্রেটারি জেনারেল হলে তিনি প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রী পদের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

বাংলাদেশে বর্তমানে চালু এক স্তরবিশিষ্ট সরকার-ব্যবস্থা (Unitary) পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি বড় কারণ হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা এক স্তরবিশিষ্ট। এখানে কোনো প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকার নেই। এখানে পুলিশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী থাকে। এরা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সব সময় নিযুক্ত হয় না। অবশ্য বিলাতেও এক স্তরবিশিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা। কিন্তু বিলাতে যা সম্ভব, বাংলাদেশে সেটা সম্ভব নয়। এর কারণ হলো, বিলাতে যাঁরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে কাজ করেন, তাঁরা আইনের প্রতি অনুগত এবং সাধারণত কোনো বেআইনি আদেশ পালন করবেন না। এরপরও বিলাতে স্থানীয় সরকারের দাবি জোরদার হচ্ছে। অল্প কয়েক দিন আগে স্কটল্যান্ডে প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোটার স্বাধীনতা দাবি করেছেন। কাজেই সব পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর সর্বব্যাপী ক্ষমতা সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অতি সংকুচিত করা হয়েছে। বিলাতেও রাজার ক্ষমতা সংকুচিত, কিন্তু সেটা আইন অনুসারে নয়, সেটা নজিরের ভিত্তিতে এবং এ অবস্থায় পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিকে বিলাতের রাজার মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে অনেক সময় লাগবে। শুধু সংবিধান সংশোধন করে কাজ হবে না।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা বেড়েছে এবং এ বিভাগের প্রধান ক্রমশ অধিকতর শক্তিধর হচ্ছে। বাংলাদেশেও একই প্রবণতা দেখা দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি বড় তফাত রয়েছে। বাংলাদেশে শুধু প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়নি, সংবিধানের কাঠামো এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে অনেক বাড়িয়েছে। এক স্তরবিশিষ্ট সরকারে দেশের সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রয়েছে। সর্বপর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সংসদের; কিন্তু বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদেরই নিয়ন্ত্রণ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিচারব্যবস্থার ওপরও তাঁর পক্ষে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার

করা সম্ভব। ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নেতা প্রধানমন্ত্রী। প্রতিটি বড় দলের প্রধানেরা দলের প্রতিষ্ঠাতাদের বংশ হিসেবে সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ক্ষমতার বিভাজন অস্বীকার করে গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। গণতন্ত্রের স্বার্থে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক ও জরুরি। অন্যথায় বাংলাদেশে নির্বাহী বিভাগ নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। শুধু আইন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। দেশে গণতান্ত্রিক রীতিও গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা শুধু সংবিধানের ওপর নির্ভরশীল নয়। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অভিভাবক। যখন এমন সংকট দেখা দেবে, যার কোনো সাংবিধানিক সমাধান নেই, তখন রাষ্ট্রপতিকেই তার সমাধান দিতে হবে। রাষ্ট্রপতিকে তাই এমন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে, যাতে রাষ্ট্রের দুঃসময়ে তিনি যে বিধান দেন, দলমত-নির্বিশেষে সবাই তা বিনা তর্কে মেনে নেয়।

## পাদটীকা


১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। ১৯৭৫। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।* ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২৬

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। মে ২০০০। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।* ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫

৩. Government of India. *Constitution of the Republic of India.* New Delhi.

৪. National Assembly of Pakistan. 2012. *Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.* Islamabad.

৫. Arthur King. 1994 'Chief Executives in Western Europe' in I. Budge and D Mckay' (eds.) *Developing Democracy.* London: Sage.

৬. Eoin O'Malley 2007 'The Power of Prime Ministers: Results of an Expert Survey'. *International Political Science Review.* Vol. 26. No. 1, 7-77

৭. Walter Bagehot 2014 (Reprint). *The English Constitution.* (ed.) Miles Taylor. London: Oxford University Press

৮. Cabinet Division, Gov:.of the People's Republic of Bangladesh. 2014. *Rules of Byusiness.* Dhaka.

৯. Cabinet Division. 2014. প্রাগুক্ত।

১০. Cabinet Division. 2014. প্রাগুক্ত।

১১. Karuna Singh. 2007. 'Prime Minister Office A Critical Analysis' *The Indian Journal of Political Science.* Vol 68. No. 3, 629-640

৭

# জাতীয় সংসদ : পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সমরূপ অনুকরণ (Isomorphaic mimicry)

## ৭.১ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সমরূপ অনুকরণ

জীববিজ্ঞানে সমরূপ অনুকরণ (Isomorphaic mimicry) নামে একটি ধারণা (concept) প্রচলিত আছে।[১] এই ধারণার বক্তব্য হলো যে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অনেক জীবজন্তু এমনভাবে বিবর্তিত হয়, যাতে তাদের হিংস্র বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে আদৌ হিংস্রতা নেই। একধরনের সাপ রয়েছে, যাদের মধ্যে কোনো বিষ নেই। কিন্তু এ ধরনের সাপকে সবাই আক্রমণ করে। সুতরাং সেই সাপকে বেঁচে থাকার জন্য নীল রং ধারণ করতে হয়। সাপের রং দেখে সবাই একে প্রচণ্ড বিষধর সাপ মনে করে এড়িয়ে যায় এবং এর ফলে এরা বেঁচে যায়। জীববিজ্ঞানের এ ধারণাকে সমাজবিজ্ঞানে প্রয়োগ করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিটচেট ও তাঁর সহকর্মীরা।[২] তাঁর বক্তব্য হলো যে উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নত দেশসমূহ থেকে অনেক প্রতিষ্ঠান ধার করেছে, যারা দেখতে উন্নত দেশসমূহের প্রতিষ্ঠানের মতো, কিন্তু আদতে তাদের কোনো কার্যকারিতা নেই। অনেক দেশে পুলিশ বাহিনী রয়েছে, যাদের সাজসজ্জা, বন্দুক, অবকাঠামো—সবই উন্নত দেশের পুলিশের মতো অথচ কার্যক্ষেত্রে এরা দুর্বৃত্ত। পৃথিবীর অনেক দেশেই নির্বাচিত জাতীয় সংসদ রয়েছে যাকে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। বাস্তবে অনেক দেশেই সংসদ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সমরূপ অনুকরণ : এখানে নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন, সংবিধানে তাঁদের ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে। কিন্তু আসলে এসব ক্ষমতার কোনোটাই তাঁরা প্রয়োগ করতে পারেন না, বা করছেন না। সমাজজীবনে সমরূপ অনুকরণের তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে :

ক. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (forms) এবং কার্যাবলির (functions) সমান্তরাল ভুবন। অনেক সময় মনে করা হয় যে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি প্রতিষ্ঠানের কাঠামোকে অনুসরণ করে। অনেক ক্ষেত্রেই কার্যাবলি ও কাঠামোর মধ্যে সুস্পষ্ট যোগসূত্র লক্ষ করা যায় না। প্রিটচেট ও উইজার যথার্থই লিখেছেন, 'It is easier to create an organization that looks like police force— with all the *de jure* forms, organizational charts, ranks, uniforms, buildings, weapons— than it is to create an organization with the *de facto* function of enforcing the law.'[৩]

খ. ক্ষমতার বেশি দায়িত্ব গ্রহণ (premature load-bearing)। অনেক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে উন্নত দেশসমূহের কার্যরত প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা নেই। তবু উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ক্ষমতার বেশি দায়িত্ব নেয় এবং তা প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়। এর ফলে বাস্তবতা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ফারাক তৈরি হয়।

গ. অযোগ্যতার ফাঁদ (Capability Trap) ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। যখন উন্নয়নশীল দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানের উন্নত দেশসমূহে কার্যরত প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা নেই অথচ সেসব দেশের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তখন বিদেশি প্রতিষ্ঠানের অনুকরণ করে প্রতিষ্ঠানের কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। অথচ সে কাঠামোর পক্ষে উক্ত দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। বস্তুত ত্রুটিপূর্ণ পুরোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়া সোজা।

উন্নত দেশসমূহের অনুকরণে উন্নয়নশীল দেশসমূহে সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাত্ত্বিক দিক থেকে সংসদের চারটি বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিভাজন (Separation of power), যার মূলে রয়েছে একটি স্বাধীন সংসদ। যদি সংসদ স্বাধীনভাবে কাজ করে, তবে ক্ষমতার বিভাজন রক্ষা করা সম্ভব। আর যদি সংসদ নির্বাহী বিভাগের আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নির্বাচিত স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, সংসদের দায়িত্ব হলো সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা। সংসদ হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি। যেহেতু প্রাচীন গ্রিসের তুলনায় আধুনিক রাষ্ট্রে জনসংখ্যা বিশাল, সেহেতু এখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত শক্ত। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে এখানে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় গণপ্রতিনিধিরা প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জনগণের ভোটারদের প্রতিনিধি। তাঁর কাজ হলো সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে কি না, তার তদারক করা। যদি সরকার ব্যর্থ হয়, তবে তাঁর দায়িত্ব হলো সে

সরকারকে অনাস্থা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া। পক্ষান্তরে আজকের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে যে গণপ্রতিনিধিরা দলীয় রাজনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সরকার সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত মূল্যায়নের কোনো প্রভাব শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় না। সরকার থাকবে কি থাকবে না, সেটা গণপ্রতিনিধিরা নির্ধারণ করেন না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় রাজনৈতিক দল। পক্ষান্তরে কে গণপ্রতিনিধি থাকবেন বা থাকবেন না, সেটাও নির্ধারণ করে রাজনৈতিক দল। তাই যেসব রাষ্ট্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা অত্যন্ত সংকীর্ণ, সেসব রাষ্ট্রকে সমরূপ অনুকরণ গণ্য করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, সংসদের দায়িত্ব হচ্ছে আইন প্রণয়ন ও অনুমোদন। দেশে কোনো নতুন আইন প্রবর্তন করতে হলে সংসদের অনুমোদন লাগে। প্রচলিত আইন বাতিল ও সংশোধনের জন্যও সংসদের অনুমোদন লাগে। আইন প্রণয়নের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হলে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই আইন প্রণয়ন ও অনুমোদনের এই দায়িত্ব সংসদ পালন করে থাকে।

চতুর্থত, সরকারের আয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সংসদের একটি বড় দায়িত্ব। পৃথিবীর অনেক দেশেই সংসদীয় গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে 'জনপ্রতিনিধিদের অনুমোদন ছাড়া কোনো কর নয়' (No taxation without representation) এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য। পৃথিবীর সব দেশেই সরকারের বাজেট অনুমোদনের ক্ষমতা সংসদের হাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সংসদ সদস্যদের বাজেট অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে কোনো ভূমিকা নেই। এ ধরনের পরিস্থিতিকেও সমরূপ অনুকরণ গণ্য করা যেতে পারে।

উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে জাতীয় সংসদের দায়িত্ব ও ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে সংসদের পক্ষে সব সময় চারটি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো দায়িত্ব আংশিকভাবে প্রতিপালিত হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে কোনো দায়িত্বই পালন করা হয় না। সংসদ পৃথিবীর প্রায় সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই আছে। নির্বাচিত জাতীয় সংসদ থাকলেই চলবে না, সংসদকে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো, জাতীয় সংসদের লক্ষ্য এবং অর্জনের তুলনা করে বাংলাদেশে সংসদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ পেশ করা। প্রবন্ধটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে জাতীয় সংসদের লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশেই সংসদের ধারণা উন্নত দেশসমূহ থেকে ধার করা হয়েছে। এর ফলে অনেক উন্নয়নশীল দেশেই সংসদ উন্নত দেশের সমরূপ অনুকরণ। কিন্তু কার্যকারিতায় এরা নিষ্ফল। তাই এ

প্রসঙ্গে প্রথমেই সমরূপ অনুকরণ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ তার লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে, সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে জাতীয় সংসদ তার আইনগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। তবে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেও সংসদ সদস্যরা তাঁদের নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরেও ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। এর ফলে সংসদের সাংবিধানিক ভূমিকা এবং বাস্তব ভূমিকার মধ্যে ফারাক দেখা দিয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে তাই সংসদ সদস্যরা তাঁদের মূল দায়িত্বের বাইরে যে কাজ করছেন, তার বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে আগের তিনটি খণ্ডের বিশ্লেষণের আলোকে সংসদকে আরও কার্যকর ও প্রাণবন্ত করার জন্য কী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## ৭.২ বাংলাদেশে সংসদের ভূমিকার মূল্যায়ন

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিভিন্ন আকারে সংসদ রয়েছে। সংসদের প্রধানত চারটি দায়িত্ব রয়েছে :

- নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক
- আইন প্রণয়ন
- বাজেট অনুমোদন ও সরকারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
- জনগণের দাবিদাওয়া পূরণ।

### নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক

নির্বাহী বিভাগের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকের মাত্রা দেশভেদে ভিন্ন হয়। সংসদের এ ধরনের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হয় সংসদীয় গণতন্ত্রে। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাহী বিভাগের প্রধানের নিয়োগ এবং পরিবর্তনের ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ রয়েছে। সংবিধানে এই সংসদের ক্ষমতাও চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু নির্বাহী বিভাগের প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের কোনো ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের ক্ষমতাও সংসদকে দেওয়া হয়নি। শুধু অভিসংশনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অপসারণ এবং অভিসংশনের মধ্যে তফাত রয়েছে। কেউ যদি যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর কাজ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁকে অপসারণ করা যাবে। কিন্তু অভিসংশনের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শুধু

শারীরিক অসামর্থ্য, ফৌজদারি অপরাধ ও সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে অভিসংশন করা যেতে পারে, অন্যথায় নয়। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংসদ আছে কিন্তু সংসদীয় সরকার নেই। অন্যদিকে ভারতে নির্বাহী বিভাগের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতে হয় এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদ হারান। সংসদের ওপর প্রধানমন্ত্রীর এই নির্ভরশীলতার ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়। তাঁকে মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্য যাঁরা তাঁর মতো সংসদ সদস্য, তাঁদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে সংসদে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, সেটা ব্যক্তিগত নয়, গোষ্ঠীভিত্তিক বা Collegial। তাই প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হলেও তাঁকে সমকক্ষদের নেতা বা Primus inter pares বলা হয়ে থাকে। বিলাতে এই সংসদীয় গণতন্ত্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। এ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাও অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী শুধু সমকক্ষদের নেতাই থাকেন না, তাঁর ক্ষমতার পরিধি অনেক বেড়ে যায়। উপরন্তু নির্বাচনের সময় ভোটাররা শুধু সংসদ সদস্যই নির্বাচিত করেন না, কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, সে বিষয়েও তাঁরা আগ্রহী। কাজেই সংসদ সদস্যদের দ্বারা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

ভোটের আগেই রাজনৈতিক দলকে প্রধানমন্ত্রী পদে তাঁদের মনোনীত প্রার্থীকে তুলে ধরতে হয়। এর ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সংসদীয় গণতন্ত্রে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। যদিও সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচন করেন ও অপসারণ করার ক্ষমতা রাখেন, তবু বাস্তবে এ ক্ষমতা অনেকাংশে জনগণের কাছে চলে গেছে। এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর পদ শক্তিশালী হয়েছে। তবু বেশির ভাগ সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে প্রধানমন্ত্রীকে দলের সংসদ সদস্যকে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যবস্থাতেও একটি চিড় ধরেছে। সংসদ সদস্যরা যদিও দলের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচিত হন, তবু পূর্বে তাঁদের দলের ক্রীড়নক হিসেবে গণ্য করা হতো না। এর ফলে সংসদ সদস্যরা সদস্য হিসেবে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের বিবেকের কাছে দায়ী থাকতেন। তাঁদের জন্য দলের আজ্ঞা সর্বত্র প্রতিপালন করার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই ব্যবস্থায় অনেক উন্নয়নশীল দেশে অপব্যবহৃত হয়। সংসদ সদস্যরা নগদ টাকা অথবা অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধার লোভে সরকার পরিবর্তনের জন্য তাঁদের ভোট বিক্রি করা শুরু করেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে শুধু ভোট বিক্রিই হয়নি, সংসদ সদস্যরা সরকার পরিবর্তনের জন্য গুন্ডামি করে সংসদ ভবনে স্পিকার শাহেদ আলীকে হত্যা করেন। এর ফলে সংসদ সদস্যদের অধিকার খর্ব করার প্রশ্ন

ওঠে। সেই স্পিকার হত্যার ঘটনাকে স্মরণ রেখে বাংলাদেশে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিধান করা হয়।

> ৭০(১) কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাহার আসন শূন্য হইবে।
>
> ব্যাখ্যা— যদি কোন সংসদ সদস্য, যে দল তাহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া—
>
> (ক) সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন, অথবা
>
> (খ) সংসদের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।
>
> (২) যদি কোন সময় কোন রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে তাহা হইলে সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবিদার কোন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হইবার সাত দিনের মধ্যে স্পিকার সংসদের কার্যপ্রণালীবিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ সদস্যের সভা আহ্বান করিয়া বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করিবেন এবং সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোন সদস্য অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং সংসদে তাহার আসন শূন্য হইবে।
>
> (৩) যদি কোন ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার পর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।[৪]

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের এই বিধান সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী। সংসদীয় গণতন্ত্রে সব ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হয়ে থাকে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা খর্ব করে সে ক্ষমতা রাজনৈতিক দলের হাতে দেওয়া হয়েছে। যদি দলের কর্মকাণ্ডে কোনো সদস্য অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তাঁর দল থেকে পদত্যাগ করার স্বাধীনতা আছে। এই বিধান অনুসারে দল থেকে পদত্যাগ করলে তিনি সংসদ সদস্যের পদ হারাবেন। শুধু দল থেকে পদত্যাগ নয়, দলের বিপক্ষে কোনো ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার অধিকারও তাঁর নেই। এমনকি সংসদে অনুপস্থিত থাকলে অথবা উপস্থিত থেকে ভোটদানে বিরত থাকলে তাকেও বিপক্ষে ভোট হিসেবে গণ্য করা হবে। ১৯৯১ সালে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় দলের নেতৃত্ব নিয়ে

কোনো প্রশ্ন উঠলে কীভাবে তা নির্ধারণ করা হবে, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত প্রার্থীরা সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে তাঁদেরকেও দলীয় মনোনয়নে নির্বাচিত সাংসদদের যেভাবে আচরণ করতে হয়, একই রকম আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়েছে। তাঁদের পক্ষে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, পক্ষান্তরে সরকারকে সংসদীয় দলের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ফলে বাংলাদেশে সংসদ আছে ঠিকই, কিন্তু সংসদীয় সরকার কতটা আছে, সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাহী বিভাগের হাতে সব কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং সংসদের কার্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

পৃথিবীর বেশির ভাগ সংসদীয় গণতন্ত্রে ৭০ ধারার মতো বিধান নেই। সংসদ সদস্যদের তাঁদের বিবেক অনুসারে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবু সম্প্রতি কোনো কোনো দেশে বাংলাদেশের মতো সংসদ সদস্যদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাদেশের মতো বিধান রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্ব যেভাবে হ্রাস করা হয়েছে, পাকিস্তানে ততটা করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের সংবিধানের ৬৩(এ) অনুচ্ছেদ নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

> 63A. '(i) If a member of a Parliamentary Party composed of a single political party in a House—
>
> (a) resigns from membership of his political party or joins another Parliamentary party; or
>
> (b) votes or abstains from voting in the House contrary to any direction issued by the Parliamentary Party to which he belongs, in relation to-
>
> (i) election of the Prime Minister or the Chief Minister; or
>
> (ii) a vote of confidence or a vote of no-confidence; or
>
> (iii) a Money Bill or a Constitution (Amendment) Bill.[৫]

অর্থাৎ, পাকিস্তানের সংবিধানে সংসদ সদস্যরা তিনটি ক্ষেত্রে দলের নির্দেশ অমান্য করলে তাঁদের সংসদ সদস্য পদ হারাবেন। এ তিনটি ক্ষেত্র হলো : (১) প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে দলের নির্দেশ অনুসারে ভোট না দিলে। (২) আস্থা অথবা অনাস্থা ভোটে দলের নির্দেশ অনুসারে ভোট না দিলে এবং (৩) অর্থবিল ও সংবিধান সংশোধন-সংক্রান্ত বিলের ওপর দলের নির্দেশ অনুসারে ভোট না দিলে। পাকিস্তানের সংবিধান অনুসারে অন্য সব ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের ইচ্ছামতো ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। বাংলাদেশের

সংবিধানে সংসদ সদস্যদের এ ধরনের কোনো স্বাধীনতা নেই। যে দল সংসদ সদস্যকে নির্বাচিত প্রার্থীরূপে মনোনীত করেছে, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করে যদি সাংসদ দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেন অথবা ভোটদানে বিরত থাকেন অথবা বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে। বাংলাদেশে তাই সংসদ সদস্যদের ওপর দলের নির্দেশ সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের কোনো ক্ষেত্রেই তাঁদের বিবেক অনুসারে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এ জন্যই সম্প্রতি সংসদ সদস্যদের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা দিয়ে যে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে, তার আইনগত মর্যাদা নেই বলে বাংলাদেশ হাইকোর্ট একটি রায় দিয়েছেন। হাইকোর্টের বক্তব্য হলো, অভিশংসন একটি বিচারপ্রক্রিয়া এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় বিচারক তাঁর বিবেকের নির্দেশে কাজ করবেন, অন্য কারও নির্দেশে নয়। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে সাংসদেরা দলের নির্দেশে কাজ করতে বাধ্য। কাজেই এই বিচারকদের অভিশংসনের দায়িত্ব সংসদ সদস্যদের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। যদিও বিষয়টি নিয়ে সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে, তবু হাইকোর্টের রায়ে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার একটি বড় দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে।

সংসদ সদস্যদের পক্ষে আইনগতভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করে তাঁদের দল। যেহেতু তিন দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে সরকারপ্রধান এবং দলের প্রধান একই ব্যক্তি, সেহেতু সরকারপ্রধান দলীয় প্রধান হিসেবে তাঁর দলের সংসদ সদস্যদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত। সরকারের সহযোগিতা ছাড়া সংসদ সদস্যরা কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্রের সমর্থন পান না। কাজেই সংসদ সদস্যরা এমনিতেই রাষ্ট্রের সমর্থনের জন্য নির্বাহী বিভাগের মুখাপেক্ষী থাকেন। তারপর দলের নিয়ন্ত্রণ নির্বাহী বিভাগের কুক্ষিগত থাকাতে বস্তুত সংসদ সদস্যদের সরকারের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

সংসদ সদস্যদের দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন করা। সংবিধান অনুসারে সংসদ সদস্যরা দেশের আইন প্রণয়ন করেন এবং সে উদ্দেশ্যে সব বিল সরকার কর্তৃক সংসদে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু সেসব আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যরা কতটা অবদান রাখতে পারেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সারণি-৭.১-এ দশম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার দেখা যাবে।

## সারণি-৭.১
## সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার

| কার্যক্রম | শতকরা হার |
|---|---|
| প্রশ্নোত্তর পর্ব | ১৭% |
| জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ | ১৩% |
| আইন প্রণয়ন | বাজেট ব্যতীত ৬% |
| বাজেট আলোচনা | ৩৬% |
| রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা | ১৬% |
| অনির্ধারিত আলোচনা | ৬% |
| অন্যান্য | ৬% |

উৎস : টিআইবি পার্লামেন্ট ওয়ার্ক ১০ম জাতীয় সংসদ (২৫ অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ১১)

সারণি-৭.১ থেকে দেখা যাচ্ছে, দশম জাতীয় সংসদে সদস্যরা তাঁদের মোট সময়ের মাত্র ৬ শতাংশ সময় বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন আলোচনায় ও প্রণয়নে ব্যয় করেছেন। এখন আইন যেহেতু সংসদীয় কমিটিতে পরীক্ষা করার পর জাতীয় সংসদে আলোচিত হয়, সেহেতু আইনসংক্রান্ত আলোচনা জাতীয় সংসদে কমে যাওয়ার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। তবু আইন প্রণয়নের জন্য মাত্র ৬ শতাংশ সময় প্রদান থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদের ভূমিকা কম। এমন নজিরও রয়েছে, যেখানে সংবিধান সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও প্রায় বিনা আলোচনাতেই পাস হয়ে গেছে। এর একটি বড় কারণ হলো, বেশির ভাগ সংসদেই বিরোধী দল সংসদীয় কার্যক্রমে অংশ নেয় না।

বর্তমান সংসদে আইনগতভাবে বিরোধী দলের উপস্থিতি থাকলেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। এর একটি বড় কারণ হলো, বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী। বেশির ভাগ ব্যবসায়ীর আইন প্রণয়নে দক্ষতা থাকে না এবং এ বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ অনেক কম। সারণি-৭.২-এ বাংলাদেশের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রধান পেশা সম্পর্কে উপাত্ত দেখা যাবে।

সারণি-৭.২ থেকে দেখা যাচ্ছে, গত চার দশকে সংসদে ব্যবসায়ী সাংসদেরা নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করেছেন। প্রথম সংসদে মাত্র ১৮ শতাংশ সদস্যের প্রধান পেশা ছিল ব্যবসা। ৮ম সংসদে এই হার ৫৮ শতাংশে উন্নীত হয়, ৯ম সংসদে এই হার ছিল ৫৭ শতাংশ এবং ১০ম সংসদে এই হার ৫৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

## সারণি-৭.২
## নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রধান পেশা

| নির্বাচিত সংসদের সংখ্যা | আইনজীবী | ব্যবসায়ী | কৃষিজীবী | শিক্ষক |
|---|---|---|---|---|
| ১ম সংসদ | ৩১% | ১৮% | ১১% | ১২% |
| ২য় সংসদ | ২৬% | ২৪% | ১৩% | ৬% |
| ৫ম সংসদ | ১৫% | ৩৮% | ১১% | ৭% |
| ৭ম সংসদ | ১৬% | ৪৩% | ৮% | ৮% |
| ৮ম সংসদ | ১২% | ৫৮% | ৭% | ৮% |
| ৯ম সংসদ | ১৪% | ৫৭% | ৭% | ১% |
| ১০ম সংসদ | ১৩% | ৫৯% | ৫% | ২% |

উৎস : BIGD 2015. The State of Governance in Bangladesh. Dhaka

অন্যদিকে অন্যান্য পেশাজীবীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। প্রথম সংসদে ৩১ শতাংশ সংসদ সদস্যের প্রধান পেশা ছিল আইন। ৮ম শতাংশে এই হার ১২ শতাংশে নেমে আসে। ১০ম সংসদে এই হার ছিল ১৩ শতাংশ। ১ম সংসদে ১২ শতাংশ সদস্য কৃষিজীবী ছিলেন, ১০ম সংসদে কৃষিজীবীদের হার ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ১ম সংসদে ১১ শতাংশ সদস্যের প্রধান পেশা ছিল শিক্ষকতা, ১০ম সংসদে শিক্ষকদের হার ২ শতাংশে নেমে এসেছে। গত চার দশকে নির্বাচিত সাংসদদের পেশা পরিবর্তনের ফলে আইন প্রণয়নে আগ্রহী সাংসদদের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সংসদের তৃতীয় দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের পক্ষে সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা। এই লক্ষ্যে সংসদ সদস্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের প্রশ্ন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীকেও প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংসদে সংসদ সদস্যরা এ সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। তবে সরকারের ওপর এর খুব একটা স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় না। সরকারের তদারকিতে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা রয়েছে। সংসদের কার্যবিধিমালায় সংসদ সদস্যদের সংসদে প্রশ্ন উপস্থাপন করার ও তার জবাব পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সংসদ সদস্যরা এ অধিকার প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ এবং জনগণের অবগতির জন্য তা বিতরণ করার ব্যবস্থা করতে পারেন। এভাবে তাঁরা সরকারের ক্রিয়াকলাপের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেন।

এ ছাড়া প্রতিটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে সংসদীয় কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। এই সংসদীয় কমিটিসমূহ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সব কার্যকলাপ বিবেচনা করতে

পারেন এবং এ সম্পর্কে সংসদের বিবেচনার জন্য সুপারিশ পেশ করতে পারেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কমিটি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল কিন্তু এসব কমিটি ছিল অস্থায়ী এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে এসব কমিটি স্থাপন করা হতো। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী কমিটি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি পৃথিবীর সব দেশেই স্থায়ী কমিটি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি উঠেছে। এর কারণ হলো দুটি। প্রথমত, যেহেতু সংসদ নির্বাচন চার-পাঁচ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়, সেহেতু দেশের শাসন সম্পর্কে জনগণের অভিমত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। যদি সংসদীয় কমিটি সব মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপের ওপর নিয়মিত শুনানির ব্যবস্থা করে, তাহলে সরকারের কার্যকারিতা সম্পর্কে জনমত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বাজেট-ব্যবস্থা ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে যাচ্ছে। এতে জনমত বিবেচনার কোনো সুযোগ থাকে না। কমিটি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সে সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপায় হচ্ছে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের ওপর সংসদের স্থায়ী অথবা স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রতিষ্ঠা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মাধ্যমেই সংসদীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন তাই বলেছেন : It is not far from the truth to say that Congress in session is Congress on public exhibition whilst Congress in its committee rooms is Congress at work.[৬] তবে সংসদীয় ব্যবস্থায় এ ধরনের কমিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতো না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ উদ্দেশ্যে অস্থায়ী কমিটি স্থাপন করা হতো। স্থায়ী কমিটির রেওয়াজ সংসদীয় গণতন্ত্রে ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী কমিটিগুলোর সাফল্যের ফলে এখন সংসদীয় গণতন্ত্রেও স্থায়ী কমিটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিগুলো ছিল : (1) Business Advisory Committee (2) Committee on Private Member's Bills and Resolutions (3) Committee on Petitions (4) Committee on Estimates (5) Committee on Public Undertakings (6) Committee on Government Assurances (7) House Committee (8) Library Committee এবং (9) Standing Committee on rules of Procedure। কিন্তু প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপের তদারক করার জন্য স্থায়ী কমিটি ছিল না। তবে সব মন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটি বা স্থায়ী কমিটি প্রতিষ্ঠার জন্য সিভিল সমাজ থেকে দাবি উত্থাপিত হয় এবং দাতাদের পক্ষ থেকেও এ দাবিকে সমর্থন করা হয়। এর ফলে চতুর্থ সংসদ থেকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি করে কমিটি স্থাপন করা হয়। সারণি-৭.৩-এ বিভিন্ন সংসদে কমিটির সংখ্যা দেখা যাবে।

## সারণি-৭.৩
## বিভিন্ন সংসদে কমিটির সংখ্যা

| সংসদ | সংবিধান কর্তৃক স্থাপিত কমিটি | সংবিধানে ও ৭৬(১)(সি) অনুচ্ছেদবলে স্থাপিত কমিটি | সংবিধানে ও ৭৬(২) অনুচ্ছেদবলে স্থাপিত কমিটি |
|---|---|---|---|
| ১ম সংসদ, ১৯৭৩-৭৫ | ২ | ৯ | ৩ (৩ বিশেষ/ সিলেক্ট কমিটি) |
| ২য় সংসদ, ১৯৭৯-৮২ | ২ | ৯ | ৪০ (৪ বিশেষ/ সিলেক্ট কমিটি) |
| ৩য় সংসদ, ১৯৮৬-৮৮ | - | ৪ | ২ (২ বিশেষ/ সিলেক্ট কমিটি) |
| ৪র্থ সংসদ, ১৯৮৮-৯১ | ২ | ৫ | ৩৭ (২ বিশেষ/ সিলেক্ট কমিটি) |
| ৫ম সংসদ, ১৯৯১-৯৬ | ২ | ৯ | ৪২ (৭ বিশেষ/ সিলেক্ট কমিটি) |
| ৬ষ্ঠ সংসদ, ১৯৯৬-৯৬ | ০ | ০ | ০ |
| ৭ম সংসদ, ১৯৯৬-২০০১ | ২ | ৯ | ৩৭ (২ বিশেষ/ সিলেক্ট কমিটি) |
| ৮ম সংসদ, ২০০১-২০০৬ | ২ | ৯ | ৩৭ (২ বিশেষ/ সিলেক্ট কমিটি) |
| ৯ম সংসদ, ২০০৮ | ২ | ৯ | ৩৮ (১ বিশেষ/ সিলেক্ট কমিটি) |

উৎস : Parliament Secretariat, Bangladesh.

১৯৯১ সালে নির্বাচিত পঞ্চম সংসদ থেকে বাংলাদেশের সংসদে প্রতিটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে গঠিত স্থায়ী কমিটি এবং অন্য কমিটিসমূহ কাজ করছে। বিধি অনুসারে প্রতিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির মাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠান করতে হবে। সারণি-৭.৪-এ সপ্তম থেকে নবম সংসদ পর্যন্ত স্থায়ী কমিটিসমূহের কয়টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে সম্পর্কে উপাত্ত দেওয়া হলো।

সারণি-৭.৪ থেকে দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ স্থায়ী কমিটি বছরে কমপক্ষে ১২টি সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত নবম সংসদে ও সপ্তম সংসদে ১৭.১ শতাংশ স্থায়ী কমিটির গড়ে বছরে ১২টি বা তার চেয়ে বেশি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টম সংসদে এই হার ১১.১ শতাংশে নেমে আসে এবং নবম সংসদে এই হার ছিল ১২.৫ শতাংশ। অবশ্য গড়ে ৯ থেকে ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়, এ ধরনের স্থায়ী কমিটির হার সম্প্রতি বেড়েছে। পঞ্চম সংসদে এই ধরনের স্থায়ী কমিটির হার ছিল ১৭.১ শতাংশ। নবম সংসদে এই হার ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবু সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে যে কমিটির সভা অনুষ্ঠানে সদস্যদের খুব একটা আগ্রহ নেই। নবম সংসদে প্রায় ৪৭.৫ শতাংশ স্থায়ী কমিটিতে চার থেকে পাঁচটির

## সারণি-৭.৪
## স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার সংখ্যা ১৯৯২-২০০৯

| সংসদ | বছরে ১২ বা তদূর্ধ্ব সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত | ৯-১১ সভা অনুষ্ঠিত | ৬-৮ সভা অনুষ্ঠিত | ৪-৫ সভা অনুষ্ঠিত | ৪-এর কম সভা অনুষ্ঠিত | তথ্য পাওয়া যায়নি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পঞ্চম সংসদ (১৯৯১) | ১৭.১ | ১৭.১ | ২৫.৭ | ৮.৬ | ০ | ৩১.৪ |
| সপ্তম সংসদ (১৯৯৬) | ১৭.১ | ২৫.৭ | ৩৪.৩ | ১৪.৩ | ২.৯ | ৫.৭ |
| অষ্টম সংসদ (২০০১) | ১১.১ | ২৫ | ৩০.৬ | ২৫ | ৫.৬ | ২.৭ |
| নবম সংসদ (২০০৮) | ১২.৫ | ৪০ | ৩৫ | ২.৫ | ১০ | ০ |

উৎস : Ahmed, A. M. 2013. The Data Handbook of Bangladesh Parliament. Dhaka: BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University.

কম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশি দাতাদের খুশি করার জন্য সংসদে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) গঠন করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধী দল থেকেও কমিটির সভাপতি মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং মন্ত্রী ছাড়া অন্য সংসদ সদস্যদের সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০১১ সালে পরিচালিত একটি মূল্যায়নে স্থায়ী কমিটির নিম্নলিখিত দুর্বলতাগুলো প্রকাশ পায়।[৭]

- **স্বার্থের সংঘাত :** গণমাধ্যমে এমন প্রচুর অভিযোগ করা হয়েছে যে যেখানে সংসদ সদস্যদের স্বার্থের হানি ঘটে, সেখানেই তাঁরা শুনানির উদ্যোগ নেন। এতে জনগণ অনেক ক্ষেত্রেই উপকৃত হচ্ছে না।[৮]
- **আইন প্রণয়নের কাজে সংসদ সদস্যদের অনীহা :** ২০১১ সালে দেখা যায় যে নির্বাচিত সংসদ প্রথম ২০ মাসে ১১৩টি বিল পাস করে। এর মধ্যে ৪০টি বিল ৫ মিনিটের কম সময়ে পাস হয়ে যায়। অবশ্য এর একটি বড় কারণ ছিল সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপস্থিতি।
- **স্থায়ী কমিটিগুলোর অর্জনে ব্যর্থতা :** স্থায়ী কমিটিতে অনেক শুনানি হয় কিন্তু সুস্পষ্ট সুপারিশ আসে না। অষ্টম সংসদে Committee on Estimates-এর সব সভায় মিলে ১২০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ৭৩টি (৬০.৮ শতাংশ) সিদ্ধান্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রতিবেদন চাওয়া হয়। ১৯টিতে (১৫.৯ শতাংশ) কমিটি নিজস্ব কার্যকলাপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। ১০টি

সিদ্ধান্তে (৮.৩ শতাংশ) সাব-কমিটি গঠন করা হয়। মাত্র ১৮টি সিদ্ধান্তে (১৫ শতাংশ) মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করা হয়। এই ১৮টি সুপারিশের মধ্যে ১১টি সুপারিশে মন্ত্রণালয়কে প্রশাসনিক ব্যবস্থা (যথা অর্থ ছাড় করা বা পদ সৃষ্টি করা) নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। ৪টি সিদ্ধান্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। মাত্র ৩টি সিদ্ধান্ত ছিল নীতিনির্ধারণ-সংক্রান্ত, অর্থাৎ ৫ বছর ধরে কমিটি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ৩টি সিদ্ধান্ত ছিল নীতিনির্ধারণমূলক। আর এই ৩টি সিদ্ধান্তের একটিও বাস্তবায়িত হয়নি।

- **স্থায়ী কমিটির ভূমিকা :** স্থায়ী কমিটির ভূমিকা বিষয়ে যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, সেখানেও জটিলতা রয়েছে। এর ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলের পক্ষ থেকে স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা ইতিমধ্যে অনেক গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিরগুলোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পরিবীক্ষণও করা হয় না।

সংসদ সদস্যদের চতুর্থ দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের বাজেট অনুমোদন করা এবং সরকারের আয়-ব্যয়ের সঠিক পরিচালনা নিশ্চিত করা। এই দায়িত্ব 'প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কোনো করারোপ করা চলবে না' (No taxation without representation) নীতির বাস্তবায়ন। বাজেটের মাধ্যমে সংসদ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু সংসদের অনুমোদন ছাড়া অথবা নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত খরচ করলে বাজেটের কোনো শৃঙ্খলা থাকে না। এই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরীক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এই নিরীক্ষার তদারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংসদকে। সরকারি হিসাব কমিটি (Public Accouncs Committee) এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাত্ত্বিক দিক থেকে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংসদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এ ব্যাপারে সংসদের প্রায় কোনো ক্ষমতা নেই বললেই চলে। সংসদে বাজেট প্রণয়ন করে সরকার এবং সংসদ সদস্যরা এ বাজেটে বিচার-বিবেচনাহীন অনুমোদন (Rubber-stamp) প্রদান করেন। সংসদ সদস্যরা বাজেট প্রস্তাব 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা বাজেট সংশোধন করতে পারেন না। তাঁরা নতুন কোনো ব্যয়ের জন্য অনুমোদন (সেগুলো যদি অত্যন্ত ছোটও হয়, তবু) প্রদান করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা তাঁদের দল কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেটে 'না' বলতে পারেন না। যদি প্রস্তাবিত বাজেটের বিরুদ্ধে 'না' ভোট দেন, তাহলে তাঁরা দলের সংসদ সদস্য পদ হারাবেন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বাজেট আলোচনার ওপর একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। এই সমীক্ষা থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো বেরিয়ে এসেছে।[৯]

১. বাজেট আলোচনার জন্য সংসদ সদস্যদের যে সময় দেওয়া হয়ে থাকে, তা অত্যন্ত অপ্রতুল। সারণি-৭.৫-এ ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের বাজেট আলোচনার জন্য সর্বোচ্চ সময় দেখা যাবে।

**সারণি-৭.৫**

**বাংলাদেশে বাজেট উপস্থাপনার তারিখ, ১৯৯৭-২০০৭**

| অর্থবছর | বাজেট উপস্থাপনার তারিখ | আলোচনার জন্য সর্বোচ্চ সময় (দিন) |
|---|---|---|
| ১৯৯৭-৯৮ | ১২-৬-১৯৯৭ | ১৮ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ১১-৬-১৯৯৮ | ১৯ |
| ১৯৯৯-২০০০ | ১০-৬-১৯৯৯ | ২০ |
| ২০০০-০১ | ৮-৬-২০০০ | ২২ |
| ২০০১-০২ | ৭-৬-২০০১ | ২৩ |
| ২০০২-০৩ | ৬-৬-২০০২ | ২৪ |
| ২০০৩-০৪ | ১২-৬-২০০৩ | ১৮ |
| ২০০৪-০৫ | ১০-৬-২০০৪ | ২০ |
| ২০০৫-০৬ | ৯-৬-২০০৫ | ২১ |
| ২০০৬-০৭ | ৮-৬-২০০৬ | ২২ |

উৎস : অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তব্য, ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০৬-০৭

সারণি-৭.৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০৬-০৭ সাল পর্যন্ত বাজেটের ওপর বিশদ আলোচনা এবং ভোটদানের জন্য সংসদকে ১৮ দিন থেকে ২৪ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। গড়পড়তা সংসদকে ২০.৭ দিন সময় দেওয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে সংসদকে বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা করতে হয়। সম্পূরক বাজেট আলোচনা ও অনুমোদন করতে হয় এবং পরবর্তী অর্থবছরের ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্টকরণ বিল পাস করতে হয়। উপরন্তু কর-সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে নতুন অর্থ আইন পাস করতে হয়। এ ধরনের কাজ এত অল্প সময়ের মধ্যে সুচারুরূপে করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে ধরেই নেওয়া হয় যে বাজেট অনুমোদন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ামাত্র এবং এই আনুষ্ঠানিকতার জন্য বেশি সময় দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

২. সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, যদিও বাজেট আলোচনায় আরও বেশি সময় বরাদ্দের জন্য ওকালতি করার পক্ষে যুক্তি আছে, বাস্তবে সংসদ সদস্যরা তাঁদের জন্য বরাদ্দ অপ্রতুল সময়টুকুও ব্যবহার করেন না। (সারণি-৭.৬)

## সারণি-৭.৬
## বাজেট আলোচনায় বছরভিত্তিক মোট সময়

| সাল | মোট বাজেট আলোচনা (ঘণ্টায়) |
|---|---|
| ১৯৯৬ | ৪২.২৫ |
| ১৯৯৭ | ৪৭.৪৫ |
| ১৯৯৮ | ২১.২৮ |
| ১৯৯৯ | ৪৫.৩০ |
| ২০০০ | ৩৩.৬৬ |
| ২০০১ | ২৭.১১ |
| ২০০২ | ২৯.৮৮ |
| ২০০৩ | ৩৬.২৮ |
| ২০০৪ | ৩৯.৭৫ |
| ২০০৫ | ৩৫.১৮ |
| ২০০৬ | ৩০.০৮ |
| গড় | ৩৫.১০ |

উৎস : সংসদের কার্যনির্বাহী প্রতিবেদনসমূহ

যদি সদস্যরা বাজেট আলোচনায় গড়ে প্রতি সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা (৫ কর্মদিবসের জন্য প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করে) সময় কাজে লাগাতেন, তাহলে বাজেট আলোচনায় তাঁরা গড়ে ৬০ ঘণ্টা সময় দিতে পারতেন। কিন্তু প্রতি বাজেট আলোচনার জন্য গড় সময় ছিল ৩৫.১ ঘণ্টা। এ তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসদ সদস্যরা বক্তব্য প্রদানের তাঁদের বরাদ্দ সময়ের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ ব্যবহার করেননি। এর একটি কারণ হতে পারে যে সংসদ সদস্যদের বক্তব্য দেওয়ার কোনো আগ্রহ ছিল না। সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা হয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০৬-০৭ সময়কালে সম্পূরক বাজেটের ওপর গড়ে মাত্র ৪.১৬ ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। সর্বনিম্ন আলোচনার সময় ছিল ১ বছর ২.২৫ ঘণ্টা। বাজেট তৈরিতে দুর্বলতার জন্য সম্পূরক বাজেট ছোটখাটো সংশোধনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রায়ই এতে মূল হিসাবের আমূল পরিবর্তন করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূল বাজেট হচ্ছে শুধু একটি মুখোশ আর সম্পূরক বাজেট হচ্ছে প্রকৃত বাজেট। অথচ সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনার জন্য যে সময় বরাদ্দ করা হয়, সে সময়ে কোনো অর্থবহ আলোচনা করা সম্ভব নয়।

৩. পৃথিবীর অন্যান্য সংসদীয় গণতন্ত্রে বাজেটের অর্থবহ আলোচনার জন্য দুটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রথমত, সংসদের সব বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের ওপর

যেসব স্ট্যান্ডিং কমিটি বা স্থায়ী কমিটি রয়েছে, সেখানে বাজেট আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশে সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুসারে সংসদের বাইরে কোনো স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইংল্যান্ড, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে যদি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বাজেট আলোচনা করা যায়, তাহলে বাংলাদেশে তা না করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। দ্বিতীয়ত, সংসদ সদস্যদের বাজেট আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় না। বাংলাদেশে সংসদ সদস্যরা চাইলে এ সময় দেওয়া মোটেও কষ্টকর হবে না।

শুধু যে বাজেট প্রণয়নের ওপর সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ নেই, তা নয়। সরকারের খরচের ওপরও সংসদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষীণ। বেশির ভাগ সময়ই নির্বাচিত সংসদ না থাকায় বাংলাদেশে সরকারি হিসাব কমিটি কাজ করেনি, দ্বিতীয়ত, মান্ধাতার আমলের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ফলে এসব প্রতিবেদনের নিষ্পত্তিও সহজসাধ্য নয়। এর ফলে সরকারি হিসাব কমিটিতে অনিষ্পত্তিকৃত আপত্তি ও অনিয়মিত ব্যয় বিরাট আকার ধারণ করেছে। ২০১৬ সালের ২৩ জুন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদকে এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তির সঙ্গে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৭ লাখ ৭৮ হাজার ৭৩৯ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। এই অঙ্ক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট স্থূল জাতীয় উৎপাদের প্রায় ৪৯ শতাংশের সমান। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা ৮ লাখ ৭৯ হাজার ২২।[১০]

সংসদের কার্যকারিতার একটি বড় শর্ত হলো সংসদে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ। বিরোধী দলের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো সরকারের দোষ-ত্রুটি ও ব্যর্থতা সংসদের সামনে উপস্থাপন করা। যদি বিরোধী দল সংসদে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সংসদে বিতর্কের মান অনেক নেমে যায়। বাংলাদেশে সংসদের বাইরে এবং ভেতরে সংঘাতের রাজনীতি চলছে। এর ফলে সংসদ অধিবেশনে যখন বিরোধী দল উপস্থিত থাকে, তখন সরকারি দল ও বিরোধী দল অসাংবিধানিক ভাষায় একে অপরকে আক্রমণ করে। এর ফলে সংসদের বিতর্ক অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যখন সরকারি দল সংসদে বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করতে চায়, তখন বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে। এ অবস্থায় সংসদে সরকারি দল বিরোধী দলকে একতরফা আক্রমণ করে। তাই বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত থাকুক আর না-ই থাকুক, সংসদে জাতীয় সমস্যা নিয়ে খুব অল্প আলোচনা হয়। বেশির ভাগ আলোচনার বিষয় হলো প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করা। সারণি-৭.৭-এ কয়েকটি সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের শতকরা হার দেখা যাবে।

## সারণি-৭.৭
## কয়েকটি সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের হার

| সংসদ | বর্জনের হার |
|---|---|
| ৫ম | ৩৩.৭৫% |
| ৭ম | ৪২,৬৭% |
| ৮ম | ৫৯.৭৯% |
| ৯ম | ৮১.৮১% |

উৎস্য : BIGD 2015. The State of Governance in Bangladesh. Dhaka

সারণি-৭.৭ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অষ্টম সংসদে প্রধান বিরোধী দল প্রায় ৮২ শতাংশ অধিবেশনে অংশ নেয়নি। পঞ্চম সংসদে এই হার ছিল প্রায় ৩৪ শতাংশ। সাংবিধানিকভাবে একটি সংসদ কার্যকর করার জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন, তার অধিকাংশই বাংলাদেশে উপস্থিত। উপরন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সংসদসমূহ যে ধরনের কাজ করে, বাংলাদেশের সংসদেও সে ধরনের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তবু সংসদ সত্যিকার অর্থে কতটুকু কার্যকর, সে সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। সংসদ হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভাজনের জন্য একটি অত্যাবশ্যক শর্ত।

নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও সংসদ রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ। এরা কেউ কারও নিচে নয়। বাংলাদেশে সংসদ এই নীতি কতটুকু সমুন্নত রাখতে পেরেছে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন রয়েছে। বিগত চার দশকের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংসদের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বলে সংসদ সদস্যদের রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্বে আনা হয়েছে। দেশের বাজেট প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের কোনো দৃশ্যমান ভূমিকা নেই। বাংলাদেশের বাজেট নির্বাহী বিভাগ প্রণয়ন করে। নির্বাহী বিভাগ বাস্তবায়ন করে এবং কার্যত এর অনুমোদনও করে। কেননা, সংসদের বাজেটের বিষয়ে কোনো ভূমিকা নেই। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে প্রায় বিনা বিতর্কে সংবিধান সংশোধনের মতো প্রস্তাবসমূহ সংসদে পাস করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটিগুলো এখন পর্যন্ত সরকারের কার্যকলাপ তদারকিতে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। সামগ্রিক বিবেচনায় মনে হয় যে বাংলাদেশে সংসদ একটি সমরূপ অনুকরণ। দেখতে অন্য দেশের সংসদের মতো হলেও ভেতরের দিক থেকে এরা এক নয়।

## ৭.৩ সংসদ সদস্যদের সংবিধানের অতিরিক্ত কার্যক্রমের সম্প্রসারণ

বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের আইনগত ক্ষমতার সংকোচন ঘটেছে। বাস্তবে বাংলাদেশে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্বাধীন, তবে সংসদ সদস্যদের এতে কোনো ক্ষতি হয়নি। সংসদের ভেতরে তাঁদের ক্ষমতা হ্রাস পেলেও সংসদের বাইরে তাঁদের ক্ষমতা অনেক বাড়ানো হয়েছে। প্রথমত, সংসদ সদস্যরা স্থানীয় নির্বাচনী এলাকায় নির্বাহী বিভাগের প্রধান প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যকলাপ তদারকের পরোক্ষ ক্ষমতা সব দেশের সংসদেরই আছে। কিন্তু এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় সরকারের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষভাবে নয়। কিন্তু বাংলাদেশে যাঁরা সরকারদলীয় সংসদ সদস্য থাকেন, তাঁদের সঙ্গে সরকার পরিচালকদের নিবিড় সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওপর হম্বিতম্বি করেন। তাঁদের নির্দেশ অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজ করতে বাধ্য করেন। যেসব সরকারি কর্মচারীর মধ্যে আনুগত্যের ঘাটতি দেখা দেয়, তাঁদের বদলি করার ব্যবস্থা করেন। যাঁরা তাঁদের প্রতি অনুগত, তাঁদের যাতে বদলি না করা হয়, সে ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেন। সরকারি পদে নিয়োগ থেকে ঠিকাদারি সব কাজেই তাঁদের অনেকেই হস্তক্ষেপ করেন। নির্বাহী বিভাগের কার্যকলাপে তাঁদের এই প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সংবিধানের মূলনীতির পরিপন্থী। কিন্তু বেশির ভাগ সাংসদই এ ধরনের ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করতে পছন্দ করেন।

দ্বিতীয়ত, তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকারসমূহের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা। কিন্তু সংসদ সদস্যরা স্বাধীন স্থানীয় সরকারকে ভয় করেন। তাই তাঁরা স্থানীয় সরকারের ওপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করতে চান। উপজেলা পরিষদ আইনে তাঁদের উপজেলা পরিষদের পরামর্শক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা জেলা পরিষদেরও উপদেষ্টা। বিধান করা হয়েছে যে স্থানীয় সাংসদের সব পরামর্শ উপজেলা পরিষদকে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার ব্যাপারেও তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন। এদের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা রয়েছে। এর ফলে তাঁরা স্থানীয় সরকারকে কুক্ষিগত করে ফেলেছেন।

তৃতীয়ত, সংসদ সদস্যরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের পদ থেকে আর্থিক সুবিধা হাসিল করছেন। সংসদ সদস্যকে শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সংঘর্ষের রাজনীতির ফলে সংসদ সদস্যরা প্রায় কোনো ব্যাপারেই একমত নন, কিন্তু গাড়ির শুল্ক মওকুফের পক্ষে সব দলই একমত। এই সুবিধা দিতে হলে সেটি দেওয়া উচিত আইনের মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যবশত শুল্কমুক্তের সুবিধা

কোনো আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়নি। এই সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে নির্বাহী আদেশের বলে। সংসদ সদস্যদের এ ধরনের সুবিধা দেওয়া নৈতিক দিক থেকে কতটুকু যুক্তিযুক্ত, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়াও হয় যে সংসদ সদস্যদের যাতায়াতের জন্য গাড়ি ক্রয়ের বিশেষ সুযোগ দেওয়া উচিত, তবু বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। বর্তমানে সংসদ সদস্যরা যেকোনো মূল্যের গাড়ি শুল্ক ছাড়া আমদানি করতে পারেন। এর ফলে উচ্চ শুল্ক দিয়ে যেসব গাড়ি ছাড় করাতে হয়, সেসব গাড়ি তাঁরা ছাড় করেন এবং তা বিক্রি করে অনুপার্জিত মুনাফা লাভ করেন। এ ধরনের ব্যবস্থা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। শুল্কমুক্ত গাড়ি না দিয়ে সংসদ সদস্যদের গাড়ি ক্রয়ের জন্য ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা এককালীন মঞ্জুরি দিলে এ ধরনের দুর্নীতি একেবারে বন্ধ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের অর্থে বিদেশে স্টাডি ট্যুর বা শিক্ষাসফর করতে যান। সংসদ সদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ইউএনডিপির অর্থায়নে আলাদা প্রকল্প রয়েছে এবং অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এ ধরনের প্রকল্পে দাতাদের আগ্রহও রয়েছে। সংসদের বাজেটেও বিদেশ সফরের জন্য বরাদ্দ আছে। যদি শিক্ষাসফরের প্রয়োজন হয়, তাহলে এর জন্য অর্থের সংস্থান সংসদের বাজেটে করা যেতে পারে। কিন্তু সংসদ সদস্যরা এই ব্যবস্থায় রাজি নন, তাঁরা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের অর্থে শিক্ষাসফর করেন। এই ধরনের সফরের কোনো ফল লাভ হয় কি না, তা নিশ্চিত নয়, তবে এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণ বেআইনি। উদাহরণস্বরূপ ২৫ আগস্ট ২০১৬ সালে দৈনিক *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত 'মন্ত্রণালয়ের টাকায় ১৫ সংসদীয় কমিটির বিদেশ সফর' শীর্ষক সংবাদটি উল্লেখ করা যায়। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে দশম জাতীয় সংসদের ৫০টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৫টি কমিটির শতাধিক সদস্য ২৪ বার বিদেশ সফর করেছেন ও যেসব কমিটির সদস্যরা এখনো শিক্ষাসফরের সুযোগ পাননি, তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। একই পত্রিকার ২ জুন ২০১৬ সালের আরেকটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ১৩টি দেশে মন্ত্রী-সাংসদেরা মোট ২২ বার সফর করেছেন। এর মধ্যে ১১টি সফরে খরচ হয়েছে ২ কোটি টাকার বেশি। অন্য দুটি সফরে কত ব্যয় হয়েছে, তা জানা নেই। অথচ এই ২২টি শিক্ষাসফরের কোনো সুফল নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না। আসলে এ ধরনের শিক্ষাসফর আদৌ কতটুকু প্রয়োজনীয়, সে সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। আরও অভিযোগ রয়েছে, অনেক সংসদ সদস্য তাঁদের টেলিফোন বিল পরিশোধ করেন না। ২০০৬ সালে এই মর্মে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়।

সংসদ সদস্যরা সরকারের কাছ থেকে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিতে পারবেন, তা নির্ধারিত হয় মেম্বার্স অব পার্লামেন্ট প্রিভিলিজেস অ্যাক্ট দ্বারা। এই আইনের বাইরে তাঁদের কোনো সুযোগ নেওয়ার অধিকার নেই। অথচ হরহামেশাই এ ধরনের কার্যকলাপ ঘটছে বলে গণমাধ্যমে অভিযোগ দেখা যায়। এর ফলে সংসদ সদস্যদের কার্যকলাপে নৈতিকতার নিশ্চয়তার কোনো উপায় নেই। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা তাঁরা গ্রহণ করছেন। তাঁরা রাজউকের জমি ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ পাচ্ছেন। এসব মিলে সংসদ সদস্যদের পদ একটি লাভজনক পদে উন্নীত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এখানে একটি বড় সমস্যা হলো, সংসদ সদস্যদের জন্য এখনো কোনো আচরণবিধি (Code of Conduct) প্রণয়ন করা হয়নি। এর ফলে তাঁদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

সংসদ সদস্যরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরও খবরদারি করেন। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদে সংসদ সদস্যরা নিজে সভাপতি হন অথবা তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিরা সভাপতি হন। এভাবে একজন সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অতি সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন সংসদ সদস্যদের পদাধিকার বলে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পদে মনোনয়ন বেআইনি ঘোষণা করেছেন। এই রায় সংবিধানের মূল চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ। তবে সরকার এর বিরুদ্ধে আপিল করেছে।

সংসদ সদস্যদের এ ধরনের নেতিবাচক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ জনমনেও বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়। সারণি-৭.৮-এ টিআইবি পরিচালিত একটি সমীক্ষার কিছু ফলাফল দেখা যাবে।

**সারণি-৭.৮**

**সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের হার**

| নেতিবাচক কার্যক্রম | শতকরা কত ভাগ সদস্য এতে অংশ নেন |
|---|---|
| প্রশাসনিক কাজে প্রভাব বিস্তার | ৮১.৮ |
| শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ | ৭৬.৯ |
| উন্নয়ন বরাদ্দের অপব্যবহার | ৭৫.৫ |
| অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত হওয়া বা সমর্থন | ৭৫.৬ |
| সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার | ৬৯.২ |
| নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন | ৬২.২ |
| মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্লট বরাদ্দ গ্রহণ | ৮.৪ |
| অন্যান্য | ১৬.১ |

উৎস : টিআইবি বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ৬৫

সারণি-৭.৮ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৮১.৮ শতাংশ জনগণ বিশ্বাস করে যে সংসদ সদস্যরা প্রশাসনিক কাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। দ্বিতীয়ত, ৭৬.৯ শতাংশ জনগণ বিশ্বাস করে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সংসদ সদস্যরা নিয়ন্ত্রণ করেন। ৭৫.৫ শতাংশ জনগণ বিশ্বাস করে যে সংসদ সদস্যরা উন্নয়ন বরাদ্দের অপব্যবহার করেন। এই সমীক্ষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো যে ৭৫.৬ শতাংশ জনগণ বিশ্বাস করে, সংসদ সদস্যরা অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত বা তা সমর্থন করেন।

বাংলাদেশে সংসদকে কার্যকর করার জন্য সংসদ সদস্যদের আইনগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলো দূর করতে হবে। সে কাজটি সহজসাধ্য নয়, এর জন্য নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং রাজনীতির সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে হবে। পক্ষান্তরে সংসদ সদস্যদের সংবিধানের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ হ্রাস করতে হবে। এই ব্যবস্থা সংসদ সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এর জন্য বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

## ৭.৪ উপসংহার

সাংবিধানিক দিক থেকে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি। সংসদই আইন প্রণয়ন করে। সংসদই বাজেট অনুমোদন করে এবং সংসদের আস্থা নিয়েই নির্বাহী বিভাগ পরিচালিত হয়। আইনের দিক থেকে এর ক্ষমতা প্রশ্নাতীত কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানটি আদৌ তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের অনুকরণে বাংলাদেশের সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই ক্ষমতা সংসদের পক্ষে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ধরনের অনুকরণকেই সমরূপ অনুকরণ বলা হয়ে থাকে। সমরূপ অনুকরণ অনেক ক্ষেত্রে রূপকথার ঘুমন্ত পুরীর মতো। সেখানে রাজা আছেন, রানি আছেন, রাজপুত্র-রাজকন্যারা আছেন, আমির-ওমরারা আছেন, অভিজাত ও নিম্নবর্ণের লোকেরা আছেন, হাতিশালে হাতি আছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া। একটি সভ্য সমাজে যা যা দরকার, সবই ঘুমন্ত পুরীতে আছে কিন্তু সমস্যা শুধু একটাই, তারা ঘুমিয়ে আছে। তারা কোনো কাজ করতে পারছে না। বাংলাদেশের সংসদকেও অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় ঘুমন্ত পুরীর মতো। কীভাবে ঘুমন্ত সংসদকে জাগানো যেতে পারে? অবশ্যই একটি ব্যবস্থা হতে পারে আইনকানুনের সংশোধন। বাংলাদেশের আইন পাশ্চাত্যের অনুকরণে রচিত হলেও এখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমসমূহ সংসদের

কার্যক্ষমতাকে হ্রাস করেছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে :

- সংসদ সদস্যদের নির্বাহী বিভাগের কাছে জবাবদিহি থেকে মুক্তি। বাংলাদেশে নির্বাহী বিভাগ ততক্ষণই ক্ষমতায় থাকতে পারে, যতক্ষণ সংসদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। পক্ষান্তরে সংসদ সদস্য, যাঁরা কোনো দলের থেকে নির্বাচিত হন, তাঁরা যতক্ষণ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন, ততক্ষণ তাঁদের সদস্যপদ অক্ষুণ্ন থাকবে। যখনই তিনি দলের বিরুদ্ধে যাবেন, তখন তাঁর সংসদ সদস্যপদ চলে যাবে। এভাবে সংসদ সদস্যদের দলের প্রতি অনুগত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে নির্বাহী বিভাগের ওপর সংসদের ক্ষমতা কার্যত বাতিল করা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ৭০ অনুচ্ছেদের অবলুপ্তি প্রয়োজন।
- সংসদের একটি বড় কাজ হলো বাজেট অনুমোদন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বাজেট তৈরি করে নির্বাহী বিভাগ এবং বাজেটের অনুমোদনও করে নির্বাহী বিভাগ। এতে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা বাস্তবে অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই ব্যবস্থা অবসানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. বাজেটের ওপর আলোচনার সময়কাল কমপক্ষে ৬ সপ্তাহ করা উচিত। প্রয়োজন হলে এ সময়সীমা আরও বাড়ানো যেতে পারে এবং বর্তমান সংবিধান অনুসারে ৩ মাসের খসড়া বাজেট অন্তর্বর্তী ভোটে অনুমোদন করে অর্থবছর শেষ হওয়ার পরও বাজেট আলোচনা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

২. অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটিতে বাজেটের অবয়ব এবং বিষয়বস্তু নির্দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ১১১(২) বিধিটি সংশোধিত হওয়া উচিত।

৩. বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই কর প্রস্তাবসমূহকে গোপনীয় বিবেচনা করা হয় না। কর প্রস্তাবসমূহ নিয়ে বাজেট পেশ হওয়ার অনেক আগেই সংসদে আলাপ-আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশেও অনুরূপ বিধি প্রচলন করা যেতে পারে।

৪. বর্তমানে সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিতে বিধান রাখা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো মঞ্জুরি দাবির ওপর কোনো গণশুনানি করতে পারবে না। এ ব্যাপারে দোহাই দেওয়া হয় যে, এর ফলে বাজেট-প্রক্রিয়া অনুমোদন বিলম্বিত হবে। কিন্তু পৃথিবীর সব বড় সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে (যথা যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ইত্যাদি) মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিসমূহকে তাদের মঞ্জুরি বিবেচনা করার জন্য গণশুনানি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের সুযোগ প্রচলন করা যেতে পারে।

৫. বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পূরক বাজেট সম্পর্কে প্রায় কোনো আলোচনাই হয় না। সম্পূরক বাজেট বিবেচনার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া যেতে পারে।
৬. সংসদীয় কমিটিগুলোর গণশুনানিতে দরিদ্র মানুষ ও তাদের সংগঠনগুলোকে সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সংসদকে। কিন্তু সংসদ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। এই লক্ষ্যে সংসদীয় কমিটিকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে। তবে আইনগত ক্ষমতা বাড়ালেই সংসদ অধিকতর কার্যকর হবে, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। সংসদের কার্যকারিতার জন্য সুষ্ঠু আইনই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে আরও দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। প্রথমত, এমন সংসদ সদস্য নির্বাচিত করতে হবে, যাঁরা সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহী। দুর্ভাগ্যবশত ইদানীং বাংলাদেশে অধিকাংশ নির্বাচিত সংসদ সদস্যের প্রধান পেশা হলো ব্যবসা। এর ফলে তাঁরা জনগণের স্বার্থরক্ষার বদলে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় অনেক উৎসাহী হয়ে ওঠেন। দুর্ভাগ্যবশত সংসদ সদস্যরা যাতে তাঁদের মূল দায়িত্ব হারিয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারেন, সে ব্যাপারে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের অশুভ প্রবণতা রোধ করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা উচিত।

- **আচরণবিধি :** বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের জন্য কোনো আচরণবিধি নেই। এর ফলে অনৈতিক কার্যকলাপ সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে একটি আইন অথবা বিধি অবিলম্বে জারি করা যেতে পারে।
- **অনুপার্জিত মুনাফা বন্ধ করা :** বর্তমানে সংসদ সদস্যদের অনুপার্জিত মুনাফা অর্জনে বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সংসদ সদস্যদের গাড়ি আমদানিতে শুল্ক মওকুফ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের আচরণ বৈষম্যমূলক এবং শুল্ক মওকুফের সুবিধা অনুপার্জিত মুনাফা অর্জনের সহায়ক। যদি গাড়ির জন্য সংসদ সদস্যদের সুবিধা দিতে হয়, তাহলে তাঁদের আমদানিকৃত গাড়ির শুল্ক মাফ না করে গাড়ি ক্রয় করার জন্য ন্যায়সংগত (১৫ থেকে ২৫ লাখ) অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে। এ ধরনের বরাদ্দ এ সুবিধার অপব্যবহার হ্রাস করতে পারে। এ ছাড়া বর্তমানে সংসদ সদস্যরা নির্বাহী বিভাগের অর্থে বিদেশ সফরের জন্য যে ধরনের স্টাডি ট্যুরের ব্যবস্থা করছেন, তা অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আচরণবিধি এবং সদস্যদের Privileges Act. এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত, যাতে সংসদ সদস্যরা অনুপার্জিত মুনাফা অর্জন না করতে পারেন।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত হ্রাস করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। তবে শুধু আইন করে এ কাজ করা যাবে না, এই লক্ষ্য

অর্জন করতে হলে বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও এ ক্ষেত্রে কার্যকর থাকতে হবে। বর্তমানে সংসদ সদস্যরা তাঁদের দায়িত্বের বাইরে অন্য কাজে বেশি ব্যস্ত থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রথমত, সংসদ সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় কর্মরত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের ভোটারদের সন্তুষ্ট করেন, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই প্রভাব বিক্রি করে অনুপার্জিত মুনাফা অর্জন করেন। দ্বিতীয়ত, উপজেলা পরিষদের ওপর সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাঁদের পরামর্শ উপজেলা পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে তাঁরা ইউনিয়ন পরিষদকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। উপরন্তু সংসদ সদস্যদের বিরোধিতার ফলেই বাংলাদেশে এতদিন নির্বাচিত জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকারের ওপর কর্তৃত্ব তুলে না দিলে সাংসদেরা স্থানীয় সরকারকে কুক্ষিগত করে তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। স্থানীয় সরকার ছাড়াও সংসদ সদস্যরা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন সাধারণত সংসদ সদস্যরা এবং যদি কোনো সংসদ সদস্য সভাপতি না হন, তাহলে তিনি সভাপতি পদে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এ ধরনের ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। ইতিমধ্যে হাইকোর্ট এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন। ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে সংসদকে কার্যকর করার জন্য শুধু সংসদের আইনগত ক্ষমতা বাড়ালেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে যেখানে সংসদ সদস্যরা তাঁদের মূল দায়িত্বের বাইরে যেসব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন অথবা অনুপার্জিত মুনাফা সৃষ্টি করেছেন, তা-ও দূর করতে হবে। এ কাজ সহজ হবে না। সংসদ সদস্যরা এ ধরনের সংস্কারে রাজি হবেন না। সরকারও সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা বাড়াতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

## পাদটীকা

১. DeMaggio Paul and Walter P. Powell. 1983 'The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields'. *American Sociological Review* Vol. 48 (April), 147-160

২. Pritchett Lant, Michal Woolcock and Matt Andrews 2012. Looking Like a State 'Techniques of Persistent Failures in State Capability for Implementation'. (Mimeo). Helsinki, UNU-WIDER

৩. Pritchett Lant and Franke de Weijer. 2010 'Fragile States Stuck in a Capability Trap' (Mimeo). *World Development Report 2011* Background Paper. Washinston D.C. World Bank

৪. আইন মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। ঢাকা।

৫. National Assembly Of Pakistan 2012. *Constitution of the Islamic Republic of Pakistan*. Islamabad.

৬. Wilson, Woodrow. 1885. Congressional Government. JCOC. Final Report (http//www.rules.house.gov/archives/ Jcoc26 htm)

৭. Akbar Ali Khan. 2010. *Friendly Fires, Humpty Dumpty Disorder and Other Essays*. Dhaka: University Press Ltd.

৮. BRAC Institute of Governance and Development. 2015. *The State of Governance in Bangladesh: Institutions, Outcomes and Accountability.* Dhaka: BRAC University.

৯. Akbar Ali Khan. 2008. *People's Participation in Budgetary Process in Bangladesh*. Dhaka: Samunnay.

১০. দৈনিক *প্রথম আলো*। ২ জুন ২০১৬।

# ৮

# বিচারব্যবস্থা : মামলা 'মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয়, আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়'

## ৮.১ সূচনা

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* লিখেছেন, 'আমাদের দেশে যে আইন, সেখানে সত্য মামলায়ও মিথ্যা সাক্ষী না দিলে শাস্তি দেওয়া যায় না। মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয়, আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়। যে দেশের বিচার ও ইনসাফ মিথ্যার উপর নির্ভরশীল সে দেশের মানুষ সত্যিকারের ইনসাফ পেতে পারে কি না সন্দেহ!'[১]

একই ধরনের বক্তব্য শুনেছিলাম যখন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে আইন পড়ি। সাক্ষ্য আইন আমাদের পড়াতেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ডিন ইমতিয়াজ আলী শেখ। তিনি ক্লাসে এসে একটি মামলায় সাক্ষীরা কী বলেছে, সেটার উদাহরণ দিয়ে তিনি এই মামলার ক্ষেত্রে বিচারক হিসেবে আমাদের রায় কী হবে, তা জানতে চান? তখন বয়স অল্প। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দিলাম। জবাবটি শুনে অধ্যাপক মহোদয় হাসলেন এবং বললেন :

> My dear learned friend, you are thinking that when you will sit as a judge in a court, one party will tell you the truth and the other party will tell a lie and your job is to find the truth. In real life this will never happen. Both parties will come and tell lies. Your job is to find the truth from two lies. This is an extremely difficult job.

উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, ধরুন দুজন লোকের মধ্যে ঝগড়া হলো এবং এক পক্ষ আরেক পক্ষকে গালিগালাজ করল। তারপর ক্ষুব্ধ পক্ষ

প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উকিলের কাছে গেল। উকিল বলবে, গালাগালির জন্য মামলা করলে আসামিকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া যাবে না। শাস্তি দিতে হলে তার বিরুদ্ধে কমপক্ষে ছুরি দিয়ে আঘাত করার মামলা করতে হবে। তিনি তার মক্কেলকে ব্লেড দিয়ে হাতে একটু আঘাতের সৃষ্টি করতে বললেন ও তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন। চিকিৎসক ঘুষ খেয়ে সার্টিফিকেট দিলেন যে প্রতিপক্ষ বাদীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে। প্রতিপক্ষ যখন জানল যে তার বিরুদ্ধে ছুরি দিয়ে আঘাত করার মামলা করা হয়েছে তখন সে তার উকিলের কাছে যায়। উকিল তাকে পরামর্শ দেয়, এই ক্ষেত্রে তার বক্তব্য হবে যে সে সেদিন ঢাকা শহরেই ছিল না, ময়মনসিংহ শহরে ছিল। সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কয়েকজন ময়মনসিংহবাসীকে ঠিক করার ব্যবস্থা করল। আদালতে যখন মামলা উঠল, তখন বাদীপক্ষ দাবি করল, আসামিপক্ষ একটি ধারালো ছুরি দিয়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাদীকে আক্রমণ করেছিল। আর আসামিপক্ষ দাবি করল যে ঘটনার দিন সে ঢাকা শহরেই ছিল না, ময়মনসিংহ শহরে ছিল। ময়মনসিংহ শহরের কয়েকজন বাসিন্দা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। দুই পক্ষই মিথ্যা কথা বলল। অথচ ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই পরিস্থিতিতে বিচারকের পক্ষে সত্য এবং মিথ্যার ফারাক করা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে এখনো এই বিচারব্যবস্থাই চলছে, যেখানে বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'মামলা মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয় আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়'। এ ধরনের বিচারব্যবস্থা শুধু মানুষের অধিকারই ক্ষুণ্ন করছে না, দেশের ভাবমূর্তিও নষ্ট করছে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংক বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিচারব্যবস্থার মূল্যায়ন করে।[২] এই মূল্যায়নে দেখা যায় যে ৮৩ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগকারীর বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার ওপর কোনো আস্থা নেই। ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাংকের আরেকটি সমীক্ষায় দেখা যায়, যদি কোনো চুক্তি নিয়ে বিবাদ হয়, তাহলে আদালতের মাধ্যমে চুক্তি বলবৎ করতে সারা বিশ্বে গড়ে ৬১৩ দিন লাগে। অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লাগে ১৪৪২ দিন।[৩] অর্থাৎ সারা বিশ্বে যে সময় লাগে, তার দ্বিগুণের বেশি সময় লাগে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জানাচ্ছে, তাদের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে সমীক্ষাভুক্ত ব্যক্তিদের ৬৬ শতাংশ আদালতে নিচের পর্যায়ে গড়ে ৬১৩৫ টাকা ঘুষ দিয়েছে।[৪] বিশ্বব্যাংকের আইনগত এবং বিচারিক ক্ষমতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে একটি দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি হতে ১৫ থেকে ২০ বছর সময় লাগে।[৫] আসলে এই সময়

আরও অনেক বেশি। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা বর্তমানে এক চরম সংকটের সম্মুখীন।

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার মূল সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ও সেগুলোর সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করা। প্রবন্ধটিকে ৬টি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিচার পেতে গেলে কত সময় লাগে, সে সম্পর্কে তথ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমস্যার কারণসমূহ সম্পর্কেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিচার বিভাগের কার্যকারিতা অনেকাংশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল। বিচার বিভাগের বাইরের শক্তির ওপর নির্ভরশীল বিচারব্যবস্থা সুষ্ঠু ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তৃতীয় খণ্ডে এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই খণ্ডে দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা যেসব অনুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব অনুমান সঠিক নয়। এর ফলে বিচার বিভাগের মৌল কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডে বাংলাদেশে বিচার বিভাগের সংস্কার সম্পর্কে কিছু সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

## ৮.২ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার প্রধান সমস্যাসমূহ

যেকোনো বিচারব্যবস্থা মূল্যায়নে দুটি বিষয়ে বিবেচনা করতে হয়। প্রথমত, বিচার পেতে কত সময় লাগে এবং দ্বিতীয়ত, যে বিচার পাওয়া যায়, সেটি স্বচ্ছ এবং মানসম্মত কি না? বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার একটি বড় দুর্বলতা হলো যে এখানে বিচার পেতে অনেক সময় লাগে। ইংরেজিতে একটি আপ্তবাক্য আছে Justice delayed is Justice denied। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের বিচার প্রার্থীরা বহুলাংশে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা অত্যন্ত শক্ত। অধস্তন বিচারব্যবস্থাকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক্‌করণের আগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ফৌজদারি আদালত সম্পর্কে কিছু তথ্য সহজে পাওয়া যেত। কিন্তু এখন এ ধরনের তথ্য পাওয়া যায় না।

## সারণি-৮.১
## নিম্ন পর্যায়ে ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তির হার, ১৯৯৪-২০১৪

| বছর | মোট অমীমাংসিত ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির হার (শতকরা) |
|---|---|
| ১৯৯৪ | ৫২.১২% |
| ১৯৯৫ | ৫৬.৬৬% |
| ১৯৯৬ | ৪৮.৯৩% |
| ১৯৯৭ | ৪৬.৮৮% |
| ১৯৯৮ | ৪৩.৬৭% |
| ১৯৯৯ | ৪৩.৫৮% |
| ২০০০ | ৪৪.০২% |
| ২০০১ | ৪৪.৮২% |
| ২০০২ | ৫০.১৬% |
| ২০০৩ | ৪৭.৯৮% |
| ২০০৪ | ৪০.০০% |
| ২০০৫ | ৩৭.০০% |
| ২০০৬ | ৩৫.০০% |
| ২০০৭ | ৩৪.০০% |
| ২০০৮ | ৩৩.০০% |
| ২০০৯ | ৩২.০০% |
| ২০১০ | ৩৫.০০% |
| ২০১১ | ৩৭.০০% |
| ২০১২ | ৩৫.২-% |
| ২০১৩ | ৩৫.৫০% |
| ২০১৪ | ৩৫.০০% |

উৎস : ১) ১৯৯৪ থেকে ২০০০ পর্যন্ত তথ্যের জন্য : কাজী ইবাদুল হক, *Administration of Justice in Bangladesh.*

২) ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তথ্যের জন্য : BIGD, 2014 *The State of Governance Bangladesh 2014-2015: Institutions, Outcomes, Accountability.* Dhaka. BRAC Institute of Goverenance and Development, BRAC.

২০০৭ সাল পর্যন্ত অধস্তন বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটরা। ২০০৭ সালের পর অধস্তন ফৌজদারি বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ করা হয় এবং ২০০৮ সাল থেকে হাইকোর্টের নিযুক্ত বিচারকেরা ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি করেন। এখানে লক্ষণীয় যে যখন ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচার করতেন, তখন অভিযোগ করা হতো যে ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচারকাজকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন না। তাঁরা মূলত নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বে বেশি উৎসাহী এবং বিচারকাজকে গুরুত্ব দেন না। তাই

বিচারপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। ফৌজদারি আদালতে হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচারক নিয়োগ করার পর নিষ্পত্তির হার বেড়ে যাবে। কিন্তু সারণি-১ এই অনুমান সমর্থন করে না। সারণি-১-এ দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৪ সালে ম্যাজিস্ট্রেটরা ৫২.১২ শতাংশ মামলা এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করেছেন। ১৯৯৫ সালে এই হার ছিল ৫৬.৬৬ শতাংশ। ২০০০ সালে এই হার কমে ৪৪.০২ শতাংশে দাঁড়ায় কিন্তু আবার ২০০২ সালে এই হার ৫০.১৬ শতাংশে উন্নীত হয়। অর্থাৎ হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন সার্বক্ষণিক বিচারপতিরা যখন বিচারকাজ পরিচালনা করেন, তখন এই হার অনেক কমে যায়। ২০০৯ সালে এই হার ছিল ৩১ শতাংশ। ২০১১ সালে এই হার ৩২ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১৪ সালে এই হার ছিল ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ খণ্ডকালীন ম্যাজিস্ট্রেটরা যে হারে মামলা নিষ্পত্তি করতেন, তার চেয়ে কম হারে পূর্ণকালীন বিচারকেরা মামলা নিষ্পত্তি করছেন। অধস্তন ফৌজদারি ব্যবস্থায় তদারকের দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত হলে মামলা নিষ্পত্তির হার দ্রুত হবে বলে যে দাবি করা হতো, তার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

**সারণি-৮.২**
**অধস্তন আদালত কর্তৃক দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তির হার**

| বছর | মোট অমীমাংসিত ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির হার (শতকরা) |
|---|---|
| ১৯৯৯ | ২৬.৭৬% |
| ২০০০ | ২৮.৩৫% |
| ২০০১ | ২৭.১১% |
| ২০০২ | ২৭.১৩% |
| ২০০৩ | ২৭.১৩% |
| ২০০৪ | ২৬.৯৩% |
| ২০০৫ | ২৫.৪৭% |
| ২০০৬ | ২৫.০৩% |
| ২০০৭ | ২৫.০০% |
| ২০০৮ | ১৮.০০% |
| ২০০৯ | ২০.০০% |
| ২০১০ | ২১.০০% |
| ২০১১ | ৬.০০% |
| ২০১২ | ৬.০২% |
| ২০১৩ | ১৮.০৫% |
| ২০১৪ | ২২.০০% |

উৎস: BIGD. 2008, *The State of Governance Bangladesh 2014-15,: Institutions, Outcomes, Accountability*. Dhaka. BRAC Institute of Goverenance and Development, BRAC.

সারণি-৮.২ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৯ থেকে ২০০০ দশকে যে হারে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি হতো, সে হার অধস্তন ফৌজদারি বিচার বিভাগকে পৃথক্‌করণের পর কমে গেছে। ২০১১ এবং ২০১২ সালে এই হার নাকি ৬ শতাংশে নেমে এসেছিল। ২০০৪ সালে ২৭ শতাংশ থেকে এই হার কেন ৬ শতাংশে নেমে এসেছিল, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে বিচার বিভাগকে পৃথক্‌করণের পর দেওয়ানি আদালতের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

সারণি-৮.৩-এ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে নিষ্পত্তির হার সম্পর্কে তথ্য দেখা যাবে।

**সারণি-৮.৩**
**সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের নিষ্পত্তির হার**

| সাল | আপিল বিভাগে দরখাস্ত নিষ্পত্তির হার | আপিল বিভাগে আপিল নিষ্পত্তির হার | হাইকোর্ট বিভাগের ফৌজদারি আপিল নিষ্পত্তির হার | হাইকোর্ট বিভাগে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির হার | হাইকোর্ট বিভাগে রিট আবেদন নিষ্পত্তির হার | হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত (Original) মামলা নিষ্পত্তির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০০৪ | ৩১% | ১২% | ৯.৫% | ৫.৫% | ১৩.৫% | ১৪% |
| ২০০৫ | ২৯% | ১১% | ৯% | ৫.৫% | ১২% | ১২% |
| ২০০৬ | ১৫% | ১২% | ৬% | ৫% | ৯% | ৮% |
| ২০০৭ | ৩৫% | ৩৩% | ৬% | ৬% | ২১% | ১৫% |
| ২০০৮ | ৫৪% | ৯% | ৪% | ৬.৫% | ১৭% | ৮.০৫% |
| ২০০৯ | ৬৯% | ২০% | ৩.০৫% | ৮% | ১২% | ৯% |
| ২০১০ | ২১% | ১০% | ২৩% | ৫.৫% | ১২.০৫% | ১২.০৫% |
| ২০১১ | ১০% | ৬.৫% | ২৫% | ৬.০১% | ২০.০৫% | ১১.০৫% |
| ২০১২ | ১০% | ৬% | ১৩% | ৬% | ১৩% | ১৭% |
| ২০১৩ | ৩০% | ৮% | ৬% | ৪% | ১১.৯৫% | ১৪% |
| ২০০১-২০১৩ গড় | ৩০.৪ | ১১.৮৫ | ১০.০৫ | ৫.০০৯ | ১২.১৫ | ১০.৭১৬ |
| মামলা নিষ্পত্তির গড় সময় | ৩.২৮ | ৮.৪৩ | ৯.৫২ | ১৯.৯৬ | ৮.২৩ | ৯.৩৩ |

উৎস : BIGD. 2008, The State of Governance Bangladesh 2014-15, 47-50

সারণি-৮.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে হাইকোর্টে দেওয়ানি আপিলের জট সবচেয়ে বেশি। গত ১০ বছরের দেওয়ানি আপিলের নিষ্পত্তির হার থেকে দেখা যাচ্ছে, দায়েরকৃত আপিলের মাত্র ৫.০০৯ শতাংশ আপিল বছরে নিষ্পত্তি করা হয়। এই হারের তাৎপর্য হলো, কেউ হাইকোর্টে দেওয়ানি আপিল করলে তার চূড়ান্ত ফলাফল পেতে কমপক্ষে ২০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এরপর যদি আপিল বিভাগে আপিল করা হয়, তাহলে আরও ৮.০৪৩ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এর তাৎপর্য হলো, জেলা জজ আদালতে যদি একটি দেওয়ানি মামলা রুজু করা হয়, তবে জেলা আদালতে তা প্রায় ৫ বছর এবং সুপ্রিম কোর্টে এবং হাইকোর্ট বিভাগে আপিল নিষ্পত্তি করতে আরও ২৮ বছর সময় লাগবে। অর্থাৎ চূড়ান্ত বিচার পেতে প্রায় ৩৩ বছর সময় লাগবে। এ ধরনের শ্লথ নিষ্পত্তির হার শুধু মানুষের অধিকার হরণ করে না, এর ফলে দেশে বিনিয়োগও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বস্তুত বাংলাদেশে বর্তমানে অনিষ্পন্ন কতগুলো মামলা বিচারাধীন, সে সম্পর্কে সুষ্ঠু তথ্য পাওয়া অত্যন্ত শক্ত। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত *State of Governance Bangladesh ২০১৪-১৫* প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার মতে, ২৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৯৪টি মামলা জেলা আদালতে এবং ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৫৯টি মামলা সুপ্রিম কোর্টে অনিষ্পন্ন অবস্থায় ছিল।[৬] ২০১৬ সালের ১১ জানুয়ারি প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, 'দেশের আদালতগুলোতে ৩০ লাখ মামলা বিচারাধীন, এর মধ্যে ৩ লাখ উচ্চ আদালতে।' এসব বিবরণ সত্য হলে গত এক বছরে বাংলাদেশে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার বেড়েছে।

এই ধরনের মামলার জট শুধু যে বাংলাদেশেই দেখা যাচ্ছে তা নয়, ভারতে প্রায় ৩ কোটি মামলা বিচারাধীন। ২০০০ সালে অবিনাশ দীক্ষিত হিসাব করেছিলেন যে সারা ভারতে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মামলা বিচারাধীন এবং যে হারে বর্তমানে মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে, সে হারে এসব মামলা নিষ্পত্তি করতে ৩২৪ বছর লাগবে।[৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে আশঙ্কা করা হচ্ছে বাংলাদেশে অনিষ্পন্ন মামলা নিষ্পত্তি করতে কয়েক শ বছর সময় লাগবে।

বাংলাদেশে মামলাজটের সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রশাসন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা মূলত পেশকার বা Bench Clerk-এর ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে পেশকাররা হাকিমদের নথি রক্ষণাবেক্ষণে, মামলার তারিখ নির্ধারণে, আদালতের হুকুম জারিকরণে এবং বিভিন্ন রিটার্ন প্রেরণে সহায়তা করেন। বাংলাদেশে এই পদ ব্রিটিশ শাসনামলে সৃষ্টি করা হয়। শুরু থেকেই তাঁরা ঘুষখোর হিসেবে দুর্নাম কামাই করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস এবং

সংবাদপত্রে তাঁদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত* বইটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে।[৮] বঙ্কিম নিজে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং তিনি মুচিরাম গুড়ের যে চরিত্র চিত্রায়ণ করেছেন, তা অত্যন্ত বাস্তব। যখন মুচিরামকে আদালতে সহায়ক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়, তিনি শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি ঘুষ খাবেন না। কিন্তু চাকরিতে যোগ দিয়েই তিনি ঘুষ খাওয়া শুরু করেন। প্রথমে আপসে যা পাওয়া যেত, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিছুদিন পর মক্কেলদের ফাঁদে ফেলে কীভাবে অতিরিক্ত ঘুষ আদায় করা যায়, সেটা তিনি শিখে যান এবং তা রপ্ত করা শুরু করেন। ঘুষ না পেলে হাকিমের হুকুম সত্ত্বেও তিনি ওয়ারেন্ট কিংবা সমন জারি করতেন না। যেহেতু ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটরা বাংলা জানতেন না, সে জন্য তাঁকে সাক্ষীদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সহায়তা করতে হতো। ঘুষ দিলে তিনি সাক্ষীদের বক্তব্য পরিবর্তন করে দিতেন। পেশকার পদে তাঁর উপরি পাওয়া এত বেশি ছিল যে তিনি পদোন্নতি চাইতেন না। তবু যখন তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেট পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়, তখন তিনি চাকরি ছেড়ে দেবেন বলে চিন্তা করেন। কিন্তু তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে ভয় দেখান, চাকরি ছেড়ে দিলে তাঁর অনুপার্জিত অর্থের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হতে পারে। তাই তিনি চাকরিতে থেকে যান। বঙ্কিম লিখেছেন যে মুচিরাম কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন না, তাঁর সহকর্মীরাও একই রকম দুর্নীতিবাজ ছিলেন। এক শত বছর আগে পেশকারদের সম্বন্ধে বঙ্কিম যা লিখেছেন, তা আজও প্রযোজ্য। সুপ্রিম কোর্টে পেশকারদের এ ধরনের তৎপরতা এখনো লক্ষণীয়। ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল প্রধান বিচারপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে যে বক্তব্য দেন, সেখানে তিনি সহায়ক কর্মকর্তাদের দুর্নীতি সম্পর্কে বিচারপতিদের সতর্ক করে দেন। (দৈনিক *আমাদের সময়*, ২০১০) তবে তাঁরা শুধু নিজেরাই ঘুষ খান না, তাঁরা দুর্নীতিবাজ জজ ও দুর্নীতিবাজ আইনজ্ঞদের মধ্যে যোগাযোগও ঘটিয়ে দেন।[৯] (পিপিআরসি ২০০৭) জ্যেষ্ঠ সহায়ক কর্মকর্তারা অনেক সময় অনভিজ্ঞ ও কনিষ্ঠ জজদের চেয়েও আইনকানুন ভালো বোঝেন। এর ফলে তাঁরা জজ এবং মক্কেলদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে দেন। তাঁদের কাজ সুষ্ঠুভাবে তদারক করা হয় না।

## ৮.৩ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার জন্য অত্যাবশ্যক। প্রথমত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মানবাধিকার রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। যদি বিচারব্যবস্থা সরকারের আজ্ঞাবাহী হয়, তাহলে নির্বাহী বিভাগ মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে

দ্বিধাবোধ করবে না। নির্বাহী বিভাগের স্বেচ্ছাচারের প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করে মানুষের অধিকার। দ্বিতীয়ত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন এ জন্য যে যাঁরা বিচার করবেন, তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। কেউ যদি তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে বিচারব্যবস্থা সুষ্ঠু হবে না। তাই একদিকে বিচারকদের কার্যকলাপে কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না, অন্যদিকে এ ধরনের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বিচারক নিয়োগ করতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সংবিধানে বিচার বিভাগকে অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাহী বিভাগ এ ধরনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে। ২০১৬ সালের ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা দাবি করেন যে নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের কাছ থেকে সব ক্ষমতা নিয়ে যেতে চাইছে। প্রধান বিচারপতির এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের সংবিধান নির্বাহী বিভাগ আইনসভা ও বিচার বিভাগের স্বতন্ত্র ক্ষমতার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, কোনো বিভাগই অন্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং প্রতিটি বিভাগই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। বাস্তবে এই ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক প্রতিবন্ধকতা থেকে যায়। ব্রিটিশ শাসনামলে অধস্তন ফৌজদারি আদালতকে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে না দিয়ে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে যে যত শিগগির সম্ভব অধস্তন ফৌজদারি আদালতসমূহ বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হবে। কিন্তু কোনো সরকারই সংবিধানের এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেনি। ফলে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০০০ সালে সুপ্রিম কোর্ট 'মাজদার হোসেন ও অন্যান্য বনাম সচিব অর্থ মন্ত্রণালয়' মামলায় সরকারকে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধস্তন ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাকে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে দেওয়ার জন্য আদেশ দেন। এরপরও সরকার গড়িমসি করে এবং ২০০৭ সালে এই রায় বাস্তবায়ন করে। এর ফলে সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে বিচার বিভাগের ক্ষমতা স্বীকার করে নেয় :

১. সব অধস্তন ফৌজদারি আদালত বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয়।
২. বিচার বিভাগের সব নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিয়োজিত কমিটির কাছে ন্যস্ত করা হয়। তাঁদের শৃঙ্খলা ও পদোন্নতির দায়িত্ব আদালতকে দেওয়া হয়।
৩. বিচারপতিদের আলাদা বেতন কাঠামো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিচারপতিদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কমিটি নিয়োগ করা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু সরকার এখনো অধস্তন বিচারপতিদের পদায়ন ও বদলির ক্ষমতা পুরোপুরি সুপ্রিম কোর্টকে ছেড়ে দেয়নি। দ্বিতীয়ত, সরকার সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিয়োজিত বেতন

কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিচারকদের বেতন নির্ধারণ করতে রাজি হয়নি। তবে বিচারকদের জন্য বিচার ভাতা প্রবর্তন করে এবং এ বিষয়ে সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে আপসে একটি আপাত গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে দুটি ক্ষেত্রে এখনো সরকারের কর্তৃত্ব রয়েছে। প্রথমত, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে তিনি প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন। প্রধানমন্ত্রী যেহেতু একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান, সেহেতু সম্প্রতি বিচারপতি নিয়োগের রাজনৈতিকীকরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে গবেষক নিজাম আহমদের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> In short, the two main parties, which have exercised state power since 1991, have politicised every segment of the society in their bid to rise to and survive in power. Rarely can one find an institution where party politics is not evident. The judiciary, which remained outside the influence of party politics for a long time, has apparently become a cockpit for bitter partisan struggle, especially since the beginning of a new democratic era in 1991.[১০]

দ্বিতীয়ত, সরকারের হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি সংবিধান সংশোধন করে সে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মূল সংবিধানে বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা জাতীয় পরিষদকে দেওয়া হয়। তবে পরে সংশোধন করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বিচারপতিদের অপসারণ করতে হলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে প্রেরিত অভিযোগ তদন্ত করে যদি কাউন্সিল সুপারিশ করে, বিচারপতি গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী অথবা শারীরিক বা মানসিক কারণে তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য, তবে রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারণ করতে পারবেন। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রধান বিচারপতি ও প্রবীণতম দুজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত হবে। কাজেই সংসদকে বিচারপতি অপসারণের কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই বিধান সংশোধন করেছে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল তুলে দেওয়া হয়েছে এবং অসদাচরণের জন্য বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। জাতীয় সংসদে অভিসংশনের হুমকি দেওয়া হলে সেটা অবশ্যই বিচারপতিদের প্রভাবিত করবে। সুতরাং পদায়ন ও অভিসংশনের নিয়মাবলি পরিবর্তিত না হলে বাংলাদেশে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ

হাইকোর্ট অভিসংশন-সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনীকে বেআইনি ঘোষণা করেছেন এবং বর্তমানে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন।

কেউ কেউ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় বিলম্বের জন্য বিচারকদের স্বল্পতাকে দায়ী করে থাকেন। তবে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির পরও অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। প্রকৃতপক্ষে যদি মামলার নিষ্পত্তির হার বিবেচনা করা হয়, তাহলে বিচারকের সংখ্যা প্রধান নিয়ামক বলে মনে হয় না। সারণি-৮.২-এ দেখা যাচ্ছে, ২০০৪ সালে প্রায় ২৭ শতাংশ দেওয়ানি মামলা অধস্তন আদালত নিষ্পত্তি করে। অথচ বিচারকের সংখ্যা না কমা সত্ত্বেও ২০১১ সালে মামলা নিষ্পন্নের হার ছিল ৬ শতাংশ ও ২০১২ সালে ৬.০২ শতাংশ। এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে শুধু বিচারকদের সংখ্যা বাড়ালে সমস্যার সমাধান হবে না, বিচারকদের উৎপাদনশীলতাও বাড়াতে হবে।

## ৮.৪ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার মৌল কাঠামো

এ দেশের বর্তমান বিচারব্যবস্থা ব্রিটিশরা প্রবর্তন করে। তারা তাদের দেশে প্রচলিত কমন ল (বা নজিরের ভিত্তিতে অলিখিত আইনের আদলে) এর ভিত্তিতে এই দেশের বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ ব্যবস্থা ব্রিটিশপূর্ব ভারতে প্রচলিত বিচারব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। পৃথিবীতে ব্রিটিশ কমন ল ছাড়াও বিচারব্যবস্থা রয়েছে। যথা সিভিল ল, সমাজতান্ত্রিক আইন ও ইসলামিক আইন। এই বিচারব্যবস্থাগুলোর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি-৮.৪-এ দেখা যাবে।

সারণি-৮.৪-এর বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে ব্রিটিশরা ভারতে বিচারের ধারণায় দুটি বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। প্রথমত, ভারতে বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল বাদী ও বিবাদীর মধ্যে আপসের পরিবেশ সৃষ্টি করা। ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থায় আপসের কোনো স্থান নেই। বিচারব্যবস্থায় চলে হার-জিতের লড়াই। এর ফলে যে মামলায় জেতে, সেই লাভবান হয়। আর যে মামলায় হারে, সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। ভারতের চিরাচরিত বিচারব্যবস্থায় সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ ছিল না। বরং বিশ্বাস করা হতো যে সিদ্ধান্ত না হলে দুপক্ষ ক্লান্ত হয়ে আপস করবে। কৌটিল্য বিচারকদের নিম্নলিখিত পরামর্শ দেন :

> If there is a conflict in the evidence given by different witnesses, the judges shall take into account the number of witnesses, their reliability and the opinion of the court on their disinterestedness. If no decision could be reached on these grounds, the judgement shall be halfway between the two claims. If even this is not possible, both parties shall lose their suits and the king shall take over the disputed property.[১১]

| | |
|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সাইপ্রাস, নাইজেরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া | ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ, লাতিন আমেরিকা, কানাডার কুবেক, পূর্ব এশীয় দেশসমূহ, কঙ্গো, আজারবাইজান, কুয়েত, ইরাক, রাশিয়া, তুরস্ক, মিসর, মাদাগাস্কার, লেবানন, সুইজারল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড |

কিন্তু ব্রিটিশসৃষ্ট আদালতে বিচারকের সন্দেহের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে সমান ভাগ করে আপস করার কোনো সুযোগ ছিল না। ব্রিটিশ আদালতের নিয়ম হলো, মামলায় এক পক্ষের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই নতুন বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি ব্রিটিশরা এ দেশে নতুন ভূমিব্যবস্থাও গড়ে তোলে। এই নতুন ভূমিব্যবস্থায় জাল দলিল দিয়ে অনেকে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশসৃষ্ট আদালতে আইনজীবীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলাতের কমন ল ব্যবস্থাতে আদালতে মামলা নিয়ন্ত্রণ করেন আইনজীবীরা, বিচারকেরা নন। আইনজীবীরা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, বিচারকেরা সেসব বিষয়ের ওপর রায় দেন। মামলায় কোন কোন বিষয়ের ওপর রায় হবে, সেটা বিচারকেরা নির্ধারণ করেন না। সেটা আইনজীবীরা নির্ধারণ করেন। অথচ সিভিল ল ব্যবস্থায় আদালত পরিচালনা করেন বিচারকেরা। কোন মামলায় কোন কোন বিষয় সিদ্ধান্ত হবে, সেটা নির্ধারণ করেন মূলত বিচারকেরা, আইনজীবীরা নন।

এ প্রসঙ্গে ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে কমন ল ও সিভিল ল বিচারব্যবস্থার একটি তফাত স্মরণ করা যেতে পারে। সিভিল ল ব্যবস্থায় ইনকুইজিটোরিয়াল (Inquisitorial) বা অনুসন্ধানমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থাতে আদালতের কাজ হলো সত্য বের করা। তাই আদালত বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীদের জেরা করতে পারেন। এখানে অভিযুক্তকে প্রমাণ করতে বলা হয় যে সে নির্দোষ। পক্ষান্তরে কমন ল ব্যবস্থাকে বলা হয় অ্যাডভারসারিয়াল (Adversarial) বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাতে বিচারক রেফারি মাত্র। বাদী ও বিবাদীর আইনজীবীরা মামলার বিচার্য বিষয় তুলে ধরেন। বিচারকের কাজ আইন ও আদালতে পেশকৃত তথ্যের আলোকে রায় দেওয়া। এখানে প্রমাণের মানদণ্ড কঠোর। আসামিকে নির্দোষ গণ্য করে বিচার শুরু হয়। এখানে বাদীকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হয় যে আসামি দোষী। কমন ল ব্যবস্থাতে তাই আসামিকে দোষী প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন।

উপরন্তু বিলাতে কমন ল ব্যবস্থায় সাধারণ মামলা ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার মধ্যে তফাত করা হয়। সাধারণ ফৌজদারি মামলায় কোনো আইনজীবী আদালতে মামলা পরিচালনা করেন না। বাদী ও আসামি উভয় পক্ষ আদালতে যান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের দোষ নিজেরা স্বীকার করে নেন অথবা এ সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্য পেশ করেন। তেমনি দেওয়ানি ছোটখাটো মামলায় দুই পক্ষ আদালতে উপস্থিত হয়ে নিজেরাই তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। কোনো আইনজীবী এসব মামলায় উপস্থিত হন না। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে যে ফৌজদারি মামলায় বেশির ভাগ অপরাধী নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন এবং দেওয়ানি মামলার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিচারের আগেই মামলা

নিষ্পত্তি হয়ে যায়।[১২] এসব মামলায় তাই আইনজীবীদের কোনো ভূমিকা নেই। আইনজীবীরা শুধু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় অংশগ্রহণ করেন। বোটেরো ও তাঁর সহকর্মীরা বিলাতের আদালতের দক্ষতা এবং মামলারত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টির একটি বড় কারণ হিসেবে আইনজ্ঞদের কম হস্তক্ষেপকে চিহ্নিত করেছেন।[১৩]

ভারতে সব মামলাতেই আইনজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। এর কারণ হলো, বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ আদালতে বিচারকেরা ছিলেন ইংরেজ এবং আইন প্রণীত হতো ইংরেজি ভাষায়। দেশের বেশির ভাগ লোক ছিলেন অশিক্ষিত। ইংরেজি ভাষায় রচিত আইন দিয়ে ইংরেজ বিচারকদের বোঝানোর ক্ষমতা বেশির ভাগ মামলারত বাদী-বিবাদীর ছিল না। কাজেই তাঁরা সব ক্ষেত্রেই উকিল নিয়োগ করতেন এবং আদালতও উকিলদের অংশগ্রহণ মেনে নেন। এর ফলে সব মামলাতেই আইনজ্ঞরা জড়িয়ে পড়েন।

অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলে দেশে শিক্ষিত লোকের চাকরির অভাব ছিল, কাজেই যে পরিমাণে আইনজ্ঞের দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি লোক আইন পেশায় যোগ দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশে বিবেকহীন সম্পত্তিলোভী ও আইনজ্ঞদের মধ্যে আঁতাত গড়ে ওঠে। দেশে বিচারব্যবস্থায় দুঃসাহসিক ব্যক্তিদের ফাটকাবাজির সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁরা আইনজীবীদের পরামর্শমতো জাল দলিল এবং ভুয়া সাক্ষী ব্যবহার করে নিষ্পাপ লোকের সম্পত্তি দখল করেন। ভুয়া সাক্ষীর জন্য দেশে সর্বত্র টাউটদের উপদ্রব দেখা দেয়। এর ফলে আইনের ফাটকাবাজি অনেকের নেশায় পরিণত হয়। এ ধরনের লোকেরা ভালো আইনজ্ঞ ভাড়া করে মামলা জেতার খেলায় মাতে। ভালো আইনজ্ঞরা জুয়া খেলার ঘোড়ায় পরিণত হয়। যেসব আইনজীবী মামলায় জিততে পারেন, তাঁরা জুয়া খেলায় ঘোড়ার মতো আইনের ফাটকাবাজদের প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। নৃতত্ত্ববিদ বার্নার্ড কোন (Bernard Cohn) ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের কমন ল ব্যবস্থা প্রবর্তনের ধ্বংসাত্মক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> It is evident that courts did not settle disputes but were used either as a form of gambling on the part of legal speculators who were landlords or merchants and who turned to courts to wrest property from rightful owners, or as a threat in a dispute.[১৪]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পার্সিবাল স্পিয়ার এ পরিস্থিতির বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ব্রিটিশ প্রবর্তিত আদালতগুলো বিত্তবান ভারতীয় কৃষকদের জন্য এক ধরনের জুয়ায় পরিণত হয়।[১৫]

ভারতের বিচারব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো, একধরনের বিবেকহীন আইনজীবীর উত্থান। তাঁরা জাল দলিল ও ভুয়া সাক্ষীদের ওপর ভিত্তি করে বিপুল সম্পত্তি নিরীহ মালিকদের হাত থেকে আদালতের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারী আইনি

ফাটকাবাজদের কাছে স্থানান্তরে সহায়তা করেন। এর ফলে আদালত ব্যবস্থায় ব্যাপক জাল-জালিয়াতি ছড়িয়ে পড়ে। এর সঙ্গে তাঁরা ফাটকাবাজদের মামলা এবং পাল্টা মামলা রুজু করতে উৎসাহিত করেন। এর ফলে মামলার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। উপরন্তু তাঁদের আয় বাড়ানোর জন্য আইনজীবীরা ঘন ঘন মামলার তারিখ পরিবর্তন করতে থাকেন। এর ফলে আদালতগুলোতে মামলার জট বাড়তে থাকে। যত দিন পর্যন্ত আদালতে ব্রিটিশ বিচারকদের প্রাধান্য ছিল, তত দিন তাঁরা আইনজীবীদের ভূমিকা খর্ব করতে চেষ্টা করেন। Legal Practitioners Act., 1872-এ আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিচারকদের হাতে ছিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বার কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে জজদের বদলে আইনজীবীদের নিজেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিচারব্যবস্থায় আইনজ্ঞদের অপ্রতিরোধ্য আধিপত্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে আদালতে মামলার জট বাড়তে থাকে।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে কমন ল-ভিত্তিক বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু এই পরিবর্তন অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন। দেশের বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কমন লর ভিত্তিতে। এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করলে অতীতের সঙ্গে বিচারব্যবস্থার যোগসূত্র ক্ষুণ্ন হবে। অথচ যদি পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে বিচারব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে :

- Alternate Dispute Resolution বা মামলা নিষ্পত্তির বিকল্প পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় আদালতের বাইরে আইনজ্ঞ ছাড়া সাধারণ মানুষের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার আইনে কনসিলিয়েশন কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এ ধরনের আদালত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। স্থানীয় সরকার স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে বেশির ভাগ অপরাধ তাঁরাই করে থাকেন। এর ফলে অনেক মানুষই মনে করেন যে স্থানীয় পর্যায়ে তাঁদের বিপক্ষে রায় পাওয়া সম্ভব নয়। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশে কোথাও কোথাও বিকল্প পদ্ধতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এখানে মাদারীপুর লিগ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সাফল্যের কথা বলা হয়ে থাকে। প্রায় ৯৫টি ইউনিয়নে এই সংস্থা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে সাফল্য অর্জন করেছে। তবু ওই এলাকাতেও অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় অভিজাততন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়। যেখানে স্থানীয় তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে, সেখানেই এ ধরনের আদালত সাফল্য অর্জন করতে পারে। তাই যেসব স্থানে এনজিও শক্তিশালী, সেসব স্থানে এ ধরনের বিচারব্যবস্থা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়।[১৬]

- ফৌজদারি মামলায় Inquisitorial ব্যবস্থার প্রবর্তন। বর্তমান ব্যবস্থায় নিয়ম হলো, আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে করবে, তাকে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কোনো যুক্তিসংগত সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে হবে। এই মান অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই মানের সাক্ষ্য প্রদান করা সম্ভব হয় না। ইউরোপে প্রচলিত Inquisitorial system-এ আসামিকে প্রমাণ করতে হয়, সে নির্দোষ। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে অনেক মামলা নিষ্পত্তি সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, কমন ল ব্যবস্থায় আদালত কোন কোন বিষয়ে বিবেচনা করবেন, তা নির্ধারণ করেন আইনজ্ঞরা, আদালত নন। এই ক্ষমতা বিচারকদের দিলে মামলা নিষ্পত্তি সহজ হবে। তৃতীয়ত, বিচারকদের আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দিতে হবে। বাংলাদেশে দেখা যায়, অনেক সময় কোনো বিচারক যখন আইনজ্ঞদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন, তখন আইনজীবীরা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন ও তাঁর আদালত বয়কট করেন। এভাবে আইনজীবীরা আদালতকে প্রভাবিত করেন। আইনজীবীদের আদালত বয়কটকে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।
- আইনজীবীদের ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিচারকেরা যেন ঐচ্ছিক ক্ষমতা অপব্যবহার করতে না পারেন, সে ব্যবস্থাও করতে হবে।
- বর্তমানে দেওয়ানি আদালতে আপিল, রিভিউ, রিভিশনসহ বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের যেসব বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোর পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তা অতিরিক্ত এবং তা হ্রাস করা প্রয়োজন।

## ৮.৫ পুলিশি ব্যবস্থার পুনর্গঠন

পুলিশি ব্যবস্থা ন্যায়বিচারের জন্য অপরিহার্য, অথচ এই উপমহাদেশে ব্রিটিশরা আসার অনেক আগে থেকে পুলিশ কর্মকর্তারা অযোগ্য এবং দুর্নীতিবাজ ছিলেন। এ দেশে দারোগাদের দুর্নীতি ছিল কিংবদন্তিখ্যাত। ব্রিটিশরা খরচ বাড়ানোর ভয়ে এ পুলিশি ব্যবস্থাতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন করেনি। তারা সনাতন পুলিশের ওপর কিছু ব্রিটিশ অফিসার বসিয়ে দেয়। এর ফলে কম খরচে পুলিশ চালানোর উদ্দেশ্য সাধিত হলেও জনগণের মঙ্গল নিশ্চিত করা যায়নি। ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় পুলিশকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে পুলিশের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু বেশির ভাগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই ইউরোপীয় বা সমপর্যায়ের ভারতীয়রা হতেন, সেহেতু স্থানীয় পুলিশের তদারকিতে কোনো অসুবিধা হতো না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা মামলার

বিচার করতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং মফস্বল অঞ্চলে নিয়মিত সফর করতেন। এর ফলে পুলিশ কোনো বড় ধরনের খারাপ কাজ করলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন।

কিন্তু দেশের আইনজীবীরা এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করতেন, নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচারের চেয়ে ব্রিটিশ শাসনকে রক্ষা করার ব্যাপারে অধিক উৎসাহী। সুতরাং তাঁদের পক্ষে ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। তাই তাঁরা অধস্তন ফৌজদারি আদালতকে নির্বাহী বিভাগের বদলে বিচার বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করার দাবি জানান।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা হয়েছে। এর ফলে লাভবান হয়েছেন আইনজীবীরা এবং পুলিশ। আইনজীবীরা মনে করেন যে বিচার বিভাগ-নিয়ন্ত্রিত বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করা তাঁদের পক্ষে সহজ। কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে আদৌ আলোচনা হয়নি সেটি হলো, বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ার পর পুলিশের ওপর আর কোনো স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ থাকল না। জাতিসংঘের পুলিশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডেভিড এইচ বেইলি পুলিশের ওপর বাইরের নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> External oversight needs to be independent of government control; guaranteed adequate funding and exclusive in its focus on police. Its oversight should cover two aspects of police performance: (1) effectiveness in advancing public safety, and (2) fairness in operational behaviour.[১৭]

পৃথিবীর অনেকে দেশে স্থানীয় সরকার পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই স্থানীয় পর্যায়ে তাদের বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। তবে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারকে এ ক্ষমতা দিলে সমস্যাও দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন এলাকার প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা। তাঁদের চেলারাই অধিকাংশ অপরাধ করে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এ ক্ষমতা অপব্যবহৃত হতে পারে। অন্যদিকে পুলিশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যদি শুধু পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরের কর্মকর্তাদের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে জনগণ বিচার না-ও পেতে পারেন। এই ক্ষমতা আদালতের পক্ষেও নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, নির্বাহী বিভাগ এই ক্ষমতা আদালতের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে রাজি হবে না। এই পরিস্থিতিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতো একটি পরিদর্শকের পদ প্রতিটি জেলায় সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই পদটি মানবাধিকার কমিশনের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে।

এ ছাড়া পুলিশ বিভাগকে সামগ্রিকভাবে কার্যকর করার জন্য এর পুনর্গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। সারণি-৮.৫-এ পুলিশ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির হার দেখা যাবে।

### সারণি-৮.৫
### বাংলাদেশে পুলিশের দায়েরকৃত শাস্তির হার, ১৯২৬-২০১০

| বছর | পুলিশের দায়েরকৃত মামলায় শাস্তির হার |
|---|---|
| ১৯২৬-২৭ থেকে ১৯৩১-৩২ | |
| ১৯২৬-২৭ | ২৪.০০ |
| ১৯২৭-২৮ | ২৭.০০ |
| ১৯২৮-২৯ | ২৭.০০ |
| ১৯৩০-৩১ | ৩২.০০ |
| ১৯৩১-৩২ | ৩৫.০০ |
| গড় ১৯২৬-২৭ থেকে ১৯৩১-৩২ | ২৯.০০ |
| ২০০১-১০ | |
| ২০০১ | ১৯.৪০ |
| ২০০২ | ২৩.২০ |
| ২০০৩ | ২৫.৪০ |
| ২০০৪ | ২১.০৯ |
| ২০০৫ | ২৪.০৪ |
| ২০০৬ | ২৩.০৯ |
| ২০০৭ | ২২.৬৬ |
| ২০০৮ | ২৩.৭৩ |
| ২০০৯ | ২৬.২১ |
| ২০১০ | ২৪.৬৯ |
| গড় ২০০১-১০ | ২৩.৩৫ |

উৎস : (1) For the period 1927-27 to 1930-31 (Hussain Zillur Rahman, 'Landed Property and the Dynamic Instability,' unpublished Ph. D. Dissertation, Victoria University of Manchester, October, 1986).
(2) For the period 2002-2010 (PPRC, 'Bangladesh 2013: Governance Trends and Perceptions', 2014).

উপরিউক্ত শাস্তির হার পুলিশের দাখিলকৃত চার্জশিটের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে। পুলিশে মামলা দেওয়া হলেই তার ওপর চার্জশিট হয় না। পুলিশে প্রথম FIR জমা দিতে হয়, এই FIR-এর ওপর তদন্ত করে পুলিশ অনেক মামলাকে মিথ্যা মামলা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করে। এরপর যেসব মামলায় যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে, সেসব ক্ষেত্রে চার্জশিট দেয়, সুতরাং চার্জশিটের ওপর দেওয়া ২৩.৩৫ শতাংশ শাস্তির হার মোট দায়েরকৃত মামলার ওপর শাস্তির হার নয়। এই হার এর অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কম

হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে পুলিশের কাছে যে নালিশ হয়, তার মাত্র ১২ শতাংশ ক্ষেত্রে শাস্তি হয়। ৮৮ শতাংশ ক্ষেত্রে আসামি ছাড়া পেয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে অপরাধপ্রবণতা দেশে অবশ্যই বাড়ছে এবং দেশ অপরাধের অভয়ারণ্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই পুলিশ বিভাগকে পুনর্গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। শুধু পুলিশের সংখ্যা বাড়ালেই হবে না, পুলিশের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। বর্তমানে পুলিশ নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক কর্তব্য সর্বাগ্রে নিয়োজিত হয়। এর ফলে আসামিদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশের ক্রমেই কমে আসছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ বিভাগকে পুনর্গঠন করতে হবে।

## ৮.৬ সংস্কার : কী ও কীভাবে?

আদিমকাল থেকে বিশ্বের সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে। কিন্তু কোথাও ন্যায়বিচার সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীর সর্বত্র ঠাট্টা করে বলা হয় যে বিচারব্যবস্থা হলো এমন একটি জাল, যাতে ছোট ছোট পতেঙ্গরা আটকে যায়, আর বড় বড় পতেঙ্গরা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ যারা দুর্বল, তাদেরই শাস্তি হয়; যারা প্রতিপত্তিশীল, তারা ছাড়া পেয়ে যায়। বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থাতেও তাই অনেক ত্রুটি রয়েছে। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিচারব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার একটি তফাত রয়েছে। বাংলাদেশের বাইরের দেশগুলোতে বিচারব্যবস্থায় কোনো কোনো উপাদান শক্তিশালী আবার কোনো কোনো উপাদান দুর্বল। বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থার প্রায় সব উপাদানই অত্যন্ত দুর্বল। এখানে আইনসমূহের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, বিচারপদ্ধতির উপযোগিতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, বিচারকদের যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আইনজীবীদের দুর্নীতি প্রায় প্রবাদপ্রতিম পর্যায়ে উন্নীত। বিচার বিভাগের সহায়ক কর্মকর্তারা দুর্নীতির একটি বড় উৎস। এখানে সাক্ষীরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, এখানে অধিকাংশ মামলা অসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে দলিলপত্র অনেক ক্ষেত্রে জাল, এখানে ধনী ব্যক্তিরা আদালতের রায় অর্থ খরচ করে কিনতে পারেন। অথচ অসহায় দরিদ্রদের জন্য বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে। এই ব্যবস্থার সংস্কার অত্যন্ত জটিল এবং এ সংস্কার একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। কাজেই এ সংস্কার অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশে সিভিল সমাজের বিশ্বাস যে স্বাধীন ও যোগ্য বিচারপতি নিয়োগ করলেই এ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। উপযুক্ত বিচারপতিরা নেতৃত্ব দিয়ে

বিচার সংস্কার এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই উক্তির পক্ষে কিছু যুক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু এটি সর্বাংশে সত্য নয়। পৃথিবীর কোথাও সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচারপতি নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে আপাতদৃষ্টিতে পক্ষপাতদুষ্ট বিচারপতিরাও বিচারকের আসনে বসে স্বাধীন হয়ে যেতে পারেন। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি আর্ল ওয়ারেনের (Earl Warrel) অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল রিপাবলিকান দলের সদস্য। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হওয়ার আগে তিনি রক্ষণশীল রিপাবলিকান দলের গভর্নররূপে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে তিন মেয়াদে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন করেন এবং হেরে যান। প্রেসিডেন্ট আইজেন আওয়ার যখন তাঁকে বিচারপতি নিয়োগ করেছিলেন, তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল, তিনি হবেন একজন রক্ষণশীল বিচারপতি। অথচ যে ১৬ বছর (১৯৫৩-৬৯ সাল) ওয়ারেন প্রধান বিচারপতি পদে ছিলেন, সেই ১৬ বছর মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে সবচেয়ে উদার আদালত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ওয়ারেনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে নিযুক্ত বিচারপতিরা তাঁদের আগের ধ্যানধারণায় বন্দী হয়ে না-ও থাকতে পারেন, বিচারপতিদের ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটে। তাই যেটা নিশ্চিত করতে হবে সেটা হলো বিচারপতির যোগ্যতা। কিন্তু বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর মতামত বিচারপতি হওয়ার পূর্ববিশ্বাসে অটল থাকবে, এ ধরনের ধারণা ভুল। তাই বিচারপতি নিয়োগে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া উচিত তাঁদের যোগ্যতার ওপর। বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগে যোগ্যতা সঠিকভাবে যাচাই করা হয় কি না, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। দেখা গেছে যে আইনের ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ আদালতে এক ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি প্রত্যেক বিচারক পদের জন্য তিনজন করে প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে। সরকার এই তিনজন মনোনীত প্রার্থীর মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করে জাতীয় সংসদের আইন মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির কাছে সুপারিশ করবে। স্থায়ী কমিটি মনোনীত প্রার্থীর ওপর শুনানির ব্যবস্থা করবে। এই শুনানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, যদি বিরোধী দল এই শুনানিতে অংশগ্রহণ করে, তাহলে মনোনীত প্রার্থীর

অযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নসমূহ শুনানিতে প্রকাশিত হবে। এর ফলে সরকার মনোনয়নের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

২. বর্তমানে হাইকোর্টে দুই ধরনের ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়: ১. বিচার বিভাগে কর্মরত জ্যেষ্ঠতম জেলা জজ এবং ২. সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আইনজীবীদের মধ্য থেকে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে কোনো বিধিনিষেধ নেই। এর ফলে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক অযোগ্য প্রার্থীও বিচারক নিযুক্ত হতে পারেন। নিম্নতম পর্যায়ে যাঁরা বিচারক হিসেবে যোগ দেন, শুধু তাঁদের মধ্য থেকেই সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ করলে বিচারকদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যাঁরা আইনজীবী, তাঁদের মধ্যে অনেক ধরনের আইনের বিশেষজ্ঞ থাকেন। এ ধরনের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করলে আদালত শক্তিশালী হতে পারে। উপরন্তু যাঁরা মেধাবী আইনজীবী, তাঁরা নিম্নতম পর্যায়ে বিচারক পদে নিয়োগ পেতে আগ্রহী হন না। ব্রিটিশ আমলে আইনজীবী ও নিম্নতম পর্যায়ে যোগদানকারী বিচারক ছাড়াও আরেকটি উৎস থেকে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ করা হতো। ব্রিটিশ আমলে অতিরিক্ত জেলা জজ পর্যায়ে আইনজীবীদের মধ্য থেকে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হতো। তাঁরা দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে অনেকেই হাইকোর্টে নিয়োগ লাভ করতেন। যেহেতু উচ্চতর পদে দ্রুত পদোন্নতির সুবিধাসহ নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল, সে জন্য উচ্চতর ডিগ্রিধারী মেধাবী আইনজীবীরা এ পদে যোগ দিতেন। এ ধরনের নিয়োগপদ্ধতি প্রবর্তন করলে সুপ্রিম কোর্টে আইনজ্ঞ নিয়োগের পরিমাণ কমানো যেতে পারে।

শুধু বিচারপতি নিয়োগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করাই যথেষ্ট নয়, বিচারকদের অভিসংশনের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ করতে হবে। বর্তমানে সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিসংশনের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা প্রত্যাহার করে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান করা যেতে পারে। সম্প্রতি আরেকটি সমাধান আদালত থেকে তুলে ধরা হচ্ছে। এই সমাধানটি হলো, বিচারপতির পদ বাড়াতে হবে। প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই বিচারপতির পদ বাড়াতে হবে। তবে তার আগে বর্তমানে বিচার বিভাগের যে সম্প্রসারণ ঘটেছে, তার কী ফলাফল হয়েছে, সেটা বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করার জন্য সাড়ে ৭০০ নতুন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে এবং হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এরপরও মামলা নিষ্পত্তির

হার মোটেও বাড়েনি, অনেক ক্ষেত্রে কমে গেছে। সুতরাং বিচারকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কাজের মূল্যায়ন করা হয় না। অনুমান করা হয় যে তাঁরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিযুক্ত এবং তাঁরা নিজেরাই নিজেদের কাজের তদারক করেন। পক্ষান্তরে তাঁদের মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হলে তাঁদের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হতে পারে। এ অবস্থায় উচ্চ আদালতে বিচারকদের মূল্যায়ন না করা হলেও সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রতিবছর বিচার বিভাগের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা উচিত, যাতে কোন বিচারকের আদালতে কতগুলো মামলা আছে, কতগুলো মামলা কত বছর ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে, কতগুলো মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে, কতগুলো মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু রায় লেখা হয়নি ইত্যাদি তথ্য থাকবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ ও সাধারণ মানুষ বিচারকদের কাজের মূল্যায়ন করতে পারবে। উপরন্তু নিম্ন পর্যায়ের বিচারকদের কাজের মূল্যায়নের জন্য একটি পদ্ধতি চালু করতে হবে।
২. নিম্ন আদালতের দুর্নীতি সম্পর্কে অনেক অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে চালু রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করতেন। এর ফলে ম্যাজিস্ট্রেটরা সজাগ থাকতেন। উচ্চ পর্যায়ের বিচারকেরা নিজেদের আদালত নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে তাঁদের পক্ষে নিম্ন আদালত নিয়মিত পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। এ জন্য জেলা পর্যায়ে এবং সুপ্রিম কোর্ট পর্যায়ে উপযুক্তসংখ্যক পরিদর্শনকারী বিচারকের পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং যথোপযুক্ত পরিদর্শন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৩. আদালতে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার একটি বড় উৎস হলো বর্তমানে প্রচলিত পেশকার-ব্যবস্থা। পেশকার-ব্যবস্থার সংস্কার করার জন্য আদালতে কম্পিউটারায়িত ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং পেশকার পদে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে হবে।

আইনজীবীরা বিচারব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশের বাইরে অন্যান্য দেশে আইনজ্ঞরা ন্যায়বিচারের স্বার্থে সংস্কার সমর্থন করেন। বাংলাদেশে আইনজ্ঞরা ন্যায়বিচারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বিচারব্যবস্থায় তাঁরাই (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) দুর্নীতির প্রধান উৎস। তাঁরা মিথ্যা মামলা করতে উৎসাহ

দেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করে ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের জাল-জালিয়াতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ প্রসঙ্গে একটি গবেষণা প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে:

> Defense lawyears often engage in unethical practices to obtain bail for their clients. These involve bribing the judge directly or through members of his support staff like his peshkar, supplying fake documents to the courts, or by bringing to bear other forms of pressure on the presiding judge and There have been allegations of the prosecutors putting up a weak defense opposing bail in exchange of obtaining financial favours from the accused. (PPRC, 2007)[১৮]

অথচ কমন ল আইনের আদলে বাংলাদেশে যে আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে আইনজীবীরাই বিচারকাজের পরিচালক। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত সংস্কারসমূহ বিবেচনা করতে হবে:

১. বাংলাদেশে বর্তমানে আদালতের ক্ষমতা আইনজীবীদের চেয়ে কম। বাংলাদেশে সিভিল ল ব্যবস্থার অনুকরণে ইন্‌কুইজোটারিয়াল ব্যবস্থা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চালু করা যেতে পারে। উপরন্তু সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তনেরও প্রয়োজন রয়েছে।

২. বর্তমানে দুর্নীতিবাজ আইনজীবীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আইনজীবীদের নির্বাচিত বার কাউন্সিলের ওপর। যেহেতু বার কাউন্সিল আইনজীবীদের দ্বারাই নির্বাচিত হয়, সেহেতু তারা দোষী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে সব সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় না। এই ক্ষেত্রে বার কাউন্সিল ছাড়াও বিচারকদের কিছু ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে।

৩. দুর্নীতিবাজ আইনজীবীরা আদালতকে চাপে রাখার চেষ্টা করেন। আদালত তাঁদের বক্তব্য না শুনলে আদালত বয়কট করেন এবং গণমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে আদালতকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। আইনজীবীদের আদালত বর্জনকে বেআইনি ঘোষণা করা যেতে পারে। এবং আইনজীবীদের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৪. আইনজীবীরা মুলতবি আদেশ, নিষেধাজ্ঞাসহ বিভিন্ন ধরনের আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি ঠেকিয়ে রাখেন। এসব অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

**পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কার:** ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে পুলিশি ব্যবস্থার কার্যকারিতা ওপর।

পৃথিবীর সব দেশেই পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করায় সমস্যা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে Bayley যথার্থই লিখেছেন :

> Police must be accountable to people outside their organisations who are specifically designated and empowered to regulate police activity.[১৯]

ব্রিটিশ শাসকেরা পুলিশের ওপর তদারকের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর সহকর্মীরা বিচারব্যবস্থা ছাড়াও খাজনা আদায়ের জন্য, স্থানীয় সরকারের তত্ত্বাবধানের জন্য এবং অন্যান্য সরকারি কাজে গ্রামাঞ্চল সফর করতেন। তাঁদের পক্ষে পুলিশের প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করার সুযোগ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। জেলা জজ মূলত আদালতে বিচার করেন। তিনি জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করলে তাঁর বিচারকাজ বিঘ্নিত হতে পারে। কাজেই জেলা জজদের পক্ষে এই তদারক করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে পুলিশের বাইরের তদারক ব্যবস্থা এখন মোটেও নেই, পুলিশই তদারক করে, বাইরের কোনো সংস্থা নয়। এ অবস্থায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হওয়া যুক্তিসংগত :

১. পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাইরের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা থাকা উচিত। এ কাজ জেলা জজদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এ কাজের দায়িত্ব মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। মানবাধিকার কমিশন প্রতিটি জেলায় একজন উপযুক্ত পরিদর্শক নিয়োগ করতে পারে, যিনি পুলিশের কাজে স্থানীয়ভাবে তদারক করতে পারেন।
২. নিম্নস্তরে নির্বাহী ব্যবস্থা থেকে বিচারব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র করার ফলে নতুন করে পুলিশ কোড (Code) ও জেল কোড প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থায় গরিবদের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত। পক্ষান্তরে যাদের বিত্ত আছে, তারা বিচারব্যবস্থাকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। দরিদ্র মানুষের বিচারব্যবস্থার অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে নিম্নরূপ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা বা Alternative Dispute Resolution। বাংলাদেশে কোনো কোনো অঞ্চলে গ্রামের সালিস আদালত আনুষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। যেসব স্থানে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্রদের সংগঠন রয়েছে, সেসব স্থানে দরিদ্ররা সুফল পাচ্ছে। কাজেই শুধু বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা চালু করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে গরিবদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. বর্তমানে স্থানীয় সরকারের আওতায় যেসব সালিস আদালত বা Conciliation Court প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেগুলোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিতে হবে।

## পাদটীকা

১. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১৪। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী।* ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। পৃষ্ঠা ১৯০।

২. World Bank. 2005. *World Development Indicators 2005.* Washington D.C.

৩. World Bank. 2009. *World Development Indicators 2009.* Washington D.C.

৪. Transparency International, Bangladesh (TIB). 2007. *Corruption Database.* Dhaka.

৫. World Bank. 2001. Appraisal Document of Legal and Judicial Capacity Building Project (Mimeo). Washington D.C.

৬. BRAC Institute of Governance and Development, 2015. *The State of Governance Bangladesh 2015.* Dhaka.

৭. Avinash K. Dixit. 2004. *Lawlessness and Economics.* Princeton: Princeton University Press.

৮. বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (পুনর্মুদ্রণ) ১৯৯১। *মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। বঙ্কিম রচনাবলী।* দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদনা: সুবোধ চক্রবর্তী। কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়।

৯. PPRC (Power and Participation Research Center). 2007. *Unbundling Governance.* Dhaka, 69-73.

১০. Nizam Ahmed. 2014. *Forty Years of Public Administration and Governance in Bangladesh.* Dhaka: University Press Ltd.

১১. Kautilya. 1992. *Arthasasatra.* Translated by L.N. Rangarajan. New Delhi: Penguin Books India.

১২. Encyclopedia Britannica.1980. 'Common Law' in Macropedia. 15th edition. Chicago and London.

১৩. Juan Carlos Botero, Rafael La Porta and Florence Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer and Alexander Voloks. 2003. 'Judicial Reform' *World Bank Research Observer.* 18(1), 61-85.

১৪. Bernard S. Cohn. 1987. *Anthropologists Among Historians and Other Essays.* Delhi: Oxford University Press.

১৫. Spear, Perceival. 1987. *Twilight of the Mughals.* Cambridge: Cambridge University Press.

১৬. Mirza Hasan and Tariq Omar Ali. 2006. 'Emergence and Consolidatiob of Informal Justice Institutions in Bangladesh: A Study of MLAA Intervention Promoting Village Court and Arbitration Council' (mimeo). Dhaka.

১৭. David H. Bayley. 2006. *Changing The Guard: Developing Democratic Police Abroad.* New York: Oxford University Press.

১৮. PPRC. 2007. প্রাগুক্ত।

১৯. David H. Balley. 2006. প্রাগুক্ত।

৯

# আমলাতন্ত্র : গ্রেশাম বিধির মতো ব্যামো

## ৯.১ আমলাতন্ত্র ও গ্রেশাম বিধির মতো ব্যামো

আমলাতন্ত্র নিয়ে বিতর্কের শুরু কমপক্ষে আড়াই হাজার বছর আগে। এ বিতর্ক শুরু হয়েছিল চীনে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস আমলাতন্ত্রকে ধ্রুবতারার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন, এ তারকা স্থির এবং সব তারকাই এর নির্দেশে চলে। আরেক চীনা পয়গম্বর লাওজু কনফুসিয়াসের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেন। কনফুসিয়াস মনে করতেন যে আমলাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হলে জনগণ সমৃদ্ধ হবে। লাওজু বলতেন, যারা জ্ঞানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়, তারা জনগণের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

আমলাতন্ত্র নিয়ে এ বিতর্ক এখনো চলছে। প্রাচীনকালে আমলাদের যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি ছিল রাজার প্রতি আনুগত্য। আধুনিক আমলাতন্ত্রে আমলাদের শক্তি হলো তাঁদের পেশাগত দক্ষতা। আধুনিক আমলাতন্ত্রের ধারণার প্রধান প্রবক্তা হলেন জার্মান দার্শনিক ম্যাক্স ওয়েবার। তাঁর মতে, আমলাতন্ত্র হচ্ছে অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে স্থায়িত্বে অনুপুঙ্খবোধ সম্পন্ন ও নির্ভরশীলতার দিক থেকে অনেক শ্রেয়। আজকের তাত্ত্বিকদের অনেকেই ম্যাক্স ওয়েবারের সঙ্গে একমত নন। ডেভিড অজবর্ন ও টেড গেবলার লিখেছেন, ম্যাক্স ওয়েবারের আমলাতান্ত্রিক আদল একটি কম পরিবর্তনশীল সমাজের জন্য গড়ে উঠেছিল, যেখানে পরিবর্তন আসত আস্তে আস্তে। এ ধারণা গড়ে উঠেছিল সোপানতান্ত্রিক (Hierarchical) সমাজে, যেখানে পিরামিডের চূড়ায় যিনি থাকতেন, শুধু তাঁর কাছেই সব তথ্য জানা ছিল। অজবর্ন ও গ্যাবলার তাই বলছেন, বর্তমান যুগে আমলাতন্ত্র অচল। আমলাতন্ত্র সেসব মানুষের জন্য উপযুক্ত, যেখানে মানুষ হাত

দিয়ে কাজ করে। তাঁদের মতে, যে সমাজের শক্তি উৎপাদনশীলতা, যা মানসিক ক্রীড়াকাণ্ড থেকে উদ্ভূত, সে সমাজের জন্য আমলাতন্ত্র উপযুক্ত নয়।

আজ তাই পৃথিবীতে অনেক ধরনের সরকারকাঠামো গড়ে উঠেছে। অজবর্ন ও গ্যাবলার তাঁদের *Reinventing the Government: How the Entrepreneurship Spirit is Transforming the Public Sector* নামক বইয়ে ১০ ধরনের সরকারের উল্লেখ করেছেন।[১] এগুলো হচ্ছে :

১. অনুঘটক সরকার (Catalytic Government).
২. সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন সরকার (Community-Owned Government).
৩. প্রতিযোগিতামূলক সরকার (Competitive Government).
৪. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত সরকার (Mission-Driven Government).
৫. ফলাফলকেন্দ্রিক সরকার (Result-Oriented Government).
৬. খরিদ্দার পরিচালিত সরকার (Customer-Driven Government).
৭. উদ্যোগী সরকার (Enterprising Government).
৮. পরিবর্তনপ্রত্যাশী সরকার (Anticipatory Government).
৯. বিকেন্দ্রীকৃত সরকার (Decentralized Government).
১০. বাজার পরিচালিত সরকার (Market-Oriented Government).

এই তালিকার বাইরে সোপানতান্ত্রিক সরকার, গণতান্ত্রিক সরকার, একনায়কতান্ত্রিক সরকারের মতো বিভিন্ন চিরাচরিত সরকারি ব্যবস্থা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, সব ধরনের সরকারই বিশেষ পরিবেশে ভালোভাবে কাজ করে, কিন্তু কোনো সরকারই সব পরিবেশের জন্য সর্বোত্তম নয়। তাই দেশে এমন পরিবেশ চাই, যেখানে শুধু এক ধরনের সরকার থাকবে না এবং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সরকার একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে কাজ করবে।

পৃথিবীর সব দেশেই প্রশাসনকে যুগোপযোগী করার জন্য নিয়মিত সংস্কার চলছে এবং নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলো বাংলাদেশ। এখানে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার হচ্ছে না, বরং অনেক বাতিল হয়ে যাওয়া ধারণার বিকৃত প্রয়োগের ওপর শাসনব্যবস্থা চলছে। পৃথিবীর কোনো দেশেই শাসনব্যবস্থা নিখুঁত নয়। কিন্তু বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করা হবে। এই প্রবন্ধটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। বাংলাদেশে আধুনিক অর্থে আমলাতন্ত্র প্রবর্তন করেছিল ব্রিটিশ সরকার। এর আগে আমলাতন্ত্রের ভিত্তি ছিল রাজার প্রতি আনুগত্য। যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের ধারণা প্রবর্তন করে ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রকে পুরোপুরি আধুনিকায়ন করেনি। যে-কারণে এখানে আধুনিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য

সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার জন্য বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় খণ্ডে এই বিশ্লেষণ দেখা যাবে। তৃতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের মূল সমস্যাসমূহ চিহ্নিত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে বাংলাদেশের রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে আমলাতন্ত্রের সংস্কারের লক্ষ্যে একটি দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

## ৯.২ বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র আদৌ নতুন নয়। ২০০০ বছরের বেশি আগে মৌর্য সাম্রাজ্যে আমলাতন্ত্র ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এ এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই আমলাতন্ত্রের দুটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। প্রথমত, এই আমলাতন্ত্র ছিল সোপানতান্ত্রিক। আমলাতান্ত্রিক পিরামিডের চূড়ায় থাকতেন একজন কর্মকর্তা, যাঁকে রাজা বিশ্বাস করতেন। এই কর্মকর্তার বেতন ছিল অনেক বেশি ও ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। নিচের দিকে অনেক কর্মকর্তা ছিলেন, যাঁদের বেতন দেওয়া হতো কম এবং তাঁদের ক্ষমতাও ছিল সীমিত। সব ক্ষমতা ছিল উচ্চ বেতনভুক্ত কর্মচারীদের হাতে। নিচের দিকের কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি, তাই সেখানে কম বেতন দিলে সরকারের অনেক কম খরচ পড়ত। এর ফলে যে বেতন-ব্যবস্থা চালু করা হয়, সেখানে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পদের আধিকারিকদের মধ্যে তফাত ছিল অনেক বড়। সারণি-৯.১-এ অর্থশাস্ত্র-এ বর্ণিত বেতনসমূহের একটি তালিকা দেখা যাবে।

এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রশাসন মূলত অবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাঁরা নিচের দিকের কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের বিশ্বাস করা হতো না এবং তাঁদের বেতনও কম দেওয়া হতো। এখানে সর্বোচ্চ বেতন সর্বনিম্ন বেতনের ৮০০ গুণ ছিল। যাঁকে বেশি বেতন দেওয়া হতো, তাঁকেই বিশ্বাস করা হতো। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের বেতন অদক্ষ শ্রমিকের বেতনের চেয়ে ১৩৩ গুণ বেশি ছিল। এই ব্যবস্থাতে ব্যাপক দুর্নীতি দেখা দেয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এ প্রশাসনের ব্যাপক দুর্নীতির বর্ণনা রয়েছে। কৌটিল্য সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতিকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন: ১. সরকারকে ফাঁকি দেওয়া এবং ২. জনসাধারণের অর্থ তছরুপ করা। কৌটিল্য সরকারি অর্থ আত্মসাতের ৪৮টি পন্থা উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিটি অপরাধের জন্য আলাদা শাস্তি নির্ধারণ করেছেন।

মুসলমান শাসনামলেও এই ব্যবস্থাই অটুট থাকে। প্রথমত, এখানে সোপানতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনধারীদের মধ্যে তফাত সারণি-৯.২-এ দেখা যাবে।

## সারণি-৯.১
## মৌর্য সাম্রাজ্যের বেতনকাঠামো

| গ্রেড | বার্ষিক বেতন (পণে) | পদ |
|---|---|---|
| সর্বোচ্চ পদ | ৪৮০০০ | সেনাপ্রধান ও অমাত্যবর্গ |
| দ্বিতীয় ধাপ | ২৪০০০ | কোষাধ্যক্ষ |
| তৃতীয় ধাপ | ১২০০০ | মন্ত্রিবর্গ, নগরপ্রধান, প্রাদেশিক গভর্নর, নগরের সেনাপ্রধান |
| চতুর্থ ধাপ | ৮০০০ | ম্যাজিস্ট্রেট, ঘোড়া-রথ ইত্যাদির অধিনায়ক |
| পঞ্চম ধাপ | ৪০০০ | হস্তীর বনরক্ষক এবং বনরক্ষক |
| ষষ্ঠ ধাপ | ৩০০০ | রাজপ্রাসাদের রক্ষিতা |
| সপ্তম ধাপ | ২০০০ | সেনাবাহিনী ক্যাম্পের অধিনায়ক |
| অষ্টম ধাপ | ১০০০ | বিভাগীয় প্রধান |
| নবম ধাপ | ৫০০ | হিসাবরক্ষক, করণিক ইত্যাদি |
| দশম ধাপ | ২৫০ | অনিয়মিত গোয়েন্দা |
| একাদশ ধাপ | ১২০ | ভাস্কর ও শিল্পী |
| সর্বনিম্ন ধাপ | ৬০ | শ্রমিক, খনিতে কর্মরত শ্রমিক ইত্যাদি। |

উৎস : L.N. Rangarajan (tr.), *Kautilya's Arthasastra*, New Delhi: Penguin Books, 1992, pp. 289-292.

নিট বেতনের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বেতনের ফারাক ছিল ৪৭৫ গুণ। নিচের দিকের কর্মচারীরা যে বেতন পেতেন, তাতে তাঁদের ঘুষ খাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ঐতিহাসিক এম আতাহার আলী মোগল যুগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি সম্বন্ধে লিখেছেন :

> The nobles expected presents in return for doing everything, even for acts done under imperial orders or in accordance with specified duties of their posts.[২]

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে, মোগল যুগে উচ্চ পদের কর্মচারীরাও উৎকোচ গ্রহণ করতেন। আঞ্চলিক সাহিত্যে নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের দুর্নীতির বর্ণনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মুকুন্দরামের লেখায় দুর্নীতির বর্ণনা রয়েছে। তিনি লিখেছেন,

> 'সরকার হইলা কাল
> খিল জমি লিখে নাল
> বিনা উপকারে খায় ধুতি'

## সারণি-৯.২
## মোগল সাম্রাজ্যে সেনাবাহিনীতে বেতনকাঠামো

| পদ | মনজবদার (কত অশ্বারোহী নিয়ন্ত্রক) | মাসিক স্থূল বেতন | মাসিক নিট বেতন |
|---|---|---|---|
| ১ | ১০০০০ | ৬০০০০ | ২১২৭৪ |
| ৪ | ৫০০০ | ৩০০০০ | ১০৬৩৭ |
| ৪৪ | ১০০০ | ৮২০০ | ৩০১৫.৫ |
| ৫৯ | ১০০ | ৭০০ | ৩১৩ |
| ৬৬ | ১০ | ১০০ | ৪৪.৭ |

উৎস : Abul-Fazl Allami, *The Ain-i-Akbari*, Vol. 1, (trans.), H. Blochman (Delhi: Low Price Publications), 251-58 (numbers in row 2 and 6 column 4 extrapolated from row 3 and 5).

অর্থাৎ রাজস্ব কর্মকর্তা ঘুষ খেয়েও কাজ করছেন না। ব্রিটিশরা এ দেশে আসার পর প্রশাসনে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু ব্রিটিশদের মূল লক্ষ্য সুশাসন ছিল না, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল কোম্পানির জন্য মুনাফা সৃষ্টি করা। তাই তারাও প্রশাসনের ব্যয় কমানোতে আগ্রহী ছিল। নিচের দিকের কর্মকর্তাদের অপ্রতুল বেতন দিলে সরকারের ব্যয় অনেক কমে যায়। সুতরাং বেতনের ক্ষেত্রে মৌর্য যুগ বা মোগল যুগের যে প্রথা ছিল, ব্রিটিশরাও সে ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সারণি-৯.৩-এ ইস্ট ইন্ডিয়া শাসনকালে ভারতে বিভিন্ন পদে বেতনের তফাত দেখা যাবে।

## সারণি-৯.৩
## ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে বেতনকাঠামো

| পদ | ইন্ডিয়ান রুপি |
|---|---|
| ইউরোপিয়ান জজ | ৩০০০০ |
| ইন্ডিয়ান জজ | ১২০০ |
| দারোগা অথবা থানাদার | ৩০০ |
| পুলিশ ক্লার্ক অথবা ডেপুটি দারোগা | ৯৬ |
| জমাদার | ৯৬-১২০ |
| বরকন্দাজ অথবা কনস্টেবল | ৪৮-৬০ |

উৎস : R.C. Dutt, *Economic History of India*, Vol. II, New Delhi: Publications Division, Government of India, 1960: 145-147.

এ সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, একজন ব্রিটিশ জজ একজন দেশি কনস্টেবলের চেয়ে ৬২৫ গুণ বেতন বেশি পেতেন। দারোগাদের বেতন ছিল ইউরোপিয়ান জজদের বেতনের ১০০ ভাগের এক ভাগ। এর ফলে ব্রিটিশ শাসনামলে নিচের পর্যায়ে দুর্নীতি কমেনি। তবে ওপরের পর্যায়ে দুর্নীতি কমে যায়। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ আইসিএস অফিসার হ্যাচ বার্নওয়েল লিখেছেন :

> The third grade, for example, comprised Sub-Inspectors of Police and the Office Clerks and the fourth grade police constables, peons and orderlies. Here a sharp distinction was drawn between outright bribery and 'dasturi' or customary practices. It was tacitly understood that any person making a complaint at a police station would have to pay two rupees for the benefit of the staff thereof, this being the custom... In the same way, the office clerk expected a small tip to speed the progress of any petition or application, the amins (junior surveyors) a payment of one rupee for each holding surveyed and the orderlies, a tip from any respectable person visiting the DM or SDO. The rates of these tips were prescribed by custom.[৩]

ব্রিটিশ প্রশাসনে নিচের পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতি থাকলেও ওপরের পর্যায়ে দুর্নীতি ছিল না। এর একটি কারণ হলো, ব্রিটিশ সরকার এ দেশে ওপরের পর্যায়ে আধুনিক আমলাতন্ত্রের প্রবর্তন করে কিন্তু নিচের পর্যায়ে এ দেশের চিরাচরিত আমলাতন্ত্রটি বহাল রাখে। ব্রিটিশ শাসনামলে উচ্চ পর্যায়ে প্রধানত ব্রিটিশদের নিয়োগ দেওয়া হতো। প্রথম দিকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নিয়োগ হতো না, তবু যেসব ব্যক্তিকে মনোনয়নের ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে গ্রহণ করা হয়, তাঁদের বেশির ভাগই অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ব্রিটিশ ও পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের চাকরি দেওয়া হয়। তাঁরা একদিকে অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন, অন্যদিকে তাঁদের বেতনের হার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। শুধু ভারতের তুলনায় নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায়ও এই বেতনের হার ছিল অত্যন্ত লোভনীয়।[৪]

ব্রিটিশ শাসন এ দেশে সর্বত্র একটি আধুনিক আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করেনি। তারা ওপরের দিকে আধুনিক আমলাতন্ত্র প্রবর্তন করেছে আর নিচের দিকে এ দেশের চিরাচরিত আমলাতন্ত্র বজায় রেখেছে। এর ফলে এখানে আধুনিক অর্থে আমলাতন্ত্র গড়ে উঠতে পারেনি। এটা যে শুধু ভারতেই হয়েছে তা নয়, পৃথিবীর বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে আধুনিক আমলাতন্ত্রের অনুকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারে আধুনিক আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র আর পশ্চিমা দেশগুলোর আমলাতন্ত্রের মধ্যে কোনো তফাত নেই। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর আমলাতন্ত্র পশ্চিমা আমলাতন্ত্রের সমরূপ অনুকরণ (isomorphic mimicry)। আমরা আগেই বলেছি

(সপ্তম অধ্যায়ে), এই সমরূপ অনুকরণের ধারণা বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞান থেকে নেওয়া হয়েছে। জীববিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, অনেক সময় কোনো কোনো প্রাণী তাদের আত্মরক্ষার জন্য তাদের চেয়ে দুর্ধর্ষ প্রাণীকে অনুকরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো মাছি মৌমাছির মতো আকার ধারণ করে। যদিও মৌমাছির মতো কোনো বিষাক্ত উপাদান এদের দেহে নেই। কোথাও কোথাও বিষ নেই, এ ধরনের সাপ নীল রঙের আকার ধারণ করে, যাতে মনে হয় এদের মধ্যে বিষ রয়েছে এবং আক্রমণকারীরা ভয়ে পিছিয়ে যায়। সমরূপ অনুকরণের এই ধারণাটিকে প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে DeMaggio এবং Powell লিখেছেন :

> Isometric mimicry is an organizational strategy in which organizations attempt to gain legitimacy by appearing to be like other organizations with legitimacy in the organization domain.[৫]

ভারতে আধুনিক আমলাতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য দুটি পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। প্রথম পরিবর্তন হলো, সব ধরনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথোপযুক্ত বেতন প্রদান। কিন্তু নিচের দিকের বেতন বাড়ালে সরকারের ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে। এ দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্যিক কোম্পানি। এদের মূল লক্ষ্য ছিল কোম্পানির জন্য সর্বোচ্চ হারে মুনাফা অর্জন। তাই তারা নিম্ন পর্যায়ে বেতন বাড়ানো থেকে বিরত থাকে। দ্বিতীয়ত, দেশের প্রশাসন তখন নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের অবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শুধু স্বল্পসংখ্যক বিশ্বাসভাজন কর্মকর্তাদের দেওয়া হতো। দেশে আধুনিক অর্থে আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রশাসনকে অবিশ্বাসের বদলে বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হতো। এর অর্থ হলো, সর্বনিম্ন পর্যায়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা। ব্রিটিশদের পক্ষে মূল কাঠামো পরিবর্তন ছাড়া এ সংস্কার সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশরা আধুনিক আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুধু উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের এবং তাদের উচ্চ হারে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করে। কাজেই ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে যে আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তা আধুনিক আমলাতন্ত্র নয়, তা ছিল আধুনিক ও ভারতের চিরাচরিত আমলাতন্ত্রের এক সংমিশ্রণ। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে পাকিস্তানে আমলাতন্ত্রের দুটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম সমস্যা হলো ভারত বিভক্তির ফলে প্রশাসনে যে শূন্যতা দেখা দেয়, তা পূরণ করা। আর দ্বিতীয় সমস্যা হলো আধুনিক আমলাতন্ত্র প্রবর্তন করে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনকে ঢেলে সাজানো। পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কেরা প্রথম সমস্যাটিতেই নজর দেন এবং দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাটিকে এড়িয়ে যান।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের আদলে প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। কোনো পরিবর্তন ছাড়াই আইসিএস ব্যবস্থাকে সিএসপি ব্যবস্থা হিসেবে প্রবর্তন করা হয়। অথচ বিশ্বে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের ফলে

পাকিস্তানেও অনেক নতুন বিশেষজ্ঞ আমলার প্রয়োজন পড়ে। আইসিএস ব্যবস্থায় ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা ছিল সংকুচিত। অথচ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে প্রশাসনের মৌল কাঠামো পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পাকিস্তানে প্রশাসনিক সংস্কারের নামে যা ঘটেছে, সেটা হলো দেশে সর্বোচ্চ পদের জন্য বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে লড়াই। এই লড়াইয়ে একদিকে ছিলেন আইসিএসের উত্তরসূরি সিএসপিরা, যাঁরা ছিলেন শুধুই প্রশাসনে অভিজ্ঞ। আরেক দিকে ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তারা, যাঁদের মধ্যে অনেক বিশেষজ্ঞও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে তাঁদের সবাই বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে অনেক ক্যাডারভুক্ত সাধারণ প্রশাসকও ছিলেন। পাকিস্তানে এই দ্বন্দ্বের নিরসন করা সম্ভব হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস টিকে ছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান তুলে দেওয়া হয় এবং একীভূত সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে পুরোনো অনেক সার্ভিস বিলুপ্ত হয় এবং নতুন অনেক সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালে ২৮টি ক্যাডার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৮৯ সালে সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ পদসমূহ পরিচালনার জন্য ২৮টি ক্যাডার থেকে সংগৃহীত যোগ্যতম কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সিনিয়র সার্ভিসেস পুল গঠিত হয়। আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত সিনিয়র সার্ভিসেস পুল ভেঙে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠনের পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল, দেশে সব ক্যাডারের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। এই ব্যবস্থায় তাই সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ পদগুলোতে নির্বাচনের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত ছিল পদের জন্য যোগ্যতা। কোন ক্যাডারের সদস্য, সেটা বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান আমলে সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠতম পদগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ সিএসপিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ ব্যাপারে অন্যান্য ক্যাডারের বক্তব্য ছিল, এই সংরক্ষণের ফলে তাদের যোগ্যতম কর্মকর্তাদেরও পদোন্নতি সম্ভব হচ্ছে না, আর তাই এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া উচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে যে পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তাতে উপসচিবের ৭৫ শতাংশ পদ এবং যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিবের ৭০ শতাংশ পদ সিএসপিদের উত্তরসূরি বিসিএস অ্যাডমিন ক্যাডারের সদস্যদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। শুধু সচিব পদে কোনো কোটা নেই। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উপসচিব পদে বিসিএস ক্যাডারে ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণকে বিধিসম্মত ঘোষণা করা হয়েছে। তবে যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে সংরক্ষণ তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, উপসচিব পদের কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা অনুসারে এসব পদে পদোন্নতি দিতে হবে। এর ফলে বর্তমানে আইনত বিসিএস অ্যাডমিন ক্যাডারের সদস্যরা পাকিস্তানের সিএসপিদের চেয়ে বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। বাস্তবে এ পরিস্থিতি

আরও করুণ। ২০১৩ সালের এক সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, ৮৭ শতাংশ সচিব, ৮২ শতাংশ অতিরিক্ত ও যুগ্ম সচিব এবং ৮৩ শতাংশ উপসচিব বিসিএস অ্যাডমিন ক্যাডারের সদস্য।[৬] সংস্কার করে বাংলাদেশে অন্যান্য ক্যাডারের জন্য সমান সুযোগ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে সংস্কারের পক্ষে আরেকটি বড় যুক্তি ছিল, প্রশাসনে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের সীমিত ভূমিকা। সুতরাং দেশে এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেখানে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারবেন। অথচ বাংলাদেশে বর্তমানে যে প্রশাসনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, সেখানে বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা আগের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। সরকারি পদে প্রধানত দুভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় : (১) ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ এবং (২) যোগ্যতাভিত্তিক পদে নিয়োগ। ক্যাডার সার্ভিসে যোগ্যতার ওপর জোর দেওয়া হয় না। জোর দেওয়া হয় ব্যক্তিত্বের ওপরে। একজন ব্যক্তি যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও নেতৃত্বের গুণাবলির অধিকারী হন, তাহলে তাঁর পক্ষে যেকোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। পক্ষান্তরে পদভিত্তিক নিয়োগে জোর দেওয়া হয় ব্যক্তির অর্জিত বিশেষ জ্ঞানের ওপর, যাতে ওই ব্যক্তি নিয়োগের পরই তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন। প্রশাসনে বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা প্রসারিত করতে হলে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ওপর জোর দেওয়া উচিত। বাংলাদেশে ক্যাডারভিত্তিক নিয়োগের ফলে যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব কমে যায়। এর ফলে নিম্নতম যোগ্যতাধারীরা সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ পদের দাবিদার হয়ে দাঁড়ান। তাতে অনেক ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। দু-একটি উদাহরণ বিবেচনা করলে এই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে অর্থনৈতিক উপদেষ্টার একটি অনুবিভাগ রয়েছে। এই দপ্তরটি সারা বছর অর্থনীতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং বাজেট পেশ করার সময় জাতীয় সংসদে জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থনীতিবিদেরা নিযুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশে বিসিএস (পরিকল্পনা) নামে একটি ক্যাডার গঠন করা হয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা দপ্তরের সব পদ ওই ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কাজ ব্যাপক। যদিও বেশির ভাগ পদেই অর্থনীতির জ্ঞানের প্রয়োজন, তবু সেখানে প্রকৌশল, সমাজবিজ্ঞান, স্থাপত্য ইত্যাদি অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। বিসিএস পরিকল্পনা ক্যাডারে তাই শিক্ষাগত যোগ্যতা শুধু অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়, অনেক বিষয় এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ক্যাডার প্রতিষ্ঠা করার পর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদ এই ক্যাডারের একটি জ্যেষ্ঠ পদে পরিণত হয়। যেহেতু ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিচের পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে কর্মকর্তার পদোন্নতি দিতে হয়, সেহেতু এই পদে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৌশলী, সমাজতত্ত্ববিদ বা এ ধরনের

যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও পদোন্নতি দিতে হয়। অনুরূপ পরিস্থিতি পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগেও দেখা যায়। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হওয়া উচিত একজন অর্থনীতিবিদের, অথচ দেখা যাচ্ছে যে অর্থনীতিতে আদৌ কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই, এমন ব্যক্তিরাই এমন পদে পদোন্নতি পাচ্ছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি সব বিশেষজ্ঞ ক্যাডারেই দেখা যাচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ পদসমূহ শূন্য হলে এই পদে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতম প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হতো। এখন এ সমস্ত নিয়োগ ক্যাডার সদস্যদের মধ্য থেকে দেওয়া হয়। যার ফলে যোগ্যতম প্রার্থী নন, জ্যেষ্ঠতম প্রার্থী পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। এ ধরনের পদে ক্যাডারভিত্তিক নিয়োগ কখনো কাঙ্ক্ষিত সুফল দিতে পারে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে, সে ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে যে ব্যবস্থা ছিল, তার চেয়েও দুর্বল। এ ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞদের জ্যেষ্ঠ পদগুলো বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়, ক্যাডারের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পূরণ করা হয়ে থাকে।

## ৯.৩ বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের মূল সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের প্রশাসনের আদলই শুধু ত্রুটিপূর্ণ নয়, এখানে প্রশাসনে যে সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করা হয়, তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভেঙে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

### ক. নিয়োগ

সরকারি চাকরিতে যথোপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একবার কাউকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হলে তাঁকে বাদ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। এখানে যেসব সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তার মধ্যে নিচের অভিযোগগুলো বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

**১. নিয়োগে দুর্নীতি :** ২০০৬ সালে *The State of Governance in Bangladesh 2006* বইয়ে সরকারে নিয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, 'A review of the literature and the media highlights the presence of corruption and the inclusion of political considerations in the recruitment system.'[৭] বিশেষ করে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। এ প্রসঙ্গে টিআইবি বাংলাদেশ সংগৃহীত উপাত্তসমূহ সারণি-৯.৪-এ দেখা যাবে।

| | | |
|---|---|---|
| বাইরে থেকে প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ করা | ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা | ০.১ থেকে ০.২ মাস |
| পরীক্ষার হলে উপস্থিত না হয়ে খাতা দাখিল করা | ক্ষমতাসীন দলের হাইকমান্ডের নির্দেশ | - |
| প্রকাশের আগে ফল জানা | ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা | ০.৫ থেকে ০.১ মাস |
| মৌখিক পরীক্ষায় ভালো নম্বরের জন্য চুক্তি | ৩ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকা | ৩০ থেকে ৫০ মাস |
| ভালো ক্যাডারের চাকরির জন্য চুক্তি | (ক) প্রশাসনিক/পুলিশ ক্যাডার- ৫ থেকে ৭ লাখ (খ) বহিঃশুল্ক/আয়কর ৮ থেকে ১০ লাখ (গ) পেশাদার ক্যাডার ২ থেকে ৩ লাখ | (ক) ৫০ থেকে ৭০ মাস (খ) ৮০ থেকে ১০০ মাস (গ) ২০ থেকে ৩০ মাস |
| ব্যর্থ প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দেওয়া | (ক) প্রশাসনিক/পুলিশ ক্যাডার ৮ থেকে ১০ লাখ (খ) বহিঃশুল্ক/আয়কর ১০ থেকে ১২ লাখ (গ) পেশাগত ক্যাডার ৩ থেকে ৫ লাখ | (ক) ৮০ থেকে ১০০ মাস (খ) ১০০ থেকে ১২০ মাস (গ) ৩০ থেকে ৫০ মাস |

| যাঁরা বিশেষজ্ঞ নন, তাঁদের জন্য পাঠ্যক্রম | মোট নম্বর এবং সামগ্রিক পরীক্ষায় এর গুরুত্ব (শতকরা হারে) | কারিগরি ক্যাডারের পাঠ্যক্রম | মোট নম্বর এবং সামগ্রিক পরীক্ষায় এর গুরুত্ব (শতকরা হারে) |
|---|---|---|---|
| বাংলা | ২০০ (১৮.১৮ শতাংশ) | বাংলা | ১০০ (৯.৯ শতাংশ) |
| ইংরেজি | ২০০ (১৮.১৮ শতাংশ) | ইংরেজি | ২০০ (১৮.১৮ শতাংশ) |
| বাংলাদেশ বিষয়াবলি | ২০০ (১৮.১৮ শতাংশ) | বাংলাদেশ বিষয়াবলি | ২০০ (১৮.১৮ শতাংশ) |
| আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি | ১০০ (৯.০৯ শতাংশ) | আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি | ১০০ (৯.০৯ শতাংশ) |
| অঙ্ক এবং মানসিক দক্ষতা | ১০০ (৯.০৯ শতাংশ) | অঙ্ক এবং মানসিক দক্ষতা | ১০০ (৯.০৯ শতাংশ) |
| প্রাত্যহিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১০০ (৯.০৯ শতাংশ) | - | - |

এ ধরনের ব্যাপক দুর্নীতি সম্ভব হয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দুর্বলতার ফলে। অভিযোগ করা হচ্ছে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানকে দলীয় বিবেচনায় মনোনয়ন দেওয়া হয়। এর ফলে নিয়োগ-প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে গেছে।

### খ. অনুপযুক্ত পরীক্ষাব্যবস্থা

বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-ব্যবস্থা একটি ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণাটি হলো যে বিসিএসে সব ক্যাডার সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সবাইকে একই পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে। এ ধারণা ভুল এবং এ ধারণার ফলে যে গণপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে ২ লাখের বেশি প্রার্থী উপস্থিত হয়। এত প্রার্থীর একই সঙ্গে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এক পরীক্ষার মাধ্যমে যে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাতে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের পরীক্ষা সম্ভব হয় না। সারণি-৯.৫-এ বিসিএস পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ ক্যাডার ও অবিশেষজ্ঞ ক্যাডারের পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখা যাবে।

পৃথিবীর আর কোনো দেশে বিশেষজ্ঞ নিয়োগে এ ধরনের পরীক্ষা নেওয়া হয় কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। চিকিৎসক, কৃষিবিদ ও বিজ্ঞানীর মতো বিশেষজ্ঞদের নির্বাচনে তাঁদের বিশেষ বিষয়ের ওপর জ্ঞানের জন্য রাখা হয়েছে ২০০ নম্বর। আর বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ বিষয়াবলি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদির মতো বিষয়সমূহে নম্বর রাখা হয়েছে ৬০০। অর্থাৎ যেসব বিশেষজ্ঞ বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞানে ভালো, তাঁরা তাঁদের বিশেষ বিষয় সম্পর্কে কম জানলেও নির্বাচিত হতে পারবেন। সাধারণ পদের জন্য যে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এ ধরনের পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে একবিংশ শতাব্দীতে কোনো উন্নত দেশেই নিয়োগ দেওয়া হয় না। অঙ্ক, প্রাত্যহিক বিজ্ঞান এবং অনেক ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজিতে এসএসসি পর্যায়ের প্রশ্ন করা হয়।

### গ. কোটা পদ্ধতি

বাংলাদেশে শুধু পরীক্ষার ফল ভালো করলেই চাকরি পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে অধিকাংশ পদে কোটার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হয়। সারণি-৯.৬-এ বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত কোটার বিতরণ দেখা যাবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে একটি অত্যন্ত জটিল কোটা পদ্ধতি চালু রয়েছে।[৮] প্রথম শ্রেণির সরকারি চাকরিতে মোট কোটা হলো ২৫৭টি (প্রতিবন্ধীদের কোটাসহ ২৫৮)। এত কোটার মধ্যে পদ বিতরণ একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। কোটা ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের নিয়োগপদ্ধতি অস্বচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ জেলা

কোটা সব অঞ্চলের নিয়োগে বৈষম্য দূর করতে পারেনি। বর্তমানে যে পদ্ধতি চালু আছে, তাতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা কোনো দিনই সম্ভব হবে না। মুক্তিযোদ্ধা কোটা রয়েছে, অথচ বর্তমানে যথেষ্ট মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী নেই। তাই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তবে সংবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সুবিধা সবাইকে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না, শুধু যাঁরা দুস্থ মুক্তিযোদ্ধার পরিবার, তাঁদের ক্ষেত্রে কোটা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং আস্তে আস্তে এই কোটা হ্রাস করে বিলুপ্ত করতে হবে।

**সারণি-৯.৬**
**বাংলাদেশে কোটা পদ্ধতি**

| | ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা | ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী |
|---|---|---|
| মেধা | ৪৫ | ০ |
| মুক্তিযোদ্ধা | ৩০ | ৩০ |
| মহিলা | ১০ | ১৫ |
| উপজাতি | ৫ | ৫ |
| সাধারণ জেলা কোটা | ১০ | ১০ |
| এতিম এবং প্রতিবন্ধী | ১ (প্রতিবন্ধীদের জন্য) | ১০ |
| আনসার এবং ভিডিপি | ০ | ০ |

উৎস : Government of Bangladesh, Establishment Manual, Vol. 1, 1988

### ঘ. কর্মসম্পাদন মূল্যায়নে ব্যর্থতা

বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তাদের বার্ষিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা চালু আছে। তবে যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত, এর ভিত্তিতে সঠিক মূল্যায়ন আদৌ সম্ভব নয়। মূল্যায়নের জন্য যে ফর্ম ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে কাজে সাফল্য ও ব্যর্থতার চেয়ে ব্যক্তিগত গুণাবলির ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। ঔপনিবেশিক আমলে সরকারি কর্মচারীদের আনুগত্যের ওপর সবচেয়ে জোর দেওয়া হতো। সুতরাং সেই মূল্যায়নে আনুগত্য-সংক্রান্ত গুণাবলির জন্য বেশি নম্বর দেওয়া হতো। স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারি কর্মচারীদের মূল্যায়ন হওয়া উচিত তাঁদের কাজের ভিত্তিতে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে মূল্যায়নের জন্য যে ফর্ম ব্যবহার করা হয়, তার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করলে একজন অনুগত ও বশংবদ কর্মকর্তা ১০০ মধ্যে ৯৪ নম্বর পেতে পারেন। এর কারণ হলো, কর্মের পরিমাণের ওপর মোট নম্বর হলো ৪ আর কাজের মানের ওপর নম্বর হলো ৪। প্রচলিত নিয়মে কাউকে ১-এর কম নম্বর দেওয়া যায় না। সুতরাং কাজের পরিমাণ ও কাজের মানে ২ নম্বর

পেলেও একজন কর্মকর্তার পক্ষে ৯৪ নম্বর পাওয়া সম্ভব। সারণি-৯.৬ থেকে দেখা যাবে, বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তারা সবাই কর্মসম্পাদন মূল্যায়নে অনেক বেশি নম্বর পেয়ে থাকেন।[৯] ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে ১১৬ জন উপসচিবের প্রাপ্ত নম্বরের বিশ্লেষণ সারণি-৯.৭-এ দেখা যাবে।

**সারণি-৯.৭**

**১১৬ জন কর্মকর্তার মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর, ১৯৯৬-২০০১**

| প্রাপ্ত নম্বর | সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তা | মোট সমীক্ষাকৃত কর্মকর্তাদের শতকরা হার |
|---|---|---|
| এসিআর পাওয়া যায়নি | ১ | ০.৮ শতাংশ |
| ৮০ শতাংশের নিচে | ২ | ১.৮ |
| ৮০ শতাংশ থেকে ৯৪.৯৯ শতাংশ | ৯ | ৭.৭ |
| ৮৫ শতাংশ থেকে ৯৮.৯৯ শতাংশ | ৪০ | ৩৪.৪ |
| ৯০ শতাংশ থেকে ৯৪.৯৯ শতাংশ | ৫৪ | ৫০.০ |
| ৯৫ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ | ৬ | ৫.০৩ |
| | ১১৬ | ১০০.০ |

উৎস : Establishment Division, Government of Bangladesh.

সারণি-৯.৭-এ দেখা যাচ্ছে, মাত্র ২.৬ শতাংশ কর্মকর্তা তাঁদের মূল্যায়নে ৮০ নম্বরের কম পেয়ে থাকেন। ৫৫.৩ শতাংশ কর্মকর্তা ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পান। এ ধরনের মূল্যায়নে ভালো এবং খারাপ কর্মকর্তাদের মধ্যে তফাত নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। এর ফলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কাজের মান ও পরিমাণের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে না।

### ঙ. অপরিকল্পিত নিয়োগ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে অপরিকল্পিতভাবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। কখনো কখনো কোনো ক্যাডারে অতিরিক্ত-সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, আবার কখনো কখনো কোনো নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে নিয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সারণি-৯.৮-এ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের প্রবণতা দেখা যাবে।

## সারণি-৯.৮
## বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ, ১৯৭২-২০১৩

| পরীক্ষার নাম | বছর | মনোনীত/নিয়োগকৃত প্রার্থীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ সুপিরিয়র সার্ভিস | ১৯৭২ | ১৩১৩ |
| অমুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সুপিরিয়র সার্ভিস | ১৯৭২ | ৫০০ |
| মুনসিফ | ১৯৭৫ | ৫০ |
| সুপিরিয়র সার্ভিস | ১৯৭৬-৭৭ | ১৩৫ |
| মুনসিফ | ১৯৭৮ | ২৪ |
| সুপিরিয়র সার্ভিস | ১৯৭৯ | ১৩১ |
| মুনসিফ | ১৯৭৯ | ২৫ |
| মুনসিফ | ১৯৮০ | ৪০ |
| ১ম বিসিএস | ১৯৮২ | ৯০১ |
| ২য় বিশেষ বিসিএস | ১৯৮৩ | ৬৫০ |
| ৩য় বিশেষ বিসিএস (স্বাস্থ্য) | ১৯৮৩ | ১০০১ |
| ৪র্থ বিসিএস (কৃষি ও রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং) | ১৯৮৪ | ১০৮ |
| ৫ম বিসিএস | ১৯৮৪ | ৭৯৫ |
| ৬ষ্ঠ বিসিএস বিশেষ | ১৯৮৫ | ৭০০ |
| ৭ম বিসিএস | ১৯৮৫ | ২৫৩১ |
| ৮ম বিসিএস | ১৯৮৬ | ২১২১ |
| ৯ম বিসিএস | ১৯৮৮-৮৯ | ১১৬৫ |
| ১০ম বিসিএস | ১৯৮৯-৯০ | ১০২২ |
| ১১তম বিসিএস | ১৯৯০-৯১ | ৬৯৫ |
| ১২তম বিসিএস বিশেষ | ১৯৯০ | ৪০ |
| ১৩তম বিসিএস | ১৯৯১-৯২ | ১১৭৪ |
| ১৪তম বিসিএস বিশেষ | ১৯৯২ | ১১৮৫ |
| ১৫তম বিসিএস | ১৯৯৩-৯৪ | ৮৫৮ |
| ১৬তম বিসিএস বিশেষ | ১৯৯৪ | ১৩৪৮ |
| ১৭তম বিসিএস | ১৯৯৫-৯৬ | ১৭০৮ |
| ১৮তম বিসিএস | ১৯৯৬-৯৭ | ১৭৫৭ |
| ১৯তম বিসিএস | ১৯৯৮ | ৫৫৫ |
| ২০তম বিসিএস | ১৯৯৮ | ২২৪২ |

| | | |
|---|---|---|
| ২১তম বিসিএস | ১৯৯৯ | ১৩৭০ |
| ২২তম বিসিএস | ২০০০ | ২৩৩৫ |
| ২৩তম বিসিএস বিশেষ | ২০০০-০১ | ২১ |
| ২৪তম বিসিএস | ২০০২-০৪ | ৫২২৪ |
| ২৫তম বিসিএস | ২০০৪-০৬ | ২৭২২ |
| ২৬তম বিসিএস | ২০০৪-০৫ | ১০৬৩ |
| ২৭তম বিসিএস | ২০০৫-০৭ | ৩২৩৯ |
| ২৮তম বিসিএস | ২০০৮-১০ | ২১৯০ |
| ২৯তম বিসিএস | ২০০৯-১০ | ১৭২২ |
| ৩০তম বিসিএস | ২০১০-১১ | ২৩৬৭ |
| ৩১তম বিসিএস | ২০১১-১৩ | ২০৭২ |
| ৩২তম মুক্তিযোদ্ধা মহিলা এবং উপজাতীয়দের জন্য বিশেষ বিসিএস | ২০১২-১৩ | ১৬৮০ |
| ৩৩তম বিসিএস | ২০১২ | ৪২০৬ |
| ৩৪তম বিসিএস | ২০১৩ | ২০৫০ |

সূত্র : BPSC Annual Reports and press releases.

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, কোনো একটি বছরে সব ক্যাডারে ৫২২৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আবার অন্য একটি বছরে নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ১৬৮০ জনে নেমে এসেছে। আকস্মিকভাবে নিয়োগের সংখ্যা বাড়লে শুধু প্রশিক্ষণেরই সমস্যা দেখা যায় না, পরবর্তীকালে পদোন্নতিতেও সমস্যা দেখা দিয়েছে।

## চ. ক্যাডার সার্ভিসের উপযোগিতা

বাংলাদেশের ক্যাডার সার্ভিসের সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে বিশেষজ্ঞদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে অনেক ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়েছে, যেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই এবং সব ক্যাডারকে সমানভাবে গণ্য করার কোনো সুযোগও এখানে নেই। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের কার্যপদ্ধতি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তার ফলে কোনো কোনো ক্যাডার একেবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। যেমন ধরা যাক, বিসিএস টেলিফোন ক্যাডার। যখন এই ক্যাডার করা হয়, তখন টেলিফোন একটি সরকারি বিভাগ ছিল। এখন টেলিফোন একটি স্বশাসিত বাণিজ্যিক সংস্থা, এখানে সরকারি ক্যাডারের কোনো যৌক্তিকতা নেই। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানির ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়াতে বিসিএস

ট্রেডকে একটি আলাদা ক্যাডার হিসেবে সৃষ্টি করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে ক্যাডার ব্যবস্থা পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

## ৯.৪ রাজনীতি ও প্রশাসন

তত্ত্ব অনুসারে আধুনিক আমলাতন্ত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা। আমলাতন্ত্রের কাজ হলো, যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা। ম্যাক্স ওয়েবার তাই লিখেছেন :

> The honour of the civil servant is vested in his ability to execute conscientiously the order of superior authorities, without this moral discipline and self-denial, in the highest sense, and otherwise the whole apparatus would fall to pieces.[১০]

বাস্তবে রাজনীতি এবং প্রশাসনের মধ্যে এই প্রভেদ টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিবিদেরা অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী চান। এর কারণ, তাঁরা প্রশাসনযন্ত্রকে তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চান। অন্যদিকে অনেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতি ও অন্যান্য সুবিধার মোহে রাজনৈতিক দলের সমর্থক হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় দলীয় রাজনীতি প্রশাসনকে সংক্রমিত করে। অবশ্য অনেকে বলে থাকেন, প্রশাসনে রাজনৈতিকীকরণ গণতন্ত্রের জন্য বড় সমস্যা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সব উচ্চপদে রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক বিবেচনায় মনোনয়ন দিয়ে থাকেন কিন্তু এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এই যুক্তির বেশ কয়েকটি দুর্বলতা রয়েছে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সব পদে রাজনৈতিক নিয়োগ দেওয়া হয় না। বৃহৎ আমলাতন্ত্রে অতি ক্ষুদ্রসংখ্যক পদে রাজনৈতিক নিয়োগ দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল সরকারের আমলাতন্ত্রে ২০ লাখ লোক নিয়োজিত আছেন। এর মধ্যে মাত্র ৩ থেকে ৪ হাজার পদে রাজনৈতিক নিয়োগ দেওয়া হয়। এই পদগুলোর অর্ধেক পদ, অর্থাৎ ১৫০০ থেকে ২০০০ পদ উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার এবং বাকি ১৫০০ থেকে ২০০০ পদ নিম্ন পর্যায়ের সমর্থনদানকারী কর্মকর্তার (পিএস, কম্পিউটার অপারেটর ইত্যাদি)।[১১]
- এ কথা সত্য নয় যে শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় সব উচ্চপদে নিয়োগ দেওয়া হয়। যে ১৫০০ থেকে ২০০০ পদ উচ্চ পর্যায়ের, তার অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পদে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর সিনেটের অনুমোদন লাগে। সিনেট ওই প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে, অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এমন অনেক উদাহরণ প্রতিটি প্রশাসনেই রয়েছে যে

রাষ্ট্রপতির মনোনীত প্রার্থী সিনেটের অনুমোদন পান না। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নতুন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে হয়। পক্ষান্তরে দেখা যায়, এই ধরনের পদে প্রেসিডেন্ট যাঁদের নিয়োগ দেন, সে ধরনের যোগ্য কর্মকর্তা প্রশাসনে খুব বেশি নেই। প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত উচ্চপদের কর্মকর্তারা দায়িত্বশীল সরকারি চাকরিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান। তাঁরা দুই-তিন বছরের জন্য এই সব পদে যোগ দেন। এ ধরনের যোগ্য কর্মকর্তারা আমলাতন্ত্রের নিচু পদে যোগ দিয়ে পদোন্নতির জন্য বছরের পর বছর প্রতীক্ষা করতে রাজি নন। কাজেই এই ধরনের রাজনৈতিক মনোনয়ন-পদ্ধতির ফলে অনেক যোগ্য কর্মকর্তা প্রশাসনে আকৃষ্ট হন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক মনোনয়ন-পদ্ধতি মার্কিন প্রশাসনের দুর্বলতা নয়, বরং সবলতা।

- ফেডারেল সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নির্বাচনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে নির্বাচন প্রভাবিত করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে প্রশাসনে যে রাজনৈতিকীকরণ চলছে, তার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নিয়োগের তুলনাও ঠিক নয়। মার্কিন সংবিধান অনুসারে বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে। বাংলাদেশে এই ক্ষমতা অত্যন্ত সংকুচিত। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে পেশাদার আমলাদের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। অথচ বাংলাদেশে এই পেশাদার আমলাতন্ত্রকে কার্যত রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যা মোটেও বিধিসম্মত নয়। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয় :
- রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ
- রাজনৈতিক বিবেচনায় দায়িত্বশীল পদে পদায়ন
- রাজনৈতিক বিবেচনায় দ্রুত পদোন্নতি প্রদান
- রাজনৈতিক বিবেচনায় বিরোধীদলীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং কারও কারও চাকরিচ্যুতি।

এই চারটি ব্যবস্থার মধ্যে শুধু একটি ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের আইনগত অধিকার রয়েছে। সে ক্ষেত্রটি হলো পদায়ন। নির্বাচিত সরকার যেকোনো কর্মকর্তাকে তাঁর সম-মর্যাদাসম্পন্ন পদে নিয়োগ দিতে পারে, এ ব্যাপারে অভিযোগের কোনো সুযোগ নেই। বাকি তিনটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিকীকরণ বেআইনিভাবে করা হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হওয়ার কথা। কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকারি

দল পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে কুক্ষিগত করে তাদের প্রার্থীদের নিয়োগ দান করে। এই ব্যবস্থা আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকারের ভূমিকা রয়েছে। প্রচলিত বিধি অনুসারে কেউ যদি পদোন্নতির যোগ্য না হন, তাহলে সরকার তাঁকে পদোন্নতি দিতে বাধ্য নয়। প্রচলিত বিধিতে সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতিতে তাঁদের রাজনৈতিক অতীত বিবেচনা করার কোনো সুযোগ নেই। তবে কেউ যদি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য আচরণবিধির আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি আচরণবিধি অনুসারে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ না করা যায়, তাহলে তাঁকে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা যায় না। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশে এই নিয়ম তিন দশক ধরে মানা হচ্ছে না। রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে এবং অনেককে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। উপরন্তু পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে পদের সংখ্যা, তাও রাজনৈতিক বিবেচনায় বাড়ানো বা কমানো হচ্ছে। পদোন্নতি দেওয়ার জন্য কাজ ছাড়া উদ্বৃত্ত পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ১৭৬৮ জন কর্মকর্তাকে পদ ছাড়া পদোন্নতি দেওয়া হয়। (সারণি-৯.৯ দ্রষ্টব্য)।

**সারণি-৯.৯**
**মঞ্জুরিকৃত পদের অতিরিক্ত পদোন্নতি**

| পদ | মঞ্জুরিকৃত পদ | ৭-৪-২০১৫ তারিখে কর্মকর্তার সংখ্যা | ৭-৪-২০১৫ তারিখে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা | মোট কর্মকর্তা | উদ্বৃত্ত কর্মকর্তার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| সচিব | ৫৩ | ৭২ | - | ৭২ | ১৯ |
| অতিরিক্ত সচিব | ১০৭ | ২২৬ | ২৩১ | ৪৫৭ | ৩৫০ |
| যুগ্ম সচিব | ৪৩০ | ৮৬৭ | ২৯৯ | ৯৩৫ | ৫০৫ |
| উপসচিব | ৮৩০ | ১২৮০ | ৩৪৩ | ১৩২৪ | ৪৯৪ |
| সিনিয়র সহকারী/সহকারী সচিব | ৪০০০ | ২৮৪৯ | - | ২৫০৬ | - |
| মোট | ৫৪২০ | ৫২৩৪ | - | ৫২৯৪ | ১৭৬৮ |

উৎস : প্রথম *আলো*, ৭ এপ্রিল ২০১৫

এ ধরনের পদোন্নতির ফলে নিম্নরূপ ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দিচ্ছে।

১. **সরকারি অর্থের অপচয় :** উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত মোট মঞ্জুরিকৃত পদ ছিল ১৪২০টি। মোট পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৩১৮৮। অর্থাৎ ১৭৬৫ জনকে পদ ছাড়া পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ওই সময়ে প্রচলিত বেতন-ভাতার ভিত্তিতে মোট অপচয় ছিল ৬৩.৭ কোটি টাকা। আর বর্তমান বেতন-ভাতার হিসাবে এই অপচয় বছরে ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এর অর্থ হলো এই পদোন্নতির জন্য আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশ সরকারের কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকা লোকসান হবে।

২. **নতুন ধাপ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশাসনিক অদক্ষতা সৃষ্টি :** মঞ্জুরিকৃত অতিরিক্ত সচিবের পদ মাত্র ১০৭টি। অথচ এই পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে ৩৫০ জনকে। আগে সব মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব ছিল না। যেখানে সচিবের দায়িত্ব খুব বেশি, সেখানে সচিবের সহায়তার জন্য অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃষ্টি করা হতো। কিন্তু যেসব নথি অতিরিক্ত সচিবের কাছে পেশ করা হতো, তার বেশির ভাগই অতিরিক্ত সচিবকে নিষ্পন্ন করার ক্ষমতা দেওয়া ছিল। আসলে চার ধাপের বেশি একটি বিষয় পরীক্ষা করার দরকার নেই। অথচ বর্তমানে সব মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃষ্টি করে পাঁচ ধাপবিশিষ্ট সচিবালয়-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এতে নিশ্চিতভাবে প্রশাসনিক অদক্ষতা বেড়ে গেছে।

৩. **রাজনৈতিক কারণে বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা পদোন্নতিবঞ্চিত :** এত বেশি পদোন্নতি দেওয়ার ফলে বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। *কালের কণ্ঠ*-এর (৭.৪.২০১৫) একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে, উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ১৩৭ জন কর্মকর্তাকে অতিক্রম করা হয়েছে। যুগ্ম সচিব পদের পদোন্নতির জন্য ৩৬০ জন কর্মকর্তাকে অতিক্রম করা হয়েছে এবং ২৭০ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাজনৈতিক বিবেচনায় এসব কর্মকর্তাকে অতিক্রম করা হয়েছে। সুতরাং এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর মনোবল ভেঙে পড়েছে এবং তাঁদের উৎপাদনশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৪. **পদায়নের জন্য তদবির :** ১৭৬৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাঁদের পদায়নের জন্য উপযুক্ত পদ নেই। এখন সবাই পদায়নের জন্য তদবির করছেন। যেহেতু রাজনৈতিক বিবেচনায় পদায়ন হয়, সেহেতু উদ্বৃত্ত কর্মকর্তারা, যাঁরা পদায়ন পেয়েছেন, তাঁদের রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এ ধরনের পদোন্নতি আমলাতন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকট করে তোলে।

৫. **উল্টো পিরামিড ও নিম্নস্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রকট সংকট :** উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে উদ্বৃত্ত কর্মচারীর সংখ্যা ১৭৬৮। অথচ সহকারী সচিব পদে

১৫০০ কর্মকর্তা নেই। এর কারণ হলো, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু নিচের স্তরে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এর ফলে প্রশাসনিক অদক্ষতার সৃষ্টি হয়েছে। তত্ত্ব অনুসারে সচিবালয়ের প্রশাসন পিরামিড আকৃতির হওয়ার কথা, যেখানে ওপরের দিকে পদের সংখ্যা হবে কম আর নিচের দিকের পদের সংখ্যা হবে বেশি। বাংলাদেশে এর উল্টো পরিস্থিতি বিরাজ করছে। নিচের দিকে পদে কর্মকর্তা নেই আর ওপরের দিকে অজস্র কর্মকর্তা বিনা কাজে বসে আছেন। নিচের দিকে কর্মকর্তা না থাকার ফলে প্রয়োজনীয় কাজ করা যাচ্ছে না। এ ধরনের প্রশাসন পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বরখাস্তকরণ, অপসারণ অথবা অবনমনের আদেশ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে কারণ দর্শানোর যুক্তিসংগত সুযোগ দেওয়া হয়। সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিস্তৃত নির্দেশাবলি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা এবং আপিল) বিধিতে রয়েছে। এসব বিধি অনুসারে স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তাঁকে দুবার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় : একবার তদন্ত শুরু হওয়ার আগে এবং দ্বিতীয়বার তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর। এসব বিস্তৃত ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালে পাবলিক সার্ভেন্ট রিটায়ারমেন্ট অ্যাক্টে সরকারি কর্মচারীদের অপসারণের একটি অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এ পদ্ধতি অনুসারে কারও ২৫ বছরের চাকরি পূর্ণ হলে সরকার তাঁকে অবসরে পাঠাতে পারে। অনুরূপভাবে ২৫ বছরের চাকরি পূর্তিতে সরকারি কর্মকর্তা নিজেও অবসরে যেতে পারেন। আইনের এ বিধান প্রয়োগ করে সরকার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য তাঁদের অবসরে পাঠাতে শুরু করে। এর ফলে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা সরকারের বশংবদ হয়ে পড়েন। মোট কর্মচারীর সংখ্যার তুলনায় এ ধরনের অবসর প্রদানের ঘটনা খুব বেশি নয়। একটি হিসাবে দেখা গেছে, ১৯৯১-৯৬ সময়কালে ১৯৭ জন কর্মকর্তাকে সরকার অবসর দিয়েছে। এরপর এ সংখ্যা কমে আসে কিন্তু এখনো প্রতিবছরই কিছু কিছু কর্মকর্তাকে ২৫ বছর পূর্তিতে অবসর দেওয়া হচ্ছে। আসলে কতজনকে অবসর দেওয়া হয়েছে, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো যে সরকার কোনো জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার আচরণে ক্ষুব্ধ হলে তাঁকে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই অবসর দিতে পারে। এ বিশেষ বিধান বিলোপ না করা হলে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারের স্বেচ্ছাচারের সুযোগ থেকে যাবে।

## ৯.৫ সংস্কারের রূপরেখা

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে প্রশাসনে নতুন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে ও নতুন কাঠামো পরিচালনার জন্য দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ করতে হবে। এ কাজ সহজ নয়; কারণ, ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে এবং ১০ লাখের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী এ কাঠামো পরিচালনা করছেন। এ পুরো ব্যবস্থার রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। তবু বাংলাদেশে প্রশাসনের রাজনৈতিকীকরণের যে সমস্যা হয়েছে, সে সমস্যার সমাধান না হলে প্রশাসন থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যাবে না। বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের প্রশাসনে বর্তমানে গ্রেশাম বিধির ব্যামো চলছে। গ্রেশাম বিধির বক্তব্য হলো, একই সঙ্গে বাজারে ভালো মুদ্রা এবং খারাপ মুদ্রা থাকলে ভালো মুদ্রা লোকে ঘরে তুলে রাখে আর শুধু খারাপ মুদ্রা বাজারে চালু থাকে। অন্য কথায় খারাপ মুদ্রা ভালো মুদ্রাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও অনেক সময় এই সংকট দেখা দেয়। দেখা যায়, প্রশাসনে খারাপ লোকেরা ভালো লোকদের কোনো আসন দেন না। এই অবস্থার নিরসন করতে হলে বাংলাদেশে প্রশাসনের রাজনৈতিকীকরণ বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের বুঝতে হবে, প্রশাসনিক রাজনৈতিকীকরণ স্বল্প মেয়াদে তাঁদের জন্য লাভজনক হলেও দীর্ঘ মেয়াদে দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে সমস্যা শুধু রাজনৈতিকীকরণেরই নয়, দুর্নীতি ও অদক্ষতাও অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনকে গ্রাস করেছে। এই ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে :

১. সব খারাপ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নতুন ভালো কর্মকর্তা নিয়োগ। এ ধরনের ব্যবস্থা সংস্কার নয়, এ ধরনের ব্যবস্থা বৈপ্লবিক। তবু বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে অধিকাংশ কর্মকর্তা দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বেচ্ছাচারী। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। নতুন লোক নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। পৃথিবীর কোনো কোনো স্থানে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যেমন এল সালভাদরে একটি নতুন পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশের দাতারা দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছিল, তবে বাংলাদেশ সরকার শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করেনি।
২. দুর্নীতিপরায়ণ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অপসারণ ও অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুনভাবে প্রশিক্ষণ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটলে প্রশাসনে পরিবর্তন সম্ভব। এই ক্ষেত্রে পুরোনো কর্মকর্তাদের ব্যাপারে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ বা দুর্নীতিবাজ প্রতিষ্ঠানের বদলে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। এখানে গ্রামীণ ব্যাংকের উদাহরণ স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় সরকার গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দেয়। যদিও কৃষি ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংকের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা সমান, তবু অর্জনের দিক থেকে কৃষি ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংক থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছে। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে নতুন লোক নিয়ে নতুন সংস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশাসনিক গতি সঞ্চার করা সম্ভব।

৪. গুরুত্বপূর্ণ কাজে আগে সংস্কার। অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে যেসব ইউনিট রয়েছে, তার সব কটি একসঙ্গে সংস্কার করা সম্ভব না-ও হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যেসব ইউনিটের কাজ গুরুত্বপূর্ণ, সেসব ইউনিটে নতুন লোকদের নিয়োগ দিয়ে সংস্কারের কাজ শুরু করা যেতে পারে। বর্তমান কর্মচারীদের পুরোনো ইউনিটে সীমাবদ্ধ রেখে তাঁদের ক্রমশ অবসরে পাঠিয়ে সংস্থাটি নতুন করে গড়ে তোলা যেতে পারে।

৫. বেসরকারীকরণ এবং সরকারের ভূমিকা হ্রাস। বেসরকারীকরণ করে এবং সরকারের দায়িত্ব কমালে দুর্নীতির সুযোগ কমে যাবে।

ওপরের পাঁচটি নীতি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গ্রেশাম বিধির ব্যামো সারানোর একটিমাত্র পথ নেই, এখানে অনেক ধবনের পথের অনুসন্ধান করতে হবে। তবে এ ধরনের সংস্কার তখনই সম্ভব হবে, যখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

বাংলাদেশে প্রশাসনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সংস্কারের জন্য একটি নকশা তৈরি করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে :

১. **প্রশাসনিক পুনর্গঠন :** বাংলাদেশ সচিবালয়ে যত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর পদ আছে, তত কাজ নেই। বিশ্লেষণে দেখা যায়, সচিবালয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ ঊর্ধ্বতন পদের কোনো প্রয়োজন নেই। যে আদলে সচিবালয়ের প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, সে আদলকে পরিবর্তন করতে হবে। ডিজিটালাইজেশনের পর বাংলাদেশে বেশির ভাগ অফিসে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদের প্রয়োজন অনেক কমে গেছে। এ ধরনের পদ তুলে দিতে হবে এবং নিচের কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিতে হবে।

২. **উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা :** যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী উদ্বৃত্ত হবেন, তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে এ ধরনের ক্রান্তিকালে দুই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, সচিবালয়ের সব নথি কম্পিউটারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হবে। মূল প্রশাসনে যাঁরা উদ্বৃত্ত হবেন, তাঁদের এ কাজে নিয়োগ

করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে সর্বত্র উদ্বৃত্ত কর্মচারী নেই, কোথাও কোথাও কর্মচারীর অভাবও রয়েছে। যেমন স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে নিয়োগ করা যেতে পারে।

৩. **সিনিয়র সার্ভিস পুল পুনর্গঠন :** বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যতগুলো প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিশন গঠন করা হয়েছে, তার প্রতিটিই সিনিয়র সার্ভিস পুল গঠনের পরামর্শ দিয়েছে। সরকার এ সুপারিশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে সরকারি কর্মচারীদের চাপের মুখে এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার প্রয়োজন রয়েছে।

৪. **সচিবালয়ের বাইরের প্রশাসনে সংস্কার :** শুধু সচিবালয়ের সংস্কারই যথেষ্ট নয়, সচিবালয়ের বাইরে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলো সংস্কার করতে হবে। এই সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে :

   ১. যেসব কাজ বেসরকারি খাতের পক্ষে করা সম্ভব, সেসব কাজ সরকারে না রেখে বেসরকারি খাতে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

   ২. পুরো প্রতিষ্ঠানটির একসঙ্গে সংস্কার না করে প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর ক্ষেত্রে সংস্কার শুরু করা যেতে পারে।

   ৩. যেখানে বর্তমান প্রতিষ্ঠান একেবারেই অক্ষম, সেখানে বিকল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে এবং পুরোনো প্রতিষ্ঠানটি আস্তে আস্তে গুটিয়ে ফেলা যেতে পারে।

প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য যোগ্য আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন। এই যোগ্য আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. **ক্যাডার সার্ভিস পুনর্গঠন :** খুব বেশি ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে ক্যাডার ব্যবস্থা উপযুক্ত নয়, সেখানেও ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে প্রশাসনে বিশেষজ্ঞদের কদর কমে গেছে। ক্যাডার ব্যবস্থাকে পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে, তবে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এই পরিবর্তনের ফলে যেন কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধার হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটে।

২. **পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন :** স্বাধীন এবং কার্যকর পাবলিক সার্ভিস কমিশন গড়ে তুলতে হবে। এর পরীক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে, ২৯টি ক্যাডারের জন্য এক পরীক্ষার বদলে ক্যাডারের প্রয়োজনভিত্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষার পাঠ্যক্রম অতি দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

৩. **সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের ব্যবস্থা :** বর্তমান পদ্ধতি একেবারেই অচল, ব্যক্তিগত গুণাবলির মূল্যায়ন না করে কর্মকর্তাদের

কাজের পরিমাণ ও মানের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. **বেতন-ভাতা :** বর্তমানে যে বেতন-ভাতা প্রচলিত, তা যোগ্য প্রার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট নয়। যোগ্য প্রার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য নতুন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

এখানে ঘুণে ধরা আমলাতন্ত্রকে কার্যক্ষম করার জন্য একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। তবে এসব সংস্কার যথেষ্ট নয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রে পরিবর্তন আনতে হবে এবং নিয়মিতভাবে আমলাতান্ত্রিক সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

## পাদটীকা

১. David Osborne and Ted Gaebler. 1993. *Reinventing Government: How the Entrepreneurhip Spirit is Tranforming Public Sector.* New York, Penguin Books.

২. M. Atahar Ali 1991. *The Mughal Nobility under Aurangzeb.* Delhi, Oxford, 15

৩. Hatch Barnwell 2011. *The Last Guardian. Memoirs of Hatch Barnwell. ICS of Bengal.* Dhaka: The University Press Ltd.

৪. David C. Potter. 1996. *Indian's Political Administrators from ICS to IAS.* Delhi. Oxford University Press. 32-34

৫. Paul D. Maggio and Walter C. Powell. 1983. 'The Iron Cage Revisted: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational fields.' *American Sociological Review.* Vol. 48 (April), 147-166

৬. Akbar Ali Khan 2015. *Gresham's Law Syndrome and Beyond.* Dhaka: University Press Ltd.

৭. Center for Governance Studies, BRAC University. 2008 The State Governance in Bangladesh 2008 Dhaka. BRAC University, 57

৮. Akbar Ali Khan 2015. প্রাগুক্ত

৯. Akbar Ali Khan 2015. প্রাগুক্ত

১০. Max Weber. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. New York: The Free Press

১১. James P. Pfiffner. 1987. 'Political Appointees and Career Executives: The Democracy-Bureancraey Nexus in the Third Century, *Public Administration Review.* Vol. 47. No 1 (February), 57-65

# ১০

# বিকেন্দ্রীকরণ : ক্ষমতার দ্বৈত হস্তান্তর (Double Devolution)

## ১০.১ বিকেন্দ্রীকরণের প্রভাব ও প্রকারভেদ

গত শতকের ষাটের দশকের প্রথম দিকে গল্পটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খানের নামে প্রচলিত ছিল। তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড়ের পর তিনি উপদ্রুত অঞ্চল সফরে যান। সেখানে তাঁকে খবর দেওয়া হয় যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা সাত দিনের মধ্যে প্রণয়ন না করলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হবে না। এই বার্তা পেয়ে আজম খান সঙ্গে সঙ্গে চিফ সেক্রেটারিকে ফোন করেন এবং বলেন, 'Mr. Chief Secretary, I want the distressed person's list in 6 days time (তিনি হাতে এক দিন সময় রাখেন) and if you can not deliver on time I will give you a kick in the back.' সামরিক কর্মকর্তার গালি খেয়ে চিফ সেক্রেটারি কমিশনারকে ফোন করলেন এবং বললেন, 'Mr. Commissioner I want this damn list in 5 days' time and if you can not deliver on time I will give you two kicks on your back.' কমিশনার এই ফোন পেয়ে ডেপুটি কমিশনারকে ফোন করলেন এবং বললেন, চার দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁকে দিতে হবে, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনারের পিঠে তিনি তিনটি লাথি মারবেন। ডেপুটি কমিশনার সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা প্রশাসককে ফোন করলেন এবং বললেন যে যেসব তথ্য চাওয়া হয়েছে, তা তিন দিনের মধ্যে দিতে হবে আর না দিতে পারলে তাঁর পাছায় চারটি লাথি দেওয়া হবে। মহকুমা প্রশাসক সার্কেল অফিসারদের ফোন করলেন এবং বললেন, দুই দিনের মধ্যে সব তথ্য তাঁর কাছে পৌঁছাতে হবে আর যদি সার্কেল অফিসার এ কাজ যথাসময়ে করতে না পারেন, তবে তাঁর পাছায় পাঁচটি লাথি দেওয়া হবে। সার্কেল অফিসার সঙ্গে সঙ্গে

ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে জানালেন, দুদিনের মধ্যে তাঁকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে, অন্যথায় তাঁর পাছায় পড়বে ছয়টি লাথি। লাথির হুমকিতে ক্ষিপ্ত হয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান চৌকিদারকে ডেকে তাঁর পাছায় একটি লাথি মারেন এবং বলেন, এক দিনের মধ্যে সব তথ্য সংগ্রহ করে তাঁকে দিতে হবে, অন্যথায় তাঁর কপালে আরও লাথি জুটবে। মনের দুঃখে চৌকিদার অফিস থেকে বের হয়ে সামনে যে ব্যক্তিকে পেলেন, তাঁকে প্রথমে চড় মারলেন ও তারপর তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলেন। নামটি সঙ্গে সঙ্গে কাগজে টুকে নিলেন। তারপর ভাবলেন যে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নাম চেয়েছে। শ দুয়েক নাম হলেই তাঁর কাজ হয়ে যাবে। তিনি লোকটিকে বললেন যে তাঁকে আরও ১৯৯টি নাম বলতে হবে, অন্যথায় তাঁকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। ইতিমধ্যে চৌকিদারের কাণ্ড দেখে রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে গেছে। সবার সহযোগিতায় এক ঘণ্টার মধ্যে দুই শ নামের তালিকা তৈরি হয়ে গেল। চৌকিদার সঙ্গে সঙ্গে তা চেয়ারম্যানের কাছে দাখিল করলেন। চেয়ারম্যান সঙ্গে সঙ্গে তা ওপরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এমনি করে সারা বিভাগের তথ্য যথাসময়ে সংকলিত হয়ে গভর্নরের কাছে যথাসময়ে পৌঁছায়। গভর্নর মহাখুশি যে বেঁধে দেওয়া সময়ের অনেক আগেই তাঁর প্রশাসন কাজটি সম্পন্ন করেছে। প্রশাসন সাফল্য দাবি করলেও আসলে কাজটি ব্যর্থ হয়। যে তালিকা প্রণয়ন করা হয়, সে তালিকা ভুয়া এবং যখন রিলিফ আসে, তখন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও চৌকিদার ভুয়া লোকদের জন্য প্রেরিত ত্রাণ অতি সহজে আত্মসাৎ করেন। ওপরের দিকে কর্তারা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন যে তাঁদের প্রশাসনব্যবস্থা কার্যকর এবং ঠিক সময়ে কাজটি করেছে। কিন্তু আসলে দেখা গেল যে ওপরের কর্মকর্তারা যতই হম্বিতম্বি করুন না কেন, লাথি খেয়েছেন চৌকিদার আর চড় খেয়েছেন সাধারণ মানুষ। দুর্গত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করা যায়নি আর ভুয়া তালিকায় রিলিফের মাল হয়ে গেছে চুরি। এ ধরনের কেন্দ্রীভূত প্রশাসনে জনগণের কোনো অংশ নেই এবং কার্যকর প্রশাসনের দৌলতে অতি দ্রুত তালিকা তৈরি হলেও জনগণের কোনো লাভ হয়নি।

মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হলো তৃণমূলের ক্ষমতায়ন। বেশির ভাগ রাষ্ট্রে ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে আজকের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। গিডেন্স তাই বলছেন :

> Democratising democracy means having an effective devolution of power, where-as in Britain it is still strongly concentrated at the national level.[১]

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সুফল অনেক। প্রথমত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি প্রধান শক্তি হলো এই ব্যবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

রয়েছে। এক স্তরে অনাচার হলে অন্যস্তরে এর প্রতিকার পাওয়া যায়; একটি প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হলে অন্য প্রতিষ্ঠানটি এই ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। পৃথিবীতে দুই ধরনের সরকার রয়েছে। এক ধরনের সরকার হলো এক স্তরভিত্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে Unitary সরকার। দ্বিতীয় ধরনের সরকারে একাধিক স্তর রয়েছে এবং এদের অধিকাংশই ফেডারেল সরকার নামে পরিচিত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় স্তর এবং প্রাদেশিক স্তরের মধ্যে ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিভাজন করা হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে না। কোনো কোনো বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের সিদ্ধান্তই হয় চূড়ান্ত। যেখানে একাধিক স্তরবিশিষ্ট সরকার নেই, সেখানে আইনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয়ত, বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি অথবা জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করতে পারে। সরকার যত বড় হয়, তাতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ তত কমে যায়। বড় জনগোষ্ঠীর সরকারে সাধারণত পরোক্ষ প্রতিনিধিত্ব থাকে। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র সরকার অত্যাবশ্যক।

তৃতীয়ত, তৃণমূল পর্যায়ের সরকারে যেসব রাজনীতিবিদ অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা সরকারে বিভিন্ন কাজ পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নিলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে শাসনকাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায়। যদি তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষমতা না থাকে, তাহলে রাজনীতিবিদদের প্রশিক্ষণের কোনো সুযোগ থাকে না।

চতুর্থত, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের একটি সুফল হলো, এটি জনগণের কাছে উন্নত সেবা প্রদান করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যাদের কল্যাণের জন্য সরকার-ব্যবস্থা নেয়, তারা তাদের বক্তব্য সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারে। উপরন্তু সরকারের পক্ষেও উপকারভোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ হয়। তাই সামগ্রিকভাবে তৃণমূলে ক্ষমতা হস্তান্তর নাগরিকদের সেবার মান উন্নত করে।

পঞ্চমত, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ জবাবদিহির সহায়ক। যেখানে তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিরা সরকার পরিচালনা করেন, সেখানে তাঁরা জনগণের কাছাকাছি থাকেন। তাঁদের সঙ্গে জনগণের প্রত্যক্ষ মেলামেশা ঘটে, তাই জনগণ সহজেই তাদের দাবিদাওয়া তাঁদের কাছে তুলে ধরতে পারে।

ষষ্ঠত, যেসব রাষ্ট্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেসব দেশে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দ্বন্দ্ব হ্রাসে সহায়ক হতে পারে। তৃণমূল পর্যায়ে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে সেসব সমস্যা জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে না। এর ফলে বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় সংহতি বাড়িয়ে দেয়।

সবশেষে যেখানে বহুস্তরবিশিষ্ট সরকার রয়েছে, সেখানে নিম্ন পর্যায়ে সরকারের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় যেসব সরকার নিম্নস্তরে ভালো

কাজ করে, তারা কাজের মানের মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা করে। এই মাপকাঠির ভিত্তিতে যে প্রতিযোগিতা হয়, তাকে yardstick competition বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রতিযোগিতার ফলে দেশে স্থানীয় সরকারের মান উন্নীত হয়।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা প্রধানত চার ধরনের হতে পারে :

- শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিচের স্তরগুলোতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এ ধরনের ব্যবস্থাকে ইংরেজিতে Devolution বলা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব এবং কার্যাবলি বিভিন্ন স্তরের সরকারের কাছে হস্তান্তর। এই হস্তান্তর স্থায়ীভাবে করার জন্য বিভিন্ন স্তরের সরকারের দায়িত্ব ও আর্থিক ক্ষমতা সম্পর্কে সংবিধানে সুস্পষ্টরূপে বিধান করা হয়। তবে যেখানে সংবিধানে একাধিক স্তরের সরকার নেই, সেখানে স্থানীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। স্থানীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে একটা বড় তফাত হলো যে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে সরকার পরিবর্তন হলে এগুলোর পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু যেখানে প্রাদেশিক সরকার থাকে, সেখানে প্রাদেশিক সরকার সংবিধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা হ্রাস-বৃদ্ধি শুধু আইনের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এ জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন হয়। তাই প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবহ হয় না; কারণ, তারা জানে যে তাদের ক্ষমতা সংবিধানে সংরক্ষিত রয়েছে। তবে যেখানে আইনের শাসন বলবৎ রয়েছে, সেখানে বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাসে কোনো কোনো সময় সহায়ক হতে পারে।
- কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের প্রশাসনিক ক্ষমতা আঞ্চলিক অথবা স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তর। এই ব্যবস্থাকে ইংরেজিতে Deconcentration বলা হয়ে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় বিভাগসমূহের নতুন অফিস স্থাপন করে তাদের ক্ষমতা দিলেও এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। অন্যথায় আঞ্চলিক সরকার ও স্থানীয় সরকারকেও এ ধরনের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। তবে এ ব্যবস্থা স্থায়ী নয়, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যবস্থায় যেকোনো সময় পরিবর্তন আনতে পারে।
- সংবিধিবদ্ধ অথবা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কাছে সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর। এই ব্যবস্থাকে ইংরেজিতে বলা হয় Delegation। এই ব্যবস্থায় বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, তবে এই ব্যবস্থা স্থায়ী নয়, পরিবর্তনশীল।
- বেসরকারি খাত অথবা বেসরকারি সংস্থায় সরকারের কার্যাবলি হস্তান্তর। ইংরেজিতে একে বলা হয় Privatization।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

তবে কোন দেশে কখন কী ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, সেটা সে দেশের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে কীভাবে আরও গণতান্ত্রিক করা যায়, সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা। এ প্রবন্ধে চারটি ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগে বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্রায়ণের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে প্রাদেশিক সরকারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে সম্পর্কেও এই ভাগে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রচলিত স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণের জন্য স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণের সম্ভাব্য কুফল ও তার সংশোধনের ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

## ১০.২ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন : দিল্লিকা লাড্ডু?

কথায় বলে, 'দিল্লিকা লাড্ডু যো খায়া হায় ও পস্তায়া, আর যো নেহি খায়া ও ভি পস্তায়া।' এর অর্থ হলো, সুস্বাদু দিল্লির লাড্ডু যে খেতে পায়নি, সে নিশ্চয়ই দুর্ভাগা। কিন্তু এ লাড্ডু যে এত গুরুপাকের জিনিস, এটা সবাই হজম করতে পারে না। এর ফলে যাঁরা দিল্লির লাড্ডু খান, তাঁরাও অনেকেই পস্তান। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি অনেকটা দিল্লির লাড্ডুর মতো। যেখানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নেই, সেখানে অনেক জটিল সমস্যা দেখা দেয়। আবার যেখানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন রয়েছে, সেখানেও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি হলো দুই ফলাবিশিষ্ট তরবারির মতো, যা এদিকেও কাটে, ওদিকেও কাটে। দেশের বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আবশ্যকতা।

বাংলাদেশে বর্তমানে কোনো প্রদেশ নেই আর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কোনো সোচ্চার দাবিও নেই। প্রদেশ সৃষ্টির প্রস্তাব করলেই নিম্নলিখিত আপত্তিগুলো উত্থাপিত হবে।

- বাংলাদেশ একটি এক স্তরবিশিষ্ট (Unitary) রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিয়েছে। এর জনগোষ্ঠী সমরূপ, এখানে শুধু উপজাতীয় অঞ্চল ছাড়া কোনো ভিন্নতা নেই। এখানে প্রাদেশিক সরকারের দাবিও উত্থাপিত হয়নি, যদিও এখানে যোগাযোগ

ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। গত ৪০ বছরের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভাবিতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে। যমুনা সেতু নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দুটি প্রধান ভূখণ্ডকে একত্র করেছে। পদ্মা সেতু এই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে। কাজেই বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ সৃষ্টি করলে জাতিকে বিভক্ত করা হবে।

- এক স্তরবিশিষ্ট সরকারের বদলে দুই স্তরবিশিষ্ট সরকার প্রশাসনিক ব্যয় বাড়াবে। প্রশাসনিক ব্যয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে না। অনেক ক্ষেত্রে অদক্ষ প্রশাসন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।
- অনেক দেশেই দেখা যায়, প্রাদেশিক সরকারসমূহ যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা জনস্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেন। এর ফলে ভারতের মতো দেশে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তবু ভারতে অনেক প্রাদেশিক সরকার রয়েছে, যাদের Bandit Democracy বা ডাকাতদের গণতন্ত্র বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের সরকার সাধারণ মানুষের কোনো কাজে আসে না। যেখানে প্রদেশ নেই, সেখানে প্রদেশ সৃষ্টি করলে বিচ্ছিন্নতাবাদের দাবি উঠতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেসব অঞ্চলে ভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠী রয়েছে, সেসব অঞ্চল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি তুলতে পারে। উপরন্তু প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিরা সুবিধা লাভ করেন, তাই দেশে আরও নতুন নতুন প্রাদেশিক সরকারের দাবি উঠতে থাকবে।

প্রদেশ সৃষ্টির সমস্যা অবশ্যই রয়েছে, তবু প্রদেশ সৃষ্টির কয়েকটি সুবিধাও রয়েছে, যেগুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

- প্রথমত, যে দেশে একটিমাত্র সরকার রয়েছে, সে দেশে কেন্দ্রীয় সরকারই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই সরকারে যদি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তার বিরুদ্ধে জনগণের কোনো রক্ষাকবচ থাকে না। যেসব দেশে প্রাদেশিক সরকার আছে, সেসব দেশে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সব ক্ষমতা থাকে না। বেশির ভাগ ফেডারেল রাষ্ট্রেই প্রাদেশিক সরকারের অধীনে পুলিশ থাকে। প্রাদেশিক সরকার অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবাহী হয় না। এর ফলে এ ধরনের সরকার একনায়কত্বের বিপক্ষে কাজ করে ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।
- দ্বিতীয়ত, সরকারের কাজ হলো মানুষের সেবা নিশ্চিত করা। যত ছোট সরকার হয়, জনসাধারণের তাতে অংশগ্রহণ করা সহজ হয়। সরকার বড় হলে সেটা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জনগণ সেই ধরনের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ

করতে পারে না, এমনকি তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথাও সরকারকে জানাতে পারে না। এর ফলে সরকারের কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ কমে যায়। বাংলাদেশে এটি একটি বড় সমস্যা। এখানে ১৬ কোটির বেশি লোক বাস করে অথচ সরকার মাত্র একটি। সব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এর ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সরকারের কাছ থেকে সব সুযোগ-সুবিধা ও ন্যায়বিচার পায় না। এ ধরনের সমস্যা যে শুধু বাংলাদেশেই দেখা দিচ্ছে তা নয়, পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেও নতুন প্রদেশ সৃষ্টির দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। তিন শ বছর ধরে যুক্তরাজ্যে এক স্তরবিশিষ্ট রাষ্ট্র পরিচালনার পর এখন সেখানে নতুন প্রদেশ, এমনকি নতুন রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে তাই একক সরকারের বদলে প্রাদেশিক সরকার স্থাপনের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

- তৃতীয়ত, যেসব রাজনীতিবিদ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবেন, তাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে যেহেতু প্রাদেশিক সরকার নেই, সেহেতু রাজনীতিবিদেরা এ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন না। প্রাদেশিক সরকার তাই রাজনীতিবিদদের মানোন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

প্রাদেশিক সরকার সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করলে মনে হয় যে বাংলাদেশের জন্য প্রাদেশিক সরকারের প্রয়োজন রয়েছে। তবে প্রশ্ন হলো, কতগুলো প্রদেশ বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট। যদি দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী থাকত, তাহলে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে প্রাদেশিক সরকার স্থাপন করা যেত। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠী সমরূপ। এখানে নতুন করে প্রদেশের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। একটি সমাধান হতে পারে দেশের ৬৪টি জেলাকে প্রদেশে উন্নীত করা। কিন্তু এর ফলে ব্যয়ভার অনেক বেড়ে যাবে। আরেকটি সমাধান হতে পারত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যে চারটি বিভাগ ছিল, সে চারটি বিভাগকে প্রদেশে উন্নীত করা। এটা করলে সরকারের ব্যয়ভার তত বাড়বে না কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে আটটি বিভাগ রয়েছে। এ ছাড়া কুমিল্লা ও ফরিদপুরে দুটি নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিভাগকে প্রদেশ করতে হলে কমপক্ষে ১০টি প্রদেশ করতে হবে। এতেও সমস্যার সমাধান হবে না। তার কারণ হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে এ ব্যবস্থায় বিভাগের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যদি পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়, তাহলে তা এই অঞ্চলের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে। এই বিবেচনায় বাংলাদেশে ১১টি প্রদেশ স্থাপন করা যেতে পারে। এদের আয়তন ও জনসংখ্যা সারণি-১০.১-এ দেখা যাবে।

## সারণি-১০.১
## বাংলাদেশে প্রস্তাবিত প্রদেশসমূহ

| প্রস্তাবিত প্রদেশের নাম | প্রস্তাবিত বিভাগের আয়তন (বর্গকিলোমিটারে) | জনসংখ্যা (হাজারে) | মোট জেলার সংখ্যা | মোট উপজেলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| পার্বত্য চট্টগ্রাম | ১৩,২৯৫ | ১৬,৬৪ | ৩ | ২৫ |
| চট্টগ্রাম | ৭,৭৭৫ | ১,০২,৯৫ | ২ | ২৮ |
| কুমিল্লা | ১৩,২৯৯ | ১,৭৫,৯৭ | ৬ | ৫৫ |
| সিলেট | ১২,৩৯৬ | ৯,৮০৮ | ৪ | ৩৮ |
| ময়মনসিংহ | ১০,৮৪৮ | ১০,৫৭৯ | ৪ | ৩৪ |
| ঢাকা | ১২,৬০১ | ২১,১৪৪ | ৮ | ৬৩ |
| ফরিদপুর | ৬,৭০২ | ৭০,০৯ | ৫ | ৩০ |
| বরিশাল | ১৩,২৯৭ | ৫,৬৭২ | ৬ | ৩৯ |
| খুলনা | ২২,০৬৫ | ১৫,৫৬৩ | ১০ | ৫৯ |
| রাজশাহী | ১৮,১৬৮ | ১৭,২২৮ | ৮ | ৭০ |
| রংপুর | ১৬,৩১৭ | ১৫,৬৭৫ | ৮ | ৬৮ |

সূত্র : Wikipedia. 2016. Divisions and Districts in Bangladesh.

সারণি-১০.১-এ প্রস্তাবিত বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল হবে ঢাকা বিভাগ, যার জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১১ লাখ। সবচেয়ে কম জনসংখ্যা রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। এর জনসংখ্যা ১৬.৬৪ লাখ। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদ দিলে ফরিদপুরের জনসংখ্যাও অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কম; এর জনসংখ্যা প্রায় ৭০ লাখ। আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় বিভাগ হলো খুলনা (২২,২৮৪ বর্গকিলোমিটার) আর সবচেয়ে ছোট বিভাগ হচ্ছে ফরিদপুর (৭,০০৫ বর্গকিলোমিটার)। ফরিদপুরকে প্রদেশ করার প্রয়োজন আছে কি না, সে সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত, আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এটি ছোট। দ্বিতীয়ত, পদ্মা সেতু হলে ফরিদপুরের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়ে যাবে। ফরিদপুরের দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা ফরিদপুরে যাওয়ার চেয়ে ঢাকায় আসা পছন্দ করতে পারে। তবু যদি ফরিদপুরকে প্রদেশ না করা হয়, তাহলে ফরিদপুরের উত্তরাঞ্চলে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। অবশ্য ফরিদপুরকে বিভাগ করার একটি

প্রধান যুক্তি হলো যে ঢাকা বিভাগের জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং ফরিদপুরকে ঢাকা বিভাগে রাখলে ঢাকা বিভাগের জনসংখ্যা প্রায় তিন কোটি হবে। এর ফলে এ অঞ্চলের জনগণ প্রদেশ সৃষ্টির সুফল থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তাই ফরিদপুরে একটি নতুন প্রদেশ স্থাপন করা যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা প্রদেশের মর্যাদা দেওয়ার বিপক্ষে অনেকে যুক্তি দেখাতে পারেন যে এর ফলে সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তবে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা হ্রাস করতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রামেই প্রথম প্রদেশ স্থাপন করা উচিত। শুধু প্রদেশ সৃষ্টি করলে হবে না, সেখানকার উপজাতিদের ভূমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশে প্রদেশ স্থাপনের পক্ষে প্রধান যুক্তি হলো যে এখানে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত। কেন্দ্রীয় সরকারের সব ক্ষমতা আবার নির্বাহী বিভাগের প্রধানের হাতে কেন্দ্রীভূত। কাজেই এখানে কোনো Checks and Balance অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে কোনো সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা নেই।

আয়তনে বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। এত ছোট দেশে প্রদেশ না করলেও চলে কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহৎ দেশ। ষোলো কোটি লোকের দেশে এক স্তরবিশিষ্ট সরকার পরিচালনা করে সরকারের পক্ষে সেবার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। কাজেই বাংলাদেশে প্রদেশ সৃষ্টির প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

## ১০.৩ বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার

আধুনিক অভিধায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার বাংলাদেশে ১৮৭০ সালে প্রথম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়।[২] ১৮৭০ সালে The Bengal Village Chowkidari Act আইন জারি করা হয়। এই আইনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পঞ্চায়েত মনোনয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৮৫ সালে The Bengal Local Self Government Act 1885 জারি করে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সর্বোচ্চ স্তরে জেলা বোর্ডকে স্থান দেওয়া হয়। এরপর মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড স্থাপন করা হয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে Bengal Village Self Government Act 1890-এর মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করা হয়। লোকাল বোর্ড তুলে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সংস্কার করা হয়। পল্লি অঞ্চলে এ ধরনের স্থানীয় সরকার গঠন করা ছাড়াও শহর অঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রকৃতপক্ষে

স্থানীয় সরকার বলা চলে না। কারণ, এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত সরকার, এদের অর্থায়ন করত সরকার। এই প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করত।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু স্থানীয় সরকারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকে এবং স্থানীয় সরকারগুলো অর্থের অপ্রতুলতার জন্য তাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় সরকারকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পাকিস্তানে প্রথম উদ্যোগ নেন সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা আইয়ুব সরকারের পেছনে কোনো গণসমর্থন ছিল না। দেশে আইয়ুব খান স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থাকে তাঁর সমর্থন গড়ে তোলার জন্য একটি কার্যকর সংস্থা হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। তিনি 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' প্রবর্তন করেন। আসলে এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ছিল না। এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষমতা পান। ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের অর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের জন্য সহজ ছিল। তাই আইয়ুব সরকার এই পদ্ধতি বেছে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের ওপর থানা পরিষদ, থানা পরিষদের ওপর জেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদের ওপর বিভাগীয় পরিষদ স্থাপন করা হয়। কিন্তু এই পরিষদসমূহের মধ্যে এক ইউনিয়ন কাউন্সিল ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় সরকারে সরকারি কর্মকর্তাদের সভাপতি নিয়োগ করা হয়। এর ফলে সামগ্রিকভাবে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। মোটকথা, এই স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থা আইয়ুব খানের একনায়কত্বের খুঁটি হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে ১৯৬৯ সালে এক প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ এই স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থার ওপর অনাস্থা প্রকাশ করে।

স্বাধীনতার পর সংবিধানে স্থানীয় সরকারের বিধান রাখা হয় কিন্তু স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১৯৭৫ সালে District Administration Act. 1975 জারি করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে প্রশাসনে কর্মরত ব্যক্তি অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধি অথবা রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা গভর্নর নিয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার আগেই এক সামরিক অভ্যুত্থানে সরকার উৎখাত হয় এবং বাংলাদেশে জেলা গভর্নর প্রথা চালু করা যায়নি। এরপর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। সামরিক শাসনকর্তারা স্থানীয় সরকারকে গণসমর্থন তৈরির কাজে ব্যবহার করতে চান। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সময়কালে সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। এর একটি বড় কারণ হলো, গ্রাম সরকার ইউনিয়ন

পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা এর বিরোধিতা করেন। উপরন্তু গ্রাম সরকার-ব্যবস্থা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা শুরু হয়; এতে এ উদ্যোগ বিতর্কিত হয়ে পড়ে। ১৯৮২ সালে গ্রাম সরকার-ব্যবস্থা বিলোপ করা হয় এবং স্থানীয় সরকার পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৮২ সালে থানা পরিষদের স্থলে উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। Local Government (Upazila Administration) Ordinance, 1982 জারি করে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর কাজের সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় উপজেলা পরিষদকে। এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক সরকার উপজেলা পরিষদকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করে। এর ফলে উপজেলা পরিষদ আবার বিতর্কিত হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এলে উপজেলা পরিষদ তুলে দেওয়া হয়। এরপর ১৯৯৬ সালে নতুন সরকার নির্বাচিত হলে উপজেলা-ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করা হয়।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এখানে সামরিক শাসকেরাই স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারই এ ধরনের উদ্যোগ বিতর্কিত হয়েছে। জেনারেল আইয়ুব খান স্থানীয় সরকারভিত্তিক বুনিয়াদি গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করেছিলেন কিন্তু প্রবল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে তাঁর সে উদ্যোগ সফল হয়নি। পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান গ্রাম সরকার-ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসমর্থন সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর সে উদ্যোগও সফল হয়নি। তৃতীয় পর্যায়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ উপজেলা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সামরিক শাসনের পক্ষে সমর্থন সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সে প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। এর পরবর্তীকালে ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন করে উদ্যোগ নেয়। এই সরকারকে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন দেয় সামরিক বাহিনী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ সমাপ্ত হলে আবার রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে এবং স্থানীয় সরকারের অনেক ক্ষমতা কেড়ে নেয়। উপরন্তু আইন সংশোধন করে নির্বাচিত এমপিদের স্থানীয় সরকার তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। যদিও ১৯৭২ সালের সংবিধানে জেলা পরিষদের বিধান করা হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ বাংলাদেশে গত ৪৫ বছরের ইতিহাসে, কখনো নির্বাচিত জেলা পরিষদ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতার পেছনে দুটি কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, সামরিক শাসকেরা যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তাঁদের পেছনে অর্থবহ রাজনৈতিক সমর্থন থাকে না। দেশে একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন দেওয়ার জন্য সামরিক শাসকেরা স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টা দেশের গণমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। বরং এ ধরনের উদ্যোগের ফলে দেশে গণ-আন্দোলন দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, যাঁরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন,

তাঁরা উপজেলা অথবা জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতি পছন্দ করেন না। কারণ, এ ধরনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পরবর্তীকালে সংসদ সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেন। সংসদ সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মন্ত্রীরাও বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকার চান না। এর ফলে বাংলাদেশে নির্বাচিত জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি এবং নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের সংসদ সদস্যদের আজ্ঞাবহ করে রাখার জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁরা শুধু ইউনিয়ন কাউন্সিলের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজি হন এই শর্তে যে ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহ সরকারের আদেশে পরিচালিত হবে। এই অবস্থাতে বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা কম।

**লেখচিত্র-১০.১**
**বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের কাঠামো**

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন
স্থানীয় সরকার বিশেষ এরিয়া
পল্লি অঞ্চলে স্থানীয় সরকার
শহরাঞ্চলে স্থানীয় সরকার
আঞ্চলিক পরিষদ
রাজা/সার্কেল প্রধান
সিটি করপোরেশন
পার্বত্য জেলা কাউন্সিল
জেলা কাউন্সিল
মৌজাভিত্তিক কারবারি ব্যবস্থা গ্রাম প্রধান
মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা
মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা
উপজেলা পরিষদ
উপজেলা পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ
ওয়ার্ড
ওয়ার্ড

বাংলাদেশে বর্তমানে তিন ধরনের স্থানীয় সরকার রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে স্থানীয় সরকার রয়েছে, তা দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এই স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। এখানে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে তিনটি পার্বত্য জেলায় তিনটি জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও পৌরসভা স্থাপন করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদকে কতগুলো ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে দুই ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রথমত, পল্লি অঞ্চলে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে জেলা পরিষদ। তার নিচে উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদের নিচে ইউনিয়ন পরিষদ। তবে এই ব্যবস্থা শহরাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য নয়। শহর অঞ্চলে বড় শহরগুলোতে সিটি করপোরেশন এবং ছোট শহরগুলোতে তিন ধরনের মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারগুলোর নিম্নলিখিত দুর্বলতা রয়েছে :

১. অনির্বাচিত অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত জেলা পরিষদ। ১৯৭২ সালের সংবিধানে জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোনো জেলা পরিষদ নির্বাচন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে জেলা পরিষদে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখনো জেলা পরিষদ একটি সরকারি সংস্থা এবং একে স্থানীয় সরকারের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

২. সরকারের নিয়ন্ত্রণ। সব স্থানীয় সরকারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রায় নিরঙ্কুশ। সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করতে পারে এবং স্থায়ীভাবে অপসারণ করতে পারে। অবশ্যই স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কোনো অপরাধ করলে তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার অসুবিধা হলো, সরকারই এখানে অভিযোগ গ্রহণ করে, অভিযোগের তদন্ত করে ও তদন্তের ভিত্তিতে বিচার করে। এ ধরনের ব্যবস্থায় সুষ্ঠু বিচারকাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। আসলে অনেক ক্ষেত্রেই সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এর ফলে নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। নির্বাচনী ব্যবস্থায় কোনো প্রতিনিধি দোষ করলে তাঁকে নির্বাচকেরা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে পারে। কিন্তু এই ক্ষমতা সরকার প্রয়োগ করলে তার

অপব্যবহারের আশঙ্কা দেখা দেয়। এর একটি সমাধান হতে পারে যে সরকার স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত করবে কিন্তু শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকবে না। এর জন্য একটি স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এই কমিশন অভিযুক্তের বক্তব্য ও তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করে যে সুপারিশ দেবে, সেই সুপারিশই সরকার গ্রহণ করবে। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করেছিল। কিন্তু নির্বাচিত সরকার এই কমিশন বাতিল করে দিয়েছে।

৩. অর্থের জন্য জাতীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা। ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মোট ব্যয়ের ৩০ শতাংশ নিজেদের আয় থেকে বহন করে। বাকি ৭০ শতাংশ অর্থ আসে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বেতন, সচিবের বেতন, চৌকিদারদের বেতন দিয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ব্যয়ও সরকারই বহন করে। উপজেলা পরিষদে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা আরও বেশি। উপজেলা পরিষদ পরিচালনায় শুধু সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নই যথেষ্ট নয়, উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় নির্বাচিত সংসদের পরামর্শও বাস্তবায়ন করতে হয়। জেলা পরিষদে কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। সরকারের আদেশে ও মর্জি অনুসারে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয়।

৪. স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে সরকারের প্রাধান্য। উপজেলা পরিষদের প্রায় সব কর্মকর্তা সরকারি কর্মচারী। তাঁদের শাস্তি দেওয়ার বা পুরস্কৃত করার ক্ষমতা উপজেলা পরিষদের নেই। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রেই উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের সঙ্গে সরকার কর্তৃক মনোনীত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলে। ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের নিয়োগ ও চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের নেই। এই ক্ষমতাও সরকারি কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়েছে।

৫. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের প্রাধান্য। স্থানীয় সরকার বিভাগের বেশির ভাগ প্রকল্পের বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকার করে না। এগুলোর বাস্তবায়ন করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। এর ফলে স্থানীয় সরকারের সব বড় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের আওতাভুক্ত নয়। ২০১৬-১৭ সালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট ছিল ১৬,৪৬২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৮,১৬৮.৫ কোটি টাকা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নামে বরাদ্দ করা হয়েছে।

অন্যদিকে স্থানীয় সরকারের অধীন সব স্থানীয় সরকারকে (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাসমূহ) রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে সর্বমোট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৪,৫৭৫.৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে যে পরিমাণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ও বড় প্রকল্পসমূহ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ একটি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এবং এই সংস্থার ওপর স্থানীয় সরকারের কোনো খবরদারি নেই। তাই বাস্তবে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত।

৬. স্থানীয় সরকারে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালীদের (যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা Elites বা অভিজাততন্ত্র বলে থাকেন) প্রাধান্য। স্থানীয় সরকারে যেসব প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাঁদের বেশির ভাগই উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির (যাঁরা হঠাৎ টাকা পেয়ে বড়লোক হয়ে গেছেন)। প্রান্তজনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ক্ষীণ। অনেক নির্বাচিত প্রতিনিধি স্থানীয় সরকারকে তাঁদের আয়ের একটি উৎস হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁদের অনেকে আদৌ পল্লি অঞ্চলে থাকেন না; তাঁরা শহরে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং অনেকেই স্থানীয় সরকারকে মূলত শোষণের কাজে ব্যবহার করে থাকেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই বাংলাদেশে পল্লি অঞ্চলে 'টাউট' ব্যবস্থা চালু রেখেছেন।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রশ্ন ওঠে যে বাংলাদেশে আদৌ কোনো স্থানীয় সরকার আছে কি না। *Encyclopaedia of Social Sciences* গ্রন্থে স্থানীয় সরকারের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

> Local self-government' is the government which has a territorial non-sovereign community having/possessing the legal right and the necessary organisation to regulate its own affairs.

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ড সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং এরা অবশ্যই সার্বভৌম নয়। কিন্তু এদের নিজেদের বিষয় নিজেদের মতো করে পরিচালনার জন্য যথাযথ সংগঠন এবং আইনগত অধিকার নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে স্থানীয় সরকার নেই। কেননা, তাদের নিজেদের কার্যক্রম নিজেদের মতো করে পরিচালনা করার পুরোপুরি আইনগত অধিকার এবং সংগঠন নেই। বাংলাদেশে তাই স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। এর ফলে এখানে স্থানীয় জনগণের ইচ্ছার চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার রয়েছে, সেখানেও তারা একটি স্বতন্ত্র সরকার নয়, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র।

## ১০.৪ বিকেন্দ্রীকরণের বিকেন্দ্রীকরণ

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কুফল হ্রাস করতে পারে। তবে এটিই শুধু বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য নয়। বিকেন্দ্রীকরণের একটি বড় লক্ষ্য হলো এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে বিত্তহীন এবং ক্ষমতাবিহীন সাধারণ মানুষ সরকার পরিচালনায় অংশ নিতে পারে। মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক জেফারসন বলতেন, যখন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তখন সরকারের অধঃপতন ঘটে। আদর্শ সরকারের লক্ষ্য শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা নয়, এর লক্ষ্য হলো যাতে প্রতিটি মানুষ তার অধিকার ভোগ করতে পারে। এর জন্য এমন প্রতিষ্ঠানের দরকার, যেখানে প্রতিটি মানুষের বক্তব্য শোনা হবে। এ ধরনের ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা স্থানীয় সরকারে হস্তান্তর করলেই চলবে না, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যেসব দেশে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়, সেসব দেশে কেন্দ্র থেকে নিচের পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ ঠিকই হয় কিন্তু বিকেন্দ্রীকৃত সরকারের ক্ষমতা তাতে সব সময় জনগণের কাছে পৌঁছায় না। এর জন্য প্রয়োজন বিকেন্দ্রীকরণের বিকেন্দ্রীকরণ, যাকে সমাজতত্ত্ববিদেরা নাম দিয়েছেন Double Devolution। অ্যান্থনি গিডেন্স এ প্রক্রিয়াকে বলছেন Double Democratization বা গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণ। নিচের পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটবে না। স্থানীয় সরকারকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হতে হবে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সরকার এবং জনগণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকতে হবে। এ ধরনের সম্পর্ক শুধু ক্ষমতা হস্তান্তর করলেই হবে না, এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। এ কাজ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে সিভিল সমাজের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। যদি ক্ষমতা হস্তান্তরের পাশাপাশি সিভিল সমাজ সুসংগঠিতভাবে কাজ করতে পারে, তবেই ক্ষমতা হস্তান্তরের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

আইনের সংশোধনের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে তার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে না-ও পৌঁছাতে পারে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ প্রতিপত্তিশালীরা অত্যন্ত ক্ষমতাবান। সরকারের সব উদ্যোগকে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের বঞ্চনা বিকেন্দ্রীকরণের পরও বেড়ে যেতে পারে। ল্যারি ডায়মন্ড বলছেন :

> Decentralized political system can create niches for authoritarian figures (or movements) to consolidate their fiefdoms, safe from interventions from central authorities.[৩]

বিকেন্দ্রীকরণ দরিদ্রদের জন্য কত উপকারী, সে সম্পর্কে তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। রাজকৃষ্ণের মতে, উন্নয়নশীল দেশসমূহের পল্লি অঞ্চলে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে Elite বা প্রতিপত্তিশালীদের দৌরাত্ম্য সর্বত্র বিরাজ করছে। এর ফলে স্থানীয় নির্বাচিত সরকারসমূহ সব সময় দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। রাজকৃষ্ণ বলছেন :

> The interests of the poor are seldom represented effectively in these bodies. A massive misappropriation of resources and project benefits by dominant rural elites with the collaboration of the corrupt segment of the development bureaucracy is a regular outcome of many RD programmers— even when representative local bodies have limited or only advisory power. If their power is increased, this misappropriation is only likely to increase. (Raj Krishna, 'Concepts and Policies of Rural Development', *Rural Development in Asia and the pacific*).[8]

এই মতের প্রতিধ্বনি করে Diana Conyers লিখেছেন :

> There is a very real danger that most forms of decentralization will merely strengthen the position of the local elite and thus perpetuate existing inequalities.[৫]

সব বিশ্লেষক অবশ্য এ কথা মানতে রাজি নন যে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে শুধু গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরাই উপকৃত হন। রন্ডিনেলি বলছেন, বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রতিপত্তিশালীদের প্রভাব হ্রাস পেতে পারে। রন্ডিনেলি লিখেছেন :

> Decentralization can offset the influence or control over development activities by entrenched local elites who are often unsympathetic to national development policies and insensitive to the needs of the poorer groups in rural communities.[৬]

বস্তুত তাত্ত্বিক দিক থেকে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে গরিবদের অপকার ও উপকার দুটিই হতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণের প্রকৃত প্রভাব শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই করা যাবে না। এ সম্পর্কে মাঠপর্যায়ের তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ৯টি সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে রন্ডিনেলি ও চিমা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়নি এবং বিকেন্দ্রীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেনি।[৭] Naomi Caiden ও Aaron Wildavsky নামে দুজন বিশেষজ্ঞ একই ধরনের মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, স্থানীয় প্রতিপত্তিশালীরা দরিদ্রের জন্য গৃহীত প্রকল্প কুক্ষিগত করেন এবং এর ফলে দরিদ্র জনগণের উপকার হয় না।[৮]

এ প্রসঙ্গে প্রণব বর্ধন যথার্থই লিখেছেন :

> After all, the logic behind decentralization is not just about weakening the central authority nor is it about preferring local elites to central

authority, but it is fundamentally about making governance at the local level more responsive to the felt needs of the large majority of the population. To facilitate this, the state, far from retreating into the minimalist role of classical liberalism, may sometimes have to play certain activist roles: enabling (if only as a catalyst) mobilization of people in local participatory development; neutralizing the power of local oligarchs; providing supralocal support in the form of pumppriming local finance; supplying technical and professional services toward building local capacity; acting as a watchdog for service quality standards, evaluation and auditing; investing in larger infrastructure; and providing some coordination in the face of externalities across localities.[৯]

বিকেন্দ্রীকরণের সুফল দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে দরিদ্রদের প্রতিরোধক্ষমতা (Countervailing Power) বাড়াতে হবে। এর জন্য দরিদ্রদের চেতনাকে শাণিত করতে হবে। দরিদ্রদের সংগঠিত করতে হবে। উপরন্তু ওপর থেকে বিকেন্দ্রীকরণ চাপিয়ে দিলে চলবে না, দরিদ্র ও সাধারণ মানুষকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলনের ফলে সাফল্য অর্জিত হলে এ সাফল্য টেকসই (Sustainable) হবে।

স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য দুই পক্ষকেই উদ্যোগ নিতে হবে। প্রথমত, স্থানীয় সরকারকে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যাবলি সম্প্রসারণ করতে হবে এবং এসব কার্যাবলিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অনেক রাষ্ট্রে স্থানীয় সরকারসমূহ নিম্নতম পর্যায়ে ওয়ার্ড সভা নামে ভোটারদের সংগঠন গড়ে তোলে। এই ওয়ার্ড সভাতে সব প্রকল্পের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয় এবং ওয়ার্ড সভার সদস্যদের দ্বারা সরকারের ব্যয় যাতে অপব্যবহৃত না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সাধারণ মানুষের সমর্থন চাওয়া হয়। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো রাষ্ট্রে স্থানীয় সরকারের বাজেট অনুমোদনের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের সমর্থন চাওয়া হয়। এর ফলে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়।

শুধু স্থানীয় সরকারই উদ্যোগ নেবে না, স্থানীয় জনগণকেও উদ্যোগ নিতে হবে। তাদের তৃণমূল সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং এই সংগঠনগুলো জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। যেসব অঞ্চলে প্রাণবন্ত বেসরকারি সংগঠন রয়েছে, সেসব অঞ্চলে জনগণের পক্ষে অংশগ্রহণ সহজ। কাজেই সরকারেরও দায়িত্ব হবে সব অঞ্চলে তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনগুলোকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া।

## ১০.৫ উপসংহার

বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে গিয়ে ২০০৮ সালে উইলিয়াম এফ ফক্স ও বালকৃষ্ণ মেনন লিখেছেন :

> Over the decades, the local government system in Bangladesh has been 'more an area of policy experimentation than one of stable institutional development' (Rahman and Islam 2002: 154). Decentralization reforms are debated every few years under governments of all hues, various committees are launched, recommendations are made, and even piecemeal actions are taken. Yet, to date, an accountable and capable local state that upholds public interests at the local level remains elusive to Bangladesh.[১০]

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণের কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে মাত্র।

বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিকেন্দ্রীকরণের কাঠামো সম্পর্কে সবার একমত হওয়া। এ বিষয়ে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। কেউ জেলা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করতে চান, কেউ জেলা কাউন্সিল চান না। কেউ উপজেলা পরিষদ চান, তবে তাকে পুরোপুরি ক্ষমতা দিতে চান না। আবার কেউ উপজেলা পরিষদ আদৌ চান না। সর্বনিম্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে তত মতবিরোধ নেই। শুধু এরশাদপন্থী জাতীয় পার্টি প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে। অন্য কোনো দলই এখন পর্যন্ত এ দাবি তোলেনি।

বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রথমে সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে বিকেন্দ্রীকরণের ধরন হবে এক প্রকারের, আর যদি প্রাদেশিক সরকার না থাকে, তাহলে বিকেন্দ্রীকরণের ধরন হবে অন্য প্রকারের। বাংলাদেশে বর্তমানে চার ধরনের সরকারি ব্যবস্থা রয়েছে: কেন্দ্রীয় সরকার, জেলা সরকার, উপজেলা সরকার ও ইউনিয়ন কাউন্সিল সরকার। যদি জনসংখ্যার দিক থেকে স্থানীয় সরকারের বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে বর্তমান ব্যবস্থার অবশ্যই যৌক্তিকতা রয়েছে। কিন্তু আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আয়তন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বাংলাদেশের মতো অতি ক্ষুদ্র দেশে এই চার ধরনের সরকারের জন্য রাজস্ব বিভাজন অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে বর্তমানে স্থানীয় সরকারসমূহ মূলত কেন্দ্রীয় অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু দেশটি অত্যন্ত ছোট, সেহেতু এখানে এমন কর ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত শক্ত, যেখানে স্থানীয় সরকারসমূহ তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ নিজস্ব কর থেকে সংগ্রহ

করতে পারবে। যদি উচ্চ আয়ের ওপর ক্রমবর্ধিষ্ণু (Progressive) কর ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়, তাহলে আয়কর ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখতে হবে; অন্যথায় করদাতারা তাদের আয় বিভিন্ন স্থানীয় সরকারের এলাকায় ছড়িয়ে দেখাবে, যাতে তাদের মোট করের পরিমাণ কমে যায়। আমদানি-রপ্তানি কর আদায়ের ক্ষমতাও স্থানীয় সরকারকে দেওয়া সম্ভব নয়; কেননা, মাত্র কয়েকটি কেন্দ্রের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি পরিচালিত হয়। এর ফলে অল্প কিছু স্থানীয় সরকার অনেক কর আদায় করতে পারবে কিন্তু দেশের বেশির ভাগ স্থানীয় সরকারই এ ধরনের করের অংশ পাবে না। মূলত সম্পত্তির ওপর আরোপিত কর এবং বিক্রয় কর এ দুটি করের ওপর স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্থানীয় সরকারের পক্ষে ভ্যাটের মতো বিক্রয় করের ব্যবস্থা করাও সহজ হবে না।

রাজস্ব আদায়ের এবং জনগণের অংশগ্রহণের সমস্যা বিবেচনা করে বাংলাদেশের জন্য দুই ধরনের স্থানীয় সরকারের কাঠামো বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক. প্রাদেশিক সরকারের অধীন স্থানীয় সরকার। বাংলাদেশে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তিন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার যুক্তিযুক্ত হবে না। তিন পর্যায়ের সরকারের জন্য স্বতন্ত্র কর ব্যবস্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। যদি বাংলাদেশে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে দ্বিস্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এখানে জেলা পরিষদ তুলে দেওয়া যেতে পারে এবং উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

খ. যদি বর্তমান কাঠামো বহাল থাকে, অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাতে শক্তিশালী জেলা পরিষদ গড়ে তুলতে হবে এবং জেলা পরিষদের কার্যাবলি সম্প্রসারণ করতে হবে ও তাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিরও সুযোগ দিতে হবে। এ ছাড়া উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে প্রকৃত অর্থে (বর্তমানে চালু ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া) শক্তিশালী করতে হবে। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

১. কর্মকর্তা-কর্মচারী : কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কেন্দ্রীয় সরকার-নিয়ন্ত্রিত কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে স্থানীয় সরকার চালানো সঠিক হবে না। স্থানীয় সরকারকে তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম স্থগিত করে দিতে পারে এবং তাদের অপসারণও করতে পারে। এই ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থার পরিপন্থী। যদি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁদের অপসারণের ক্ষমতা জনগণের হাতেই দিতে হবে। অর্থাৎ পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ সে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। যদি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হন, শুধু তাঁদের অপসারণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া যেতে পারে। ফৌজদারি অপরাধ নয়, এ ধরনের অপরাধের জন্য নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত করতে পারে কিন্তু তাঁদের শাস্তির ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া ঠিক হবে না। এই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
৩. রাজস্ব: বাংলাদেশে বর্তমানে যে রাজস্ব-ব্যবস্থা চালু আছে, সে ব্যবস্থাতে স্থানীয় সরকাররা অদূর ভবিষ্যতে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে না। অধিকাংশ স্থানীয় সরকারকে তাই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এই অনুদান রাজনৈতিক কারণে অপব্যবহার করে থাকে। এই ধরনের অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য একটি স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এই কমিশন স্থানীয় সরকারসমূহের জন্য অর্থ বরাদ্দের নীতিমালা অনুমোদন করবে এবং সরকার এই নীতিমালা অনুসারে অর্থ বরাদ্দ করছে কি না, সে সম্পর্কে পরিবীক্ষণ করবে।
৪. স্থানীয় সরকারে প্রান্তজনের অংশগ্রহণ: বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন পল্লি অঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা। এর ফলে দুর্বল জনগোষ্ঠী স্থানীয় সরকারকে ব্যবহার করতে পারে না। স্থানীয় সরকারে মহিলা, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, অন্যান্য দুর্বল জনগোষ্ঠী ইত্যাদির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকারে এদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সবশেষে বাংলাদেশে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রয়োজন হলো প্রতিপত্তিশালীদের ক্ষমতা হ্রাস। এই উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র বেসরকারি সংগঠনসমূহকে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকারে ওয়ার্ড সভা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সত্যিকার অর্থে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। সুতরাং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি নিয়মিত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

## পাদটীকা

১. Anthony Giddens. 1999. Runaway World: *How Globalization Is Reshaping Our Lives*. London: Profile books. 76.

২. Kamal Siddique (ed) 1994. *Local Government in Bangladesh*, Dhaka; University Press Ltd.

৩. Larry Diamond. 1999. *Developing Democracy: Towards Consolidation* Baltimore: John Hopkins University Press, 102-138

৪. Raj Krishna. 1985, 'Concepts and policies of Rural Devolopment', *Rural Development in Asia and Pacific* Manila: ADB, 38

৫. Diana Conyers. 1985. 'Decentralization: A Framework for Discussion', *Decentralization, Local Government Instutition and Resource Mobilization*. ed Hasnat a Hye. Comilla: BARD, 363

৬. Dennis A. Rondinelli. 1981. 'Government Decentralization in Comparative Perspective. Theory and Practice in Developing Countries', *International Review of Administrative Scince* Vol. XL, Vii. No. 2, Page-1, 36.

৭. Naomi Caiden and Aaron Wildavosky. 1974. *Planning and Budgeting in Poor Countries*. New York John Wiley, 82

৮. G Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli. 1983. *Implementing Programs in Asia*. Nagoya: UNCRD

৯. Pranab Bardhan. 2002 'Decentralization of Governance and Devolopment', *The Journal of Economic Perspectives* Vol. 16. No. 4 (autumn), 202-213.

১০. Wlliam F. Fox and Balkrishana Menon. 2008 'Decentralization in Bangladesh: Change has been elusive'. Atlanta: Andrew Young School of Policy studies (Mimeo)

## চতুর্থ খণ্ড

# নির্বাচন : আমার ভোট আমি দেব

Elections belong to the people. It's their decision. If they decide to turn their back to the fire and burn their behinds, then they will have to sit on their blisters.

—Abraham Lincoln

A vote is like a rifle; its usefulness depends upon the character of the user

—Theodore Roosevelt

Elections determine who is in power, but they do not determine how power is used

—Paul Collier

১১

# ভোটের খেল : সংখ্যালঘু-নির্বাচিত সরকার ও এক দিনের বাদশা

## ১১.১ প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ নাট্যকার টম স্টপার সুন্দরভাবে বলেছেন, 'It is not the voting that is democracy, it is the counting' শুধু ভোটের ব্যবস্থা থাকলেই গণতন্ত্র হয় না। ভোট কীভাবে হিসাব করা হবে, তার ওপরই নির্ভর করে ভোটের ফলাফল। যোসেফ স্তালিন তাই বলেছেন, 'The people who cast the vote decide nothing, the people who count the vote decide everything.' যাঁরা ভোট পরিচালনা করেন, তাঁদের কাজ শুধু জাল ভোট প্রত্যাখ্যান করাই নয়, তাঁদের সবচেয়ে বড় কাজ হলো ভোট গণনার সঠিক পদ্ধতি নিরূপণ।

গণতন্ত্রের ধারণাটি অত্যন্ত সহজ কিন্তু অনেক সময় এর বাস্তবায়ন সহজ নয়। তত্ত্ব অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না। ধরুন, একটি দেশে ১০টি দল রয়েছে। ১০টি দলই প্রায় সমান জনপ্রিয়। সবচেয়ে জনপ্রিয় দলটি ১১ শতাংশ ভোট পায় আর বাকি ৯টি দল মিলে ৮৯ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পায়। সবচেয়ে বেশি ভোট যে দল পায়, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করতে হলে যে দলটি ১১ শতাংশ ভোট পেয়েছে, তাকেই নির্বাচিত বলে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। অবশ্যই এ দলটি অন্য ৯টি দলের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। কিন্তু দেশের ৮৯ শতাংশ ভোটার এ দলকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না। এ পরিস্থিতিতে যে দল বেশি ভোট পায়, তাকে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে, সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ড্যানিস সি মুয়েলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিরূপণ সম্পর্কে ৮টি সূত্রের তালিকা প্রণয়ন করেছেন :[১]

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধি (Majority rule): এই সূত্র অনুসারে যে ব্যক্তি ৫০ শতাংশের একটি ভোট বেশি পাবেন, তাঁকেই নির্বাচিত করা হবে।

২. উপর্যুপরি ব্যর্থ নির্বাচনের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থী নির্বাচন (Majority rule, run off election): যদি কোনো প্রার্থী প্রথম নির্বাচনে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পান, তাহলে যে প্রার্থী নির্বাচনে সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে আবার নির্বাচন হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচনের মাধ্যমে যাঁরা সবচেয়ে কম ভোট পান, তাঁদের বাদ দিয়ে নির্বাচন চলতে থাকবে। একপর্যায়ে যখন মাত্র দুজন প্রার্থী থাকবেন, তখন অবশ্যই একজন প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পাবেন।

৩. সবচেয়ে বেশি ভোট (Plurality rule): যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন (তা ৫০ শতাংশের অনেক কম হলেও), তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে এবং তাঁর ওপর দেশের শাসনভার দেওয়া হবে।

৪. কনডরসেট নিয়ম (Condercet criteron): দুইয়ের অধিক প্রার্থী হলে প্রতি দুজন প্রার্থী নিয়ে একটি জোড়া তৈরি করতে হবে এবং প্রতিটি জোড়ায় আলাদা করে ভোট নেওয়া হবে। যে ব্যক্তি এই ধরনের নির্বাচনে সব প্রার্থীকে পরাজিত করবেন, তাঁকেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

৫. হেয়ার ব্যবস্থা (The Hare system): ভোটাররা প্রত্যেক প্রার্থীর মান অনুসারে নম্বর দেবেন। যিনি সবচেয়ে কম নম্বর পাবেন, তাঁকে প্রথমে বাদ দেওয়া হবে এবং আবার নির্বাচন করে যিনি সবচেয়ে কম নম্বর পাবেন, তাঁকে বাদ দেওয়া হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থীর সংখ্যা দুই না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের বাছাই নির্বাচন চলবে। দুজন প্রার্থী যখন হবেন, তখন তাঁদের মধ্যে যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন, তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

৬. কুম্বস ব্যবস্থা (The Coombs system): প্রত্যেক ভোটার প্রার্থীদের মধ্যে যাঁকে সবচেয়ে অযোগ্য মনে করেন, তাঁকে চিহ্নিত করেন। যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোটারদের দ্বারা অযোগ্য বিবেচিত হবেন, তাঁর নাম বাদ দেওয়া হবে। একই পদ্ধতিতে আবার নির্বাচন হবে ও সবচেয়ে অজনপ্রিয় প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হবে। এভাবে বাদ দিতে দিতে যে প্রার্থী শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবেন, তাঁকে নির্বাচিত করা হবে।

৭. অনুমোদন ভোট (Approval voting): প্রত্যেক ভোটার সবচেয়ে পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দেবেন। যিনি সবচেয়ে বেশি সর্বোচ্চ পর্যায়ের পছন্দের ভোট পাবেন, তাঁকেই নির্বাচিত করা হবে।

৮. বরদা গণনাপদ্ধতি (The Borda Count): ভোটাররা প্রত্যেক প্রার্থীর স্বতন্ত্র মূল্যায়ন করবেন। যে প্রার্থী মূল্যায়নে সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

ওপরে উল্লেখিত প্রতিটি পদ্ধতিরই দুর্বলতা ও সবলতা রয়েছে। বাস্তবে এদের প্রয়োগের সময়ে দুটি বিষয় দেখতে হয়। (১) নির্বাচন সম্পন্ন করতে কত সময় লাগবে ও (২) নির্বাচনে কত ব্যয় হবে। ফ্রান্সসহ কিছু দেশে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কয়েক পর্যায়ে হতে পারে। তবে সংসদীয় ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে, সেখানে ওপরের সূত্রগুলোর বেশির ভাগের প্রয়োগ সম্ভব নয়। যদি প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য বারবার ভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হয়, তবে তার বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র রয়েছে অথবা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী কলেজ ব্যবস্থা (যাতে কলেজের সদস্যরা সংসদ সদস্যদের মতো নির্বাচিত হন) রয়েছে, সেখানে মূলত দুই ধরনের পদ্ধতি দেখা যায়। একটি হলো যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান (তাঁর প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ যত কমই হোক না কেন), তাঁকে নির্বাচিত করা। আরেকটি পদ্ধতি হলো আনুপাতিক হারে নির্বাচন। আনুপাতিক ব্যবস্থাতে প্রতি দল যে পরিমাণ ভোট পায়, সে পরিমাণ আসন তারা পায়। এর ফলে সরকার পরিচালনা করতে হলে ৫০ শতাংশের বেশি ভোটারদের প্রতিনিধিদের একত্র করতে হবে। যেসব দেশে আনুপাতিক নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু নেই, সেসব দেশে সংখ্যালঘু ভোট পেয়েও দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশের শাসন করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, তারা পুরো মেয়াদে দেশ শাসন করে। একবার নির্বাচিত হলে চার-পাঁচ বছর (যা মেয়াদকাল) ভোটাররা কী ভাবছেন, সেটার তোয়াক্কা না করে দেশ শাসন সম্ভব। এ ধরনের পদ্ধতিতে ভোটাররা রাষ্ট্রের মালিক নন, তাঁরা মাত্র এক দিনের বাদশা। নির্বাচনের দিন ছাড়া ভোটারদের রাষ্ট্রপরিচালনায় কোনো ভূমিকা থাকে না। অবশ্য এ ধরনের ব্যবস্থা মোকাবিলা করার জন্য কোনো কোনো রাষ্ট্রে গণভোট বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে নির্বাচনের জন্য যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা কতটুকু গণতান্ত্রিক এবং এর উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করা। প্রবন্ধটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রস্তাবনার পর দ্বিতীয় খণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যেখানে সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত দলকে নির্বাচিত করা হয়, সেখানে শাসনব্যবস্থা কতটুকু গণতান্ত্রিক, তা পরীক্ষা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত (Plurality Rule) ভোট-ব্যবস্থার সুফল এবং কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে আনুপাতিক নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর সুবিধা-অসুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে গণভোট (Referendum) এবং নির্বাচিত সরকারকে প্রত্যাহারের (Recall) সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে

বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## ১১.২ সবচেয়ে বেশি ভোটে নির্বাচিত সরকারের অভিজ্ঞতা

সাধারণত যেখানে সংসদীয় সরকার রয়েছে, সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি ভোটে (ভোটের পরিমাণ যত কমই হোক না কেন) সাংসদেরা নির্বাচিত হন এবং সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার রয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে হয় না। জনগণ প্রত্যক্ষ ভোট দিয়ে একটি নির্বাচনী কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। যে প্রার্থী নির্বাচনে কলেজে বেশি ভোট পান, তিনিই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু সব সময় যে প্রার্থী নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পান, সে প্রার্থী নির্বাচনী কলেজে সবচেয়ে বেশি ভোট পান না।

প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবেন, এটাই সবার প্রত্যাশা।

অথচ ২০১৬ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সর্বশেষ হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প মোট ভোট পান ৬ কোটি ২৯ লাখ ৭৯ হাজার ৬৩৬ ভোট। হিলারি ক্লিনটন পান ৬ কোটি ৫৮ লাখ ৪৪ হাজার ৬১০ ভোট। (http:///time.com)। গণভোটে হিলারি ২৮ লাখ ৬৪ হাজার ৯৭৪টি ভোট বেশি পান। অথচ নির্বাচনী কলেজ ভোটে হিলারি নির্বাচনে হেরে যান। নির্বাচনী কলেজে ট্রাম্প পান ৩০৬ ভোট আর হিলারি পান ২৩২ ভোট। এই নির্বাচনে সাধারণ ভোটারদের মোট ভোট পড়ে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ৫৩ হাজার ৯১৬টি। মোট প্রদত্ত ভোটের ২ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েও হিলারিকে পরাজয়বরণ করতে হলো।

অনুরূপভাবে ২০০০ সালে জর্জ বুশ প্রতিদ্বন্দ্বী আল গোরকে নির্বাচনী কলেজ ভোটে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট হন। নির্বাচনে পরাজিত আল গোর জনসাধারণের ভোটে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৫২০টি ভোট বেশি পেয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এমন আরও তিনটি ঘটনা দেখা যায় : ১৮২৪ সালে জন কুইন্স এডামস জনগণের ভোটে অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের কাছে ৩৮ হাজারের বেশি ভোটে হেরে যান, অথচ নির্বাচনী কলেজের ভোটে তিনিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮৭৬ সালের নির্বাচনে স্যামুয়েল টিলড্রেন রাদারফোর্ড ২ লাখ ৫২ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু নির্বাচনী কলেজ পদ্ধতিতে তিনি হেরে যান। ১৮৮৮ সালে বেঞ্জামিন হ্যারিসন ৯৪ হাজার ৫৩০ ভোটে হেরে যান, অথচ নির্বাচনী

কলেজ ভোটে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রোবার ক্লিভল্যান্ডকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই নজিরগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা মোটেও অদ্ভুত নয়।

যেখানে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সংসদ আসনে নির্বাচন হয়, সেখানে সারা দেশের ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য না পেলেও ভোটে জেতা সম্ভব। ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল সারণি-১১.১-এ দেখা যাবে।

## সারণি-১১.১
## যুক্তরাজ্যে সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ, ২০১৫

| দলের নাম | প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার | মোট আসনে প্রাপ্ত আসনের হার |
|---|---|---|
| রক্ষণশীল | ৩৬.৯ | ৫০.৬১ |
| শ্রমিক দল | ৩০.৪ | ৩৫.৫৮ |
| এসএনপি | ৪.৭ | ৮.৫ |
| লিবারেল ডেমোক্র্যাট | ৭.৯ | ০.৯ |

উৎস : উইকিপিডিয়া

দেখা যাচ্ছে যে মাত্র ৩৬.৯ ভোট পেয়ে রক্ষণশীল দল ৫০ শতাংশের বেশি আসন পাওয়ার ফলে স্থিতিশীল সরকার পরিচালনা করতে তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তাদের চেয়ে মাত্র সাড়ে ৫ শতাংশ ভোট কম পেয়েছে শ্রমিক দল, অথচ তারা ৩৫.৫ শতাংশের মতো আসন পেয়েছে।

যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের মতো একই ধরনের পরিস্থিতি কানাডা ও ভারতে দেখা যায়। সারণি-১১.২-এ ২০১৫ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ দেখা যাবে।

## সারণি-১১.২
## কানাডায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ, ২০১৫

| দলের নাম | প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার | মোট আসনে প্রাপ্ত আসনের হার |
|---|---|---|
| লিবারেল দল | ৩৯.৪ | ৫৪.৪ |
| রক্ষণশীল দল | ৩১.০৯ | ২৯.২ |
| নিউ ডেমোক্রেটিক দল | ১৯.৭ | ১৩.০ |
| ব্লক কুবে কোয়া | ৪.৬৫ | ২.৯ |
| গ্রিন দল | ৩.৬৫ | .০২ |

উৎস : উইকিপিডিয়া

কানাডাতে মাত্র ৩৯.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে লিবারেল দল একটি স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার পরিচালনা করছে। এবার সারণি-১১.৩-এ ভারতের ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ দেখা যাবে।

**সারণি-১১.৩**

**ভারতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ, ২০১৪**

| দলের নাম | প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার | মোট আসনে প্রাপ্ত আসনের হার |
|---|---|---|
| বিজেপি | ৩১ | ৫১.৯ |
| ভারতীয় কংগ্রেস | ১৯.৩ | ৮.১ |
| বহুজন সমাজ পার্টি | ৪.১ | ০ |
| সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস | ৩.৮ | ৬.২ |
| সমাজবাদী পার্টি | ৩.? | ০.৯ |
| এআইডিএমকে | ৩.৩ | ৬.৮ |
| সিপিএম | ৩.৩ | ১.৭ |
| ভারতীয় জনতা পার্টি | ১.৭ | ৩.৬ |
| শিবসেনা | ১.৯ | ৩.৩ |
| তেলেগু দেশম পার্টি | ২.৫ | ২.৯ |
| অন্যান্য | ২৫.৬ | ১৪.৬ |

উৎস : উইকিপিডিয়া

মজার ব্যাপার হলো, বিজেপি সারা ভারতে মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েছে, অথচ সংসদে আসন পেয়েছে প্রায় ৫২ শতাংশ। এর ফলে স্থিতিশীল সরকার পরিচালনায় তাদের কোনো অসুবিধা নেই, যদিও ভারতের ৬৯ শতাংশ ভোটার বিজেপিকে ভোট দেয়নি। অন্যদিকে ছোট ছোট দলগুলো মোট ২৫.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে, অথচ আসন পেয়েছে মাত্র ১৪ শতাংশ। যখন দুটির বেশি দল নির্বাচনে অংশ নেয়, সেখানে ভোট ভাগাভাগি হয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষেও বর্তমান নির্বাচন-ব্যবস্থায় নিরঙ্কুশ জয়লাভ করা সম্ভব। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ২০১৫ সালে দিল্লি বিধানসভার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে নির্বাচনে আম আদমি পার্টি ৫৪.৩ শতাংশ ভোট পায়, অথচ ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৭টি অর্থাৎ ৯৫.৭ শতাংশ আসন লাভ করে। অন্যদিকে বিজেপি ৩২.৩ শতাংশ ভোট পায় আর আসন পায় মাত্র ৩টি বা মোট আসনের ৪.২ শতাংশ। কংগ্রেস ভোট পায় ৯.৭ শতাংশ, অথচ একটিও আসন পায়নি।

এবার বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

সারণি-১১.৪-এ বাংলাদেশের ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ দেখা যাবে।

| দল | নির্বাচন ১৯৯১ | | নির্বাচন ১৯৯৬ | | নির্বাচন ২০০১ | | নির্বাচন ২০০৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ভোটের হার (%) | আসনসংখ্যা (%) | ভোটের হার (%) | আসনসংখ্যা (%) | ভোটের হার (%) | আসনসংখ্যা (%) | ভোটের হার (%) | আসনসংখ্যা (%) |
| আওয়ামী লীগ | ৩০.০৮ | ২৯.৩ | ৩৭.৪৬ | ৪৮.৬ | ৪০.০৩ | ২০.৬ | ৪৯ | ৭৬.৬ |
| আটদলীয় জোট (আওয়ামী লীগসহ) | ৩৩.৬৭ | ৩৩.৩৩ | - | - | - | - | - | - |
| চারদলীয় জোট (বিএনপিসহ) | ৩০.৮১ | ৪৬.৬ | ৩৩.৮১ | ৩৮.৬ | ৪০.৯৭ | ৬৪.৩ | ৩৩.২ | ১০ |
| জাতীয় পার্টি (এরশাদ) | ১১.৯২ | ১১.৬ | ১৬.৪ | ১০.৬ | ৭.২৫ | ৪.২৬ | ৭ | ৯ |
| জামায়াতে ইসলামী | ১২.১৮ | ৬.০ | ৮.২৬ | ১.০ | ৪.২৮ | ৫.৬ | ৪.৬ | ০.৬৬ |
| অন্যান্য | ১১.৪৭ | ২.৪৭ | ৪.১৩ | ১.২ | ১.৩৬ | ৩.১৪ | ৬.২ | ৩.৭৪ |

এ ধরনের নির্বাচনে আসনসংখ্যায় জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটে না। এই ব্যবস্থাতে যারা ভোট-ব্যবস্থাপনা করতে পারে, তাদের পক্ষে সংখ্যালঘু ভোট নিয়েও স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার পরিচালনা করা সম্ভব। কাজেই শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ভোট-ব্যবস্থা কতটুকু সুষ্ঠু, তা নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ৩৭.৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ৪৮.৬ শতাংশ আসন পায়। অথচ ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের ভোটের হার ৩৭.৪৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪০.০৩ শতাংশে উন্নীত হলেও, অর্থাৎ শতকরা হারে বেশি ভোট পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আসনসংখ্যা ৪৮.৬ শতাংশ থেকে ২০.৬ শতাংশে নেমে আসে। তেমনি ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ৪০.৯৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬৪.৩ শতাংশ আসন লাভ করে, আবার ২০০৮ সালের নির্বাচনে তাদের ভোটের হার ৪০.৯৭ থেকে ৩৩.২ শতাংশে নেমে আসে, অথচ তাদের আসনসংখ্যা ৬৪.৩ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নেমে আসে। স্পষ্টতই শুধু ভোটের সমর্থনের ওপর এ ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে ওঠে না। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত যে সরকার সংসদে স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তারাও অনায়াসে পাঁচ বছর মেয়াদকাল পূর্ণ করে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা জনমতকে অগ্রাহ্য করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভোটাররা হন এক দিনের রাজা, শুধু ভোটের দিনই তাঁদের কথা শোনা হয়। যেনতেন প্রকারে একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে সেই সরকার ধরে নেয় যে ক্ষমতার ওপর তাদের মৌরসি পাট্টা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি দুঃখজনক অথচ পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই দুই নির্বাচনের মাঝামাঝি সময়ে জনমত যাচাইয়ের কোনো প্রক্রিয়া থাকে না। এই প্রক্রিয়া দুই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একটি হলো গণভোট বা Referendum অনুষ্ঠান আর দ্বিতীয়টি হলো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনা বা Recall পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

তবে সবচেয়ে বেশি ভোটে সংসদ নির্বাচন করার পদ্ধতি শুধু গণতান্ত্রিক রীতির পরিপন্থী সংখ্যালঘু সরকারই প্রতিষ্ঠা করে না, এই পদ্ধতির দুটি বিশেষ সুবিধাও রয়েছে। প্রথম বিশেষ সুবিধা হলো, এই পদ্ধতিতে ভোটাররা তাঁদের নির্বাচনী এলাকা হতে তাঁদের পছন্দমতো জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে তাই নির্বাচিত প্রার্থীদের তাঁদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হয়। অন্যদিকে নির্বাচকেরাও ভোট দেওয়ার আগে যে প্রার্থী তাঁদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন, তাঁকে পছন্দ করতে পারেন। কিন্তু আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে দলের প্রাপ্ত ভোটের ওপর প্রার্থী নির্বাচিত হন, ফলে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলি নির্বাচনকে প্রভাবিত করে না। এ ব্যবস্থা স্থানীয় ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বিশেষ সুবিধা হলো, সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া প্রার্থীকে নির্বাচন করা হলে একটি দলের পক্ষে ৫০ শতাংশের কম ভোট পেয়েও স্থিতিশীল সরকার গঠন করা সম্ভব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচনে কোনো দলই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পায় না। তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে আনুপাতিক হারে নির্বাচন করলে দেশে বেশির ভাগ সময়ই বহু দলের সমর্থনে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এ ধরনের কোয়ালিশন সরকার দেশে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে। ১৯৭১ সালে ১৯৬টি দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত সরকারসমূহের একটি সমীক্ষা করা হয়। এ সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে যেখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয়েছে, সেখানেই সরকার অস্থিতিশীল। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, যেখানে একদলীয় নির্বাচিত সরকার গড়ে ১১০৭.৯ দিন দেশ শাসন করে, সেখানে কোয়ালিশন সরকারের স্থায়িত্বকাল মাত্র ৬২৪.৫ দিন।[২]

## ১১.৩ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রধানত দুই ধরনের প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়। একধরনের প্রতিনিধিত্ব সবচেয়ে বেশি ভোটের প্রতিনিধিত্ব (Plurality Rule) নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থাকে অনেকে First- past- the- post (যে আগে গোল করতে পারবে, তারই জিত, অর্থাৎ এক ভোটে জিততে পারলেই কেল্লা ফতে) বলে থাকেন। এই ব্যবস্থাকে Winner take all (বা বিজয়ী দল সব পুরস্কার পাবে) ব্যবস্থাও বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব। আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব হলে জয় শুধু একজন প্রার্থীরই হয় না, জয়ের ফলাফল আনুপাতিক হারে বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। যদি জাতীয়ভাবে অনুপাত নির্ধারণ করা হয়, তাহলে যে দল নির্বাচনে যে পরিমাণ ভোট পাবে, সেই হারে সে দল সংসদে আসন পাবে। উদাহরণস্বরূপ ২০১৪ সালের ভারতের নির্বাচন স্মরণ করা যেতে পারে। ভারতের প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রে যে সর্বোচ্চ ভোট পায়, সে নির্বাচিত হয়। এর ফলে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপির পক্ষে ৫১.৯ শতাংশ আসন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। যদি আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হতো, তাহলে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি ৩১ শতাংশ আসন পেত। অন্যদিকে বিভিন্ন ছোট দল ২৫.৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৪.৬ শতাংশ আসন পেয়েছে। তারা প্রায় ২৫ শতাংশ আসন সংসদে পেত। কাজেই আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে তাতে ভোটারদের ইচ্ছা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

আনুপাতিক হারে নির্বাচনের বিভিন্ন ফর্মুলা রয়েছে। কোথাও কোথাও সারা দেশের ভোটের ওপরে আনুপাতিক হারে প্রার্থী নির্বাচিত হয়। আবার কোথাও কোথাও ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে প্রার্থী নির্বাচিত হয়। কোথাও কোথাও আবার আনুপাতিক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট-ব্যবস্থা পাশাপাশি রয়েছে। যেমন জার্মানিতে দুই ধরনের নির্বাচনী এলাকা রয়েছে। প্রথমত সারা দেশকে কতগুলো নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সাংসদ নির্বাচিত হন। আবার সারা দেশে কয়েকটি নির্বাচনী এলাকা নিয়ে একটি বড় নির্বাচনী এলাকা গঠন করা হয়। এ ধরনের নির্বাচনী এলাকাতে যেসব সাংসদ নির্বাচিত হন, তাঁরা আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হন। এই ব্যবস্থায় আনুপাতিক হারের সম্পূর্ণ সুফল না পাওয়া গেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থার কুফল অনেক কমে এসেছে। সারণি-১১.৫-এ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নির্বাচন-ব্যবস্থা দেখা যাবে।

**সারণি-১১.৫**

**পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নির্বাচন-ব্যবস্থা**

| ক্রমিক নং | দেশের নাম | নির্বাচন-ব্যবস্থা | দেশের আর্থিক অবস্থা |
|---|---|---|---|
| ১ | আলবেনিয়া | ৪ শতাংশ সর্বনিম্ন ভোট পেতে হয় জাতীয়ভাবে এবং স্থানীয়ভাবে কমপক্ষে ২ শতাংশ ভোট পেতে হয় পার্টিকে আনুপাতিক হারে নির্বাচনের সুযোগের জন্য | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ২ | আলজেরিয়া | আনুপাতিক হার দলীয় তালিকা ভিত্তিক | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৩ | এঙ্গোলা | আনুপাতিক হার দলীয় ভিত্তিক | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৪ | অস্ট্রেলিয়া | শুধু সিনেটে আনুপাতিক হারে নির্বাচন (সংসদে সবচেয়ে বেশি ভোটে নির্বাচন) | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৫ | অস্ট্রিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৬ | আর্জেন্টিনা | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৭ | বেলজিয়াম | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৮ | বেনিন | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ৯ | বলিভিয়া | মিশ্র আনুপাতিক হার | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | দলীয় ভিত্তিতে আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১১ | ব্রাজিল | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১২ | বুলগেরিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১৩ | বুরকিনাফাসু | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১৪ | বারমুডা | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ১৫ | কম্বোডিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১৬ | কেপভার্ড | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১৭ | চিলি | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১৮ | কলম্বিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১৯ | কোস্টারিকা | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ২০ | ক্রোয়েশিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার। সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ ভোটের প্রয়োজন | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ২১ | সাইপ্রাস | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ২২ | চেক প্রজাতন্ত্র | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ২৩ | ডেনমার্ক | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ২৪ | ডোমেনিকান রিপাবলিক | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ২৫ | ইকুইটোরিয়াল গিনি | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ২৬ | এস্টোনিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ২৭ | ফিনল্যান্ড | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ২৮ | জার্মানি | মিশ্র আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ২৯ | গ্রিস | আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৩০ | গুয়াতেমালা | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৩১ | গিনিবিসাও | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ৩২ | গায়ানা | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ৩৩ | হাঙ্গেরি | মিশ্র আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৩৪ | হন্ডুরাস | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৩৫ | আইসল্যান্ড | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৩৬ | ইন্দোনেশিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৩৭ | ইরাক | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ৩৮ | আয়ারল্যান্ড | শুধু সংসদের একটি কক্ষে আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৩৯ | ইসরায়েল | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার। (সর্বনিম্ন ৩.২ শতাংশ ভোট প্রয়োজন) | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৪০ | ইতালি | মিশ্র আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪১ | কাজাকিস্তান | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ৪২ | কসোভো | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ৪৩ | কিরগিজস্তান | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ৪৪ | লাটভিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৪৫ | লেসেথু | মিশ্র আনুপাতিক হার | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ৪৬ | লাইবেরিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ৪৭ | লিচেনস্টাইন | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৪৮ | লুক্সেমবার্গ | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৪৯ | মালটা | আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৫০ | মেক্সিকো | মিশ্র আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৫১ | মালদ্বীপ | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৫২ | মেসিডোনিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৫৩ | মলডোবা | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার (সর্বনিম্ন হার ৬ শতাংশ) | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৫৪ | মঙ্গোলিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ৫৫ | মন্টেনিগ্রো | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৫৬ | মরক্কো | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৫৭ | নামিবিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ৫৮ | নেপাল | আনুপাতিক হার-সমান্তরাল ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ৫৯ | নেদারল্যান্ড | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৬০ | নেদারল্যান্ডস এন্টিলগ | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ৬১ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৬২ | নিকারাগুয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৬৩ | নর্দান আয়ারল্যান্ড | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৬৪ | নরওয়ে | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৬৫ | প্যারাগুয়ে | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৬৬ | পেরু | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৬৭ | ফিলিপাইন | সমান্তরাল ভোটিং | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ৬৮ | পোল্যান্ড | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৬৯ | পর্তুগাল | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৭০ | রোমানিয়া | মিশ্র আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৭১ | রাশিয়া | মিশ্র আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | প্রিন্সিপে | | |
| ৭৫ | সার্বিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৭৬ | সেন্ট মার্টিন | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৭৭ | স্লোভাকিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার (সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ) | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৭৮ | স্লোভেনিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার (সর্বনিম্ন ৪ শতাংশ) | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৭৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৮০ | স্পেন | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার (সর্বনিম্ন ৩ শতাংশ) | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৮১ | শ্রীলঙ্কা | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ৮২ | সুরিনাম | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৮৩ | সুইডেন | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার (সর্বনিম্ন ৪ শতাংশ ভোট) | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৮৪ | সুইজারল্যান্ড | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৮৫ | তিউনিসিয়া | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৮৬ | তুরস্ক | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার (সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ) | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৮৭ | উরুগুয়ে | দলভিত্তিক আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৮৮ | ভেনেজুয়েলা | মিশ্র আনুপাতিক হার | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৮৯ | এন্টিগুয়া এবং বারবান | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৯০ | বাহামা | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৯১ | বাংলাদেশ | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ৯২ | বারবাডোজ | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ৯৩ | বেলিজ | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ৯৪ | ভুটান | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ৯৫ | বতসুয়ানা | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৯৬ | কানাডা | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ৯৭ | ডোমেনিকা | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ৯৮ | ইথিওপিয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ৯৯ | গাম্বিয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০০ | ঘানা | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১০১ | গ্রানাডা | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১০২ | ভারত | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ১০৩ | জ্যামাইকা | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১০৪ | কেনিয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১০৫ | মালাবি | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১০৬ | মালয়েশিয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১০৭ | মাইক্রোনেশিয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১০৮ | মরক্কো | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১০৯ | নাইজেরিয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১১০ | পাকিস্তান | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১১১ | পালাও | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১১২ | পাপুয়া নিউগিনি | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ১১৩ | সেন্টকিটস এবং নেভিস | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১১৪ | সেন্ট লুসিয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১১৫ | সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনেডা | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১১৬ | সামওয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্নমধ্য আয়ের দেশ |
| ১১৭ | সিঙ্গাপুর | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ১১৮ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চমধ্য আয়ের দেশ |
| ১১৯ | দক্ষিণ কোরিয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ১২০ | সোয়াজিল্যান্ড | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১২১ | তানজানিয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১২২ | টঙ্গা | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১২৩ | ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১২৪ | টোবাগো | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১২৫ | উগান্ডা | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১২৬ | যুক্তরাজ্য | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ১২৭ | যুক্তরাষ্ট্র | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | উচ্চ আয়ের দেশ |
| ১২৮ | ইয়েমেন | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১২৯ | জাম্বিয়া | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |
| ১৩০ | জিম্বাবুয়ে | সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট | নিম্ন আয়ের দেশ |

ৎস : ১. নির্বাচন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য দুটি সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে (১) উইকিপিডিয়া (২) স নজরুল ইসলাম, *পলিটিকস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইন বাংলাদেশ* (প্রকাশিতব্য) ২. আয়ের উৎস লো বিশ্বব্যাংক

সারণি-১১.৫-এ ১৩০টি দেশের নির্বাচন-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৩০টির মধ্যে ৮৮টি দেশেই বিভিন্ন ধরনের আনুপাতিক হারের নির্বাচন-পদ্ধতি চালু আছে। মাত্র ৪২টি দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সাংসদেরা নির্বাচিত হন। এই ৪২টি দেশের প্রায় ৯০ ভাগ দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে যে নির্বাচনী পদ্ধতি রয়েছে, সেটি ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কিন্তু পরবর্তীকালে কমনওয়েলথভুক্ত কোনো কোনো দেশ এই নির্বাচনী ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে যায়। শ্রীলঙ্কায় আনুপাতিক হারে নির্বাচন প্রবর্তন করা হয়। অস্ট্রেলিয়াতে উচ্চকক্ষে আনুপাতিক হারে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নেপালের সর্বশেষ সংবিধানে আনুপাতিক আসন বণ্টন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা একমাত্র ব্যবস্থা নয়, পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন কাজ করছে এবং সংখ্যাগুরু ফর্মুলা বাদ দিয়ে অনেক দেশই এখন আনুপাতিক হারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হন, তাঁরা কিন্তু দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সব সময় কায়েম করতে পারেন না। ২০১৬ সালে মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে ভারত শাসন করছে, অথচ বিজেপি ভোট পেয়েছে মাত্র ৩১ শতাংশ। ৬৯ শতাংশ ভোটার বিজেপিকে ভোট দেয়নি। যুক্তরাজ্যে রক্ষণশীল দল একটি স্থিতিশীল সরকার পরিচালনা করছে। এরা মাত্র ৩৬.৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। শতকরা ৬৩ ভাগ ভোটারের এ সরকারের প্রতি সমর্থন নেই। অতি সম্প্রতি কানাডাতে লিবারেল দল ৫৪.৪ শতাংশ আসন পেয়ে সরকার গঠন করেছে, অথচ তারা ভোট পেয়েছে মাত্র ৩৯.৪ শতাংশ। প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটার এ সরকারকে ভোট দেয়নি। এই ব্যবস্থাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংখ্যালঘু শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ জন্যই পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ আনুপাতিক হারের নির্বাচনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হলে দেশে সাধারণত দুটি দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী দুবার্গার এ বিষয়ে একটি সূত্র প্রণয়ন করেছেন।[৩] এটি দুবার্গারের সূত্র নামে পরিচিত। এই সূত্রের প্রতিপাদ্য হলো দুটি। প্রথমত, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রতিনিধিত্ব হলে সে দেশে দুটি দল প্রাধান্য লাভ করে, অন্যদিকে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে বহুদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। দুবার্গারের বক্তব্য হলো, যেখানে একটি ভোট বেশি পেলে আসন লাভ করা যায়, সেখানে প্রতিযোগিতা প্রধানত দুটি প্রধান দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দেশ পরিচালনায় ক্ষুদ্র দলগুলোর কোনো ভূমিকা থাকে না, তাই ক্ষুদ্র দলগুলো ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। অন্যদিকে যেখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয় সেখানে ক্ষুদ্র দলগুলোও তাদের ভোটের অনুপাতে আসন পায়। এর ফলে

সরকার পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ভূমিকা থাকে। তাই ক্ষুদ্র দলগুলোর জনসমর্থন অব্যাহত থাকে। দুবার্গারের বক্তব্যের পেছনে যুক্তি রয়েছে তা ঠিক, কিন্তু বাস্তবে যেসব দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচন হয়, সেসব দেশে সর্বত্র ক্ষুদ্র দলগুলো অস্তিত্ব হারাচ্ছে না। ভারতে এই নির্বাচন-ব্যবস্থা সত্ত্বেও অনেক ক্ষুদ্র দল কাজ করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দলগুলো বড় বড় প্রদেশ শাসন করছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত সরকারের যেসব দুর্বলতা, সেগুলো হচ্ছে আনুপাতিক হারের ব্যবস্থার পক্ষে প্রধান যুক্তি। এই যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যেখানে প্রার্থী নির্বাচিত হন, সেখানে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ভোটারদের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন হলে ফলাফলে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। সারণি-১১.৪-এ বাংলাদেশের নির্বাচনী বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে এটি দেখা যাবে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ৩৭.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে ৪৮.৬ শতাংশ আসন লাভ করেছিল, অথচ ২০০১ সালের নির্বাচনে তারা ৪০.৩ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ২০.৬ শতাংশ আসন লাভ করেছিল। পক্ষান্তরে বিএনপি ১৯৯৬ সালে ৩৩.৮১ শতাংশ ভোট পেয়ে ৩৮.৬ শতাংশ আসন লাভ করে। ২০০১ সালে তাদের ভোটের হার ৪০.৯৭ শতাংশে উন্নীত হয়, অথচ তাদের আসনসংখ্যা ৬৪.৩৩ শতাংশে উঠে যায়। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির ভোট বাড়ে ৭.১৬ শতাংশ আর আসনসংখ্যা বাড়ে ২৫.৭ শতাংশ। একই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট বাড়ে ২.৫৭ শতাংশ অথচ আসনসংখ্যা কমে প্রায় ২০ শতাংশ। আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে সামান্য ভোটের ব্যবধানে এত বড় পরিবর্তন হতো না। পক্ষান্তরে এই দুর্বলতাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থার দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশে নয় কোটির বেশি ভোটার রয়েছে। ৩০০ আসনবিশিষ্ট জাতীয় সংসদে আনুপাতিক হারে একটি আসন লাভ করার জন্য মোট ভোটের প্রায় ০.৩৩ শতাংশ পাওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ জাল ভোটের মাধ্যমে একটি আসন লাভ করতে হলে কমপক্ষে ৩ লাখ ভোটের প্রয়োজন। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একটি আসনে সামান্য ভোটের ব্যবধানে জয় সম্ভব; সে ক্ষেত্রে জয়ের জন্য হয়তো ৫ থেকে ১০ হাজার ভোট জাল করাই যথেষ্ট হতে পারে। যদি ধরে নিই যে ১০ হাজার ভোট জাল করে একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থায় জয়লাভ করে, তাহলে ৩ লাখ ভোট জাল করলে সেই দলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে ৩০টি আসনে জয়লাভ করা সম্ভব। কিন্তু আনুপাতিক হারে প্রার্থী নির্বাচিত হলে দলটির পক্ষে মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করা সম্ভব। কাজেই আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে ভোটে জাল-জালিয়াতির আশঙ্কা অনেক কমে যাবে। পক্ষান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থায় ভোট চুরির প্রবণতা বাড়তে থাকবেই। এটা

শুধু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও সত্য। ২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অল্প ভোটের জালিয়াতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

২. সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচন-পদ্ধতির ফলে মনোনীত প্রার্থীদের রাজনৈতিক মান নেমে যায়। একজন জাতীয় নেতা সারা জীবন জাতীয় সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করতে পারেন কিন্তু তিনি যদি তাঁর স্থানীয় সমর্থন বাড়ানোর জন্য কাজ না করেন, তাহলে তাঁর স্থানীয় সমর্থন কমে যাবে এবং ভোটে তিনি হেরে যাবেন। কাজেই যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, সেখানে প্রার্থীর মনোনয়নের সময় প্রার্থীর যোগ্যতা নয়; তাঁর স্থানীয় জনপ্রিয়তার ওপর জোর দিতে হয়। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে প্রার্থীদের মান নেমে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক জোট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। জোটে এলাকায় আসনসংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাই নির্বাচনের আগে দলগুলো জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব জোট সুবিধাবাদের ওপর গড়ে ওঠে এবং এর ফলে রাজনীতির মান নেমে যায়।

৩. সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র দলগুলোর ভূমিকা সংকুচিত হয়ে যায়। ধরা যাক, একটি দেশে ৫ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে, যদি তারা সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, তাহলে তাদের ভোট নির্বাচনের ওপর আদৌ কোনো প্রভাব ফেলবে না; কিন্তু আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে তারা ৫ শতাংশ প্রতিনিধি পাবে। এর ফলে তাদের বক্তব্য বিবেচনায় নিতে হবে। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে যা সত্য, তা ক্ষুদ্র দলগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। সুতরাং আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে তা বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য সুখবর।

৪. যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, সেখানে স্থানীয় সরকার দুর্বল হয়ে যায়। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সাংসদ একটি বিশেষ ভৌগোলিক এলাকা থেকে নির্বাচিত হন, সেহেতু তাঁকে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এর ফলে স্থানীয় সরকারের কাজকর্মে তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। কাজেই অনেক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচন-ব্যবস্থা স্থানীয় সরকারকে দুর্বল করে দেয়।

গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়। এ কথা ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং বাংলাদেশ সম্বন্ধে সত্য। এর ফলে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই আনুপাতিক হারে নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতি চালু রয়েছে, সেখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা চালু করার দাবি উঠছে। ইতিমধ্যে

অনেক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচনী পদ্ধতির পরিবর্তে আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও নেপালে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতির স্থানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন প্রবর্তিত হয়েছে। ব্রিটেনে আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে, যদিও ব্রিটেনে তা সফল হয়নি। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচনের পদ্ধতি দুটি কারণে পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক. **ব্যাপক জালিয়াতি :** বাংলাদেশে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতি করে, এ ধরনের অভিযোগ রয়েছে। এ জালিয়াতির একটি বড় কারণ হলো, যেনতেন প্রকারে যদি এক ভোটেও তাদের মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করা সম্ভব হয়, তাহলে তাদের পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়। একবার সরকার গঠিত হলে জাল-জালিয়াতির অভিযোগ চাপা পড়ে যায়। নির্বাচনী মামলার পদ্ধতি জটিল এবং এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক সময় ৫ বছরের মধ্যে সম্ভব হয় না, সুতরাং জালিয়াতি করে মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করা গেলে সহজেই ৫ বছর সরকার পরিচালনা সম্ভব হয়। সরকার পরিচালনায় এত লাভ হয় যে সব দলই জালিয়াতির মাধ্যমে মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে উৎসাহিত হয়। এর ফলে এরা গণপ্রশাসনকে কুক্ষিগত করে নির্বাচন অনুষ্ঠানে উদ্যোগ নেয়। যত দিন পর্যন্ত বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচন-পদ্ধতি চালু থাকবে, তত দিন পর্যন্ত এই প্রবণতা কমার সম্ভাবনা কম।

খ. **রাজনৈতিক সংঘাতের স্থলে রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি :** মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ফল এবং বংশগত রাজনীতির দ্বন্দ্বের জন্য বাংলাদেশে সংঘাতের রাজনীতি বিরাজ করছে। এই সংঘাত এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে বিবদমান দলগুলোর নেতাদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি হিংসাত্মক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করছে। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে লেনদেনের প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের লেনদেন দেশে যদি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক হয়, তাহলেই সম্ভব হতে পারে। অন্যথায় তারা পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। এই অবস্থায় আনুপাতিক হারে নির্বাচন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে ও সংঘাতের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে সহায়ক হতে পারে। বেশির ভাগ দেশেই যেখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয়, সেখানে কোনো দলের পক্ষেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয় না। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেখানে কোয়ালিশন সরকার গঠন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও লেনদেন ঘটে। অবশ্য এমন দাবিও করা হয় যে আনুপাতিক হারে নির্বাচন বেশির ভাগ

ক্ষেত্রেই কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। আর কোয়ালিশন সরকারের পক্ষে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সুশাসন ব্যাহত হয়। তবে এ আপত্তি যে পুরোপুরি ঠিক, তার পক্ষে কোনো সুদৃঢ় প্রমাণ নেই। ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচন-পদ্ধতিতেও কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে, কিন্তু কোয়ালিশন সরকার দেশ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়নি। কাজেই কোয়ালিশন সরকার হওয়াটাই খারাপ, এ ধরনের বক্তব্যের পক্ষে কোনো শক্ত যুক্তি নেই। বরং কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে সাংঘর্ষিক প্রবণতা, সেটা হ্রাস পায়। তারা একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়। এ সহযোগিতার মাধ্যমে রাজনীতি আরও এগিয়ে চলে।

বাংলাদেশের সামনে এখন তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে—

১. **বর্তমান পদ্ধতি চালু রাখা এবং কোনো পরিবর্তন না করা :** গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই সম্ভাবনা বাংলাদেশের জন্য সঠিক নয়। এর ফলে বাংলাদেশে সংঘর্ষের রাজনীতি ক্রমশ তীব্র হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ বিপন্ন হচ্ছে।

২. **আনুপাতিক হারে নির্বাচন :** এটি প্রবর্তন করা হলে অনেকগুলো সুফল পাওয়া যাবে। প্রথমত, জাল-জালিয়াতির প্রবণতা দূর না হলেও অনেকাংশে হ্রাস পাবে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংঘর্ষের তীব্রতা কমে আসবে। তবে এর একটি বড় অসুবিধা হলো, ভোটাররা আনুপাতিক হারে নির্বাচনকে গ্রহণ করতে রাজি না-ও হতে পারেন। বর্তমান ব্যবস্থায় সব প্রার্থীকেই তাঁর নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের সন্তুষ্ট করতে হয়। এর ফলে ভোটার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভোটারদের সমস্যা সমাধানে এ সম্পর্ক অনেকটা কাজে লাগে। কাজেই নির্বাচনী এলাকা তুলে দেওয়ার পক্ষে অধিকাংশ ভোটারই হয়তো মত দেবেন না।

৩. **মিশ্র ব্যবস্থা :** মিশ্র ব্যবস্থাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থা একেবারেই তুলে দেওয়া হয় না। এখানে একই সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা চালু করা হয়। বাংলাদেশে দুভাবে মিশ্র ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। একটি হলো বর্তমানে সংসদে যে ৩০০টি আসন রয়েছে, তার মধ্যে ১৫০টি আসনে বর্তমান পদ্ধতিতে ও বাকি ১৫০টি আসনে আনুপাতিক হারে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হতে পারে, এখানে একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা করা। নিম্নকক্ষে নির্বাচন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এবং উচ্চকক্ষের নির্বাচন একই নির্বাচনের আনুপাতিক ফলাফলের ভিত্তিতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সব আইনই সংসদের উভয় কক্ষে পাস করতে হবে। এই দুই ধরনের ব্যবস্থা ফলাফল কী হতে পারত, সে সম্বন্ধে একটি প্রক্ষেপণ সারণি-১১.৬-এ দেখা যাবে।

| | ২০০১ সালের নির্বাচন | | | | | ২০০৮ সালের নির্বাচন | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে আসনের হার | ৫০ শতাংশ আসনে আনুপাতিক হারে ৫০ শতাংশ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠ হারে ফলাফল | সংখ্যাগরিষ্ঠ হারে নিম্নকক্ষের ফলাফল | আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষের ফলাফল | উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের মোট আসন | প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে আসনের হার | ৫০ শতাংশ আসনে আনুপাতিক হারে ৫০ শতাংশ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠ হারে ফলাফল | সংখ্যাগরিষ্ঠ হারে নিম্নকক্ষের ফলাফল | আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষের ফলাফল | উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের মোট আসন |
| আওয়ামী লীগ | ২০.৬৭ | ৩০.৩৪৫ | ২০.৬৭ | ৪০.০২ | ৩০.৩৪৫ | ৭৬.৬৭ | ৬২.৮৪৫ | ৭৬.৬৭ | ৪৯.০০ | |
| বিএনপি | ৬৪.৩৩ | ৪২.৬৫ | ৬৪.৩৩ | ৪১.০০ | | ১০.০০ | ২১.৬ | ১০.০০ | ৩৩.২ | |
| জাতীয় পার্টি | - | - | - | - | - | ৯.০০ | ৮.০০ | ৯.০০ | ৭.০০ | |
| অন্যান্য | ১৫.০৫ | ১৬.৯৯ | ১৫.০০ | ১৮.৯৮ | | ৪.৩ | ৭.৩৬৫ | ৪.৩ | ১০.৮ | |

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে যদি ৫০% আসনেও আনুপাতিক হারে নির্বাচন হতো, তবে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হতো। যদিও ২০০৮ সালে নিম্নকক্ষে কোয়ালিশনের প্রয়োজন হতো না। তবে উচ্চকক্ষে কোনো দলের পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হতো না। বাংলাদেশের জন্য দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি সংসদ প্রতিষ্ঠা করে নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা হলে এবং একই নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে উচ্চতর কক্ষের সদস্যদের নির্বাচন হলে আনুপাতিক হারের সুফল পাওয়া যাবে।

## ১১.৪ গণভোট (Referundum), নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার (Recall) ও সরকারের মেয়াদ

প্রাচীন এথেন্সে গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ; সব ভোটারের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার ছিল। আজকের পৃথিবীতে গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক (Representative), এখানে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব সব ভোটারের হাতে নেই; জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সব ক্ষমতা অর্পণ করে। জনগণের পক্ষে দেশ শাসন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভোটে নির্বাচিত। একবার চার বা পাঁচ বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হলে তারা পুরো মেয়াদ ধরে দেশ শাসন করে। নতুন সমস্যা বা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও তারা জনগণের কাছ থেকে নতুন ম্যান্ডেট গ্রহণ করে না। এই ধরনের ব্যবস্থায় জনগণ শুধু এক দিনের বাদশা। ভোটের দিন জনগণ রাজা আর বাকি সব দিন তাঁদের নামে (অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত) জনপ্রতিনিধিরা দেশ চালায়। প্রাচীন এথেন্সে একটি সুবিধা ছিল; মুষ্টিমেয় লোকের ভোটাধিকার ছিল; অধিকাংশ লোকের ভোটাধিকার ছিল না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর ফলে সব প্রশ্নে সবার মত নেওয়া সম্ভব নয়। তাই জনগণের সব ক্ষমতা প্রতিনিধিরা কুক্ষিগত করেছেন। তবে কোনো কোনো দেশে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নিম্নলিখিত তিন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে :

গণভোট (Referendum)
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার (Recall)
প্রতিনিধিদের মেয়াদ হ্রাস

## গণভোট

ইংরেজি Referendum শব্দের উৎপত্তি লাতিন শব্দ 'রেফেরো' থেকে। রেফেরো শব্দের অর্থ হলো ফিরিয়ে আনা, অর্থাৎ জনগণের কাছে ফিরিয়ে আনা। Referendum-এর সংজ্ঞা হলো : 'direct vote in which an entire electorate is asked to vote on a particular proposal'। এর মাধ্যমে যেসব প্রশ্নের সমাধান জনপ্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ভোটারদের কাছে ফিরিয়ে আনা হয় এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে জনগণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গণভোট অনেক ধরনের হয়ে থাকে। কোনো কোনো দেশের সংবিধানেই গণভোটের বিধান রয়েছে। এ ধরনের বিধান সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি, গ্রিস, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সংবিধানে গণভোটের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু অনেক অঙ্গরাজ্যের সংবিধানে রয়েছে। তবে যেসব দেশের সংবিধানে গণভোটের ব্যবস্থা নেই, সেসব দেশেও আইন পরিষদ গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য আইন পাস করতে পারে। এমনকি সরকারের নির্বাহী আদেশেও গণভোট হতে পারে। তবে সব গণভোটের ফলাফল সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। ফলাফল বাধ্যতামূলক করতে হলে গণভোটের বিধান সংবিধানে থাকতে হবে। গণভোট সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে পারে। আবার গণভোট ভোটারদের উদ্যোগেও অনুষ্ঠিত হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে গণভোটকে People's Initiatave বা গণ উদ্যোগ বলা হয়ে থাকে। যেখানে গণ উদ্যোগের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে যাতে গণভোটের সংখ্যা অহেতুকভাবে না বাড়তে পারে, সে জন্য আইনি বিধিনিষেধ সৃষ্টি করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মোট ভোটারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (যথা ২৫% অথবা ৩৩% বা ৪০%) দরখাস্ত না করলে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় না। উপরন্তু গণভোটের আগে নির্বাচন কমিশনকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে জাল দস্তখত ছাড়া উদ্যোক্তারা এই শর্ত পূরণ করেছেন।

গণভোটের পক্ষে প্রধান যুক্তি হলো, গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত শুধু স্বল্পসংখ্যক গণপ্রতিনিধি নেবেন না, এ সিদ্ধান্তে সব নাগরিকের ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। তবে এর ফলে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের যুক্তি হলো, আজকের জনবহুল রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অচল। উপরন্তু অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান সাধারণ ভোটারদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ গণপ্রতিনিধিরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ। তাঁদের সিদ্ধান্তই এসব ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া উচিত। উপরন্তু গণভোট ব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাকে অনেক ক্ষেত্রে অচল করে দেয়। সরকারকে দেশ পরিচালনায় মনোনিবেশ না করে গণভোট নিয়ে ব্যস্ত

থাকতে হয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ও গণভোটের শান্তিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ সহাবস্থান সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরকার যেকোনো বিষয়ের ওপর গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে জনসাধারণের উদ্যোগে গণ ভোটের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। উপরন্তু যখন খুশি গণউদ্যোগে গণভোট করতে দেওয়া যাবে না। প্রতি দুই বছর পর গণভোট অনুষ্ঠানের সুযোগ থাকবে। গণভোটের কমপক্ষে এক বছর আগে গণ উদ্যোগে গণভোটের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দরখাস্ত করতে হবে, যাতে নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত গণভোটের আইনগত বৈধতা বিচার করে দেখতে পারে।

অবশ্যই গণভোট নির্বাচনের ব্যয় অনেক বাড়িয়ে দেয়। তাই গণভোটের ব্যাপারে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু গণভোটের কোনো ব্যবস্থা একেবারেই না থাকলে সে ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের স্বেচ্ছাচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে রাজনীতি নিয়মতন্ত্রের পথ ছেড়ে অনিয়মতান্ত্রিকতার দিকে পা বাড়ায়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে হরতালের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। দেশে গণভোটের ব্যবস্থা থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই হরতাল না করে পরিবর্তে গণভোটের উদ্যোগ নেওয়া যেত।

বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে গণভোট সম্পর্কে নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে :

ক. সংবিধান সংশোধন করে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

খ. সরকার যেকোনো সময় গণভোটের ব্যবস্থা করতে পারে। তবে জনগণের উদ্যোগে গণভোট দুই বছরে একবার অনুষ্ঠিত হবে। কোনো প্রস্তাব গণভোটে দিতে হলে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব নির্বাচনের কমপক্ষে এক বছর আগে নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করতে হবে।

গ. গণভোটের ফলাফল সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

ঘ. গণভোট সম্পর্কে বিস্তারিত আইন সংসদ পাস করবে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আরেকটি উপাদান হচ্ছে রিকল বা নির্বাচক কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে এ ধরনের প্রথা চালু রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে ২০০৩ সালে গভর্নর গ্রে ডেভিসকে প্রত্যাহারের ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। ডেভিস ১৯৯৮ সালে প্রথমবার ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর নির্বাচিত হন এবং ২০০২ সালে চার বছরের জন্য একই পদে পুনর্নির্বাচিত হন। বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও অপ্রিয় কর আরোপের জন্য পুনর্নির্বাচনের কিছুদিনের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তা হারান। এ অবস্থায় জনগণ তাঁকে প্রত্যাহার বা রিকল করার উদ্যোগ নেয়। এর ফলে পুনর্নির্বাচনের এক বছর পূর্ণ

হওয়ার আগেই জনগণের ভোটে তিনি অপসারিত হন। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে অত্যন্ত দুর্বল করে। তাই প্রাদেশিক সরকারে অপসারণের ব্যবস্থা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, যেখানে সরকারপ্রধানকে অপসারণ সম্ভব, সেখানে এই ব্যবস্থা কাজ করে। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে একজন বিশেষ সদস্য দেশ পরিচালনা করেন না। বিশেষ একজন সদস্যকে অপসারণ করলে সরকার পরিবর্তিত হবে না। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে রিকল ব্যবস্থা কাজ করে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাই রিকল ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে না।

যে দেশে যত ঘন ঘন নির্বাচন হয়, সে দেশে গণতন্ত্রের তত নিবিড় চর্চা হয়। যে দেশে সরকারের মেয়াদ যত দীর্ঘ, সে দেশে নির্বাচনের পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তত ভাটা পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সদস্যরা দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রতি চার বছরে একবার হলেও কংগ্রেসের নির্বাচন প্রতি দুই বছরে একবার হওয়াতে প্রায় সব সময়ই রাজনীতি সক্রিয় ও সজীব থাকে। বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর। এ সরকারকে সহজে অপসারণের কোনো পথ নেই। এর ফলে রাজনৈতিক অসন্তোষের নিয়মতান্ত্রিক সমাধান নেই। তাই হরতালের মতো অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বাঁধে। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশে সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছরের স্থলে তিন বছর বা চার বছর করলে হরতাল কমে যাবে ও নির্বাচিত সরকার তাদের দায়িত্ব পালনে আরও যত্নবান হবে। তবে এ ধরনের পরিবর্তনে দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়বে। এর ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা থাকবে না; অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হবে। তাই হরতালের তীব্রতা কমানোর জন্য সরকারের মেয়াদ কমানোর চেয়ে গণভোট অনুষ্ঠান শ্রেয়।

## ১১.৫ উপসংহার

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংসদীয় সরকার-ব্যবস্থায় মূলত দুই ধরনের নির্বাচন সম্ভব : (১) সবচেয়ে বেশি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন (Plurality Rule) এবং (২) দলের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে নির্বাচন। বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ভোট যে প্রার্থী পান, তিনিই নির্বাচিত হন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী ৫০ শতাংশের অনেক কম ভোট পান। কাজেই বেশির ভাগ সময়ই বাংলাদেশে যে সরকার গঠিত হয়, সে সরকার প্রকৃত অর্থে সংখ্যালঘুদের সরকার; যদিও আইন অনুসারে সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকার হিসেবে কাজ করে। এই ব্যবস্থা কমনওয়েলথের

সব দেশেই রয়েছে। কোনো কোনো কমনওয়েলথ দেশ সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য (অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কা) আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। বিলাতে আনুপাতিক হারে নির্বাচনের দাবি নিয়ে একটি গণভোট হয়েছিল কিন্তু গণভোটে আনুপাতিক হারে নির্বাচন পাস হয়নি। সবচেয়ে বেশি লোকের ভোটে নির্বাচিত সরকারের কিছু অসুবিধা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থার পক্ষে দুটি যুক্তি দেখানো হয়।

প্রথম যুক্তি হলো, আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে ভোটাররা দলকে ভোট দেন এবং দল তাঁদের ভোটের ভিত্তিতে সংসদে তাদের প্রার্থী পাঠায়। এর ফলে নির্বাচিত প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচনী এলাকার জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে না। বেশির ভাগ অঞ্চলের জনগণই এমন প্রতিনিধি চান, যিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার সমস্যা সম্পর্কে জানেন এবং এলাকার জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এতে স্থানীয় সমস্যার সমাধান সহজ হয়। উপরন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধি জনগণের সঙ্গে সরকারের যোগসূত্র রচনা করেন। জনগণের দাবিদাওয়া ও তদবির নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীদের কাছে পেশ করা সহজ। যদি আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয়, তখন জনগণ তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে লাগাতে পারেন না। তবে বেশি লোকের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির বেলায়ও সব ক্ষেত্রে যে এ সুবিধা পাওয়া যায়, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক দল বাইরে থেকে বিখ্যাত অভিনেতা বা বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ন দেয় এবং দলের সমর্থনে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। এ ধরনের প্রতিনিধিরা স্থানীয় জনগণের কাজে লাগে না। উপরন্তু নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রার্থী নির্বাচিত হলেও সেই প্রার্থী সব সময় জনগণের সঙ্গে কাজ করেন না। তাঁদের অনেকে নির্বাচনী এলাকায় তাঁদের শোষণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন ও ত্রাসের রাজত্ব স্থাপন করেন। যদি এ ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাতে জনগণের বিশেষ কোনো উপকার হয় না।

দ্বিতীয়ত, যেখানে সবচেয়ে বেশি ভোটে প্রার্থী নির্বাচিত হন, সেখানে বেশির ভাগ সময়ই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল (সংখ্যালঘিষ্ঠ, অর্থাৎ ৫০ শতাংশ ভোটের কম পেয়ে) স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু যেসব দেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয়, সেসব দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জার্মানিতে দীর্ঘদিন ধরে কোয়ালিশন সরকারই দেশ শাসন করছে। ডেনমার্কে ১৯৮২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কোয়ালিশন সরকার ছিল। তবে কোয়ালিশন সরকার শুধু যেখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হয়, সেখানেই গঠিত হয় না, অনেক ক্ষেত্রে যেখানে সবচেয়ে বেশি ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়, সেখানেও কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। সম্প্রতি নিম্নোক্ত

দেশসমূহে বিভিন্ন সময়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল: অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, সাইপ্রাস, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, ইসরায়েল, ইতালি, জাপান, কেনিয়া, কসভো, লাটভিয়া, লেবানন, নেপাল, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ত্রিনিদাদ ও টোবাকো, তুরস্ক, ইউক্রেন, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস এবং লুক্সেমবার্গ। এমনকি ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বিলাতেও রক্ষণশীল দল ও লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল।[৪]

ভারতে ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে প্রথম কোয়ালিশন সরকার দায়িত্ব পালন করে। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত অটলবিহারী বাজপেয়ী কোয়ালিশন সরকারের প্রধান হিসেবে দেশ শাসন করেন। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সময়কালে ১৩টি স্বতন্ত্র দল নিয়ে গঠিত ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালাইন্স দেশ শাসন করে। কিন্তু কোয়ালিশন সরকারের ফলে ভারতের কোনো উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়নি। কাজেই কোয়ালিশন সরকার হলেই শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, এ ধারণা ঠিক নয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে নির্বাচন প্রয়োজন শুধু এই জন্য নয় যে বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচিত বেশির ভাগ সরকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। এটি অবশ্যই বড় সমস্যা। কিন্তু এর চেয়েও বড় দুটি সমস্যা বাংলাদেশে রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশে নির্বাচন-ব্যবস্থা অত্যন্ত বিতর্কিত। এখানে নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের জাল-জালিয়াতি ও কারচুপি হয়। জাল-জালিয়াতি রোধ করার জন্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এসব নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচন-ব্যবস্থা জাল-জালিয়াতিকে উৎসাহিত করে। এখানে একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে একটি ভোট বেশি পেলেই নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। এর ফলে প্রত্যেক প্রার্থীই যত বেশি জাল ভোট দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করেন। আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে ফলাফল এক ভোট বা স্বল্পসংখ্যক সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। সব দল যদি সমহারে জালিয়াতি করে, তাহলে ফলাফলের ওপরে জালিয়াতির কোনো প্রভাব পড়বে না। আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে একটি আসন লাভ করার জন্য প্রায় ৩ লাখ ভোট জাল করতে হবে। যদি নির্বাচনে সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকে, তাহলে বড় ধরনের জালিয়াতি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব। তাই আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে এখানে জালিয়াতির আশঙ্কা অনেক কমে যেতে পারে।

বাংলাদেশে রাজনীতির দ্বিতীয় সমস্যা হলো, তিন দশক ধরে এখানে সংঘর্ষের রাজনীতি চলছে। এক রাজনৈতিক দল যা করে, অপর রাজনৈতিক দল

তার বিরোধিতা করে। এই দ্বন্দ্ব এমন তিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। এই ধরনের সংঘাত চলতে থাকলে দেশে কখনো গ্রহণযোগ্য প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। যেহেতু বর্তমান নির্বাচন-ব্যবস্থায় একটি দলের পক্ষে ৩০-৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব, সেহেতু দলগুলোর মধ্যে কোনো আদান-প্রদান নেই। এক দলের পক্ষেই নির্বাচনে জিতে সরকারের সব সুবিধা কুক্ষিগত করা সম্ভব। বর্তমান নির্বাচন-পদ্ধতি চালু থাকলে এই সংঘাত হ্রাস করা যাবে না। যদি আনুপাতিক হারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন পড়বে। কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে হবে এবং সংঘাতের বদলে সমঝোতার পথ খুঁজতে হবে। তাই বাংলাদেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে রাজনৈতিক সংঘাত হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে।

ওপরের দুটি যুক্তি বিবেচনা করে বাংলাদেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে যদি ব্যক্তির বদলে দলকে ভোট দিতে হয়, তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ সেটা পছন্দ না-ও করতে পারেন। তাই বাংলাদেশে সরাসরি আনুপাতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন না করে মিশ্র আনুপাতিক ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। মিশ্র আনুপাতিক নির্বাচন নিম্নরূপে অনুষ্ঠিত হবে :

(ক) জাতীয় সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হবে। (খ) নিম্নকক্ষে বর্তমান পদ্ধতিতে ৩০০ আসনের জন্য নির্বাচন হবে। (গ) একই নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষের ৩০০ সদস্য নির্বাচিত হবেন। (ঘ) দেশের সব আইন সংসদের দুটি কক্ষেই অনুমোদিত হতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে জালিয়াতি পুরোপুরি দূর হবে না, তবে নিম্নকক্ষে জালিয়াতি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া গেলেও উচ্চকক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। এর ফলে প্রধান দলগুলোকে আলাপ-আলোচনার এবং অনেক ক্ষেত্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করতে হবে।

গণতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে দেশের শাসনব্যবস্থার মালিক জনগণ। যদি কোনো সরকার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায়, তাহলে তার ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে একটি সরকার পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। যে সরকারই একবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে সরকার পাঁচ বছরের আগে নির্বাচন করতে রাজি হয় না। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রত্যাহার করার বা Recall-এর বিধান রয়েছে। পৃথিবীর কোনো দেশেই জাতীয়

সরকারকে প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা নেই। এর ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশে তাই Recall পদ্ধতি প্রবর্তন করা যুক্তিযুক্ত হবে না। যদিও সরকারকে প্রত্যাহার করার বিধান করা সম্ভব নয়, কিন্তু সরকারের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জনগণের থাকা বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই রেফারেন্ডাম বা গণভোট ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনগণকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলই জনগণকে এই ক্ষমতা দিতে রাজি নয়। তারা মনে করে, যেহেতু জনগণের ভোটে তারা নির্বাচিত হয়েছে, সুতরাং জনগণের পক্ষ থেকে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কিত হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে দেশে হরতালের রাজনীতি সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে তিন দশক ধরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে বছরের পর বছর হরতাল করা হয়েছে। কিন্তু তাতে সমস্যার কোনো সমাধান করা যায়নি। এ ধরনের সমস্যার সমাধান হলো গণভোট অনুষ্ঠান। বাংলাদেশে হরতালের রাজনীতি ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে।[৫] হরতালের একমাত্র বিকল্প হলো গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। তবে এই সুযোগ ঢালাওভাবে দেওয়া যাবে না। গণভোট অনুষ্ঠান সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে বিধান করা উচিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গণভোট হবে ও কীভাবে গণভোট হবে, সে সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা দরকার। ওপরের বিশ্লেষণ থেকে তাই এ কথা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে বাংলাদেশে আনুপাতিক হারে নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠান প্রবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

## পাদটীকা

১. Dennis C. Mueller, 1989, *Public Choice II*, Cambridge University Press
২. M. J. Taylor and V. M. Herman 1971 'Party systems and government stability.' *American Political Science Review* 65, 28 to 37
৩. William H. Riker. 1982 'The Two party system and Duverger's Law: and Essay on the History of Political *Science.' American Political Science Review,* 76, 756 to 765
৪. Wikipedia 2016, Coalition Government, https://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_government'
৫. আকবর আলি খান। ২০১১। *অন্ধকারের উৎস হতে*। ঢাকা পাঠক সমাবেশ, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৮

## ১২

# নির্বাচন পরিচালনা : আমার ভোট আমি দেব

### ১২.১ প্রস্তাবনা

উনিশ শ ষাটের দশকে তদানীন্তন মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত ছিল। তাঁর নির্বাচনী এলাকাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁদের কাছে ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাম্প্রদায়িক রাজনীতি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই তাঁরা কোনোমতেই ফজলুল কাদের চৌধুরীকে ভোট দেবেন না। অন্যদিকে সব সংখ্যালঘু ভোট তাঁর বিপক্ষে চলে গেলে তাঁর নির্বাচনে পাস করার সম্ভাবনা খুবই সীমিত হয়ে যায়। চৌধুরীর চেলারা তাঁকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে ভোটারদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। চৌধুরী এ পরামর্শ গ্রহণ করেননি। তিনি সরাসরি সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে যান এবং সেখানে তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা নেন। গ্রামের বৈঠকে তিনি প্রথমেই তাঁর নিজের এলাকায় রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ ও স্বাস্থ্য খাতে তিনি যেসব কাজ করেছেন, সেগুলো তুলে ধরেন এবং প্রশ্ন করেন যে তিনি কি সত্যি কথা বলছেন? সবাই একই সুরে বলে উঠলেন, চৌধুরী সাহেব যা বলেছেন, তা ঠিক। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, এত কাজ করার পর জনসাধারণের পক্ষে তাঁকে ভোট দেওয়া ঠিক হবে, কি হবে না। সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন যে তাঁকেই নির্বাচনে ভোট দেওয়া উচিত। এরপর চৌধুরী সাহেব বললেন যে জনগণের এ স্বীকৃতিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং তিনি মনে করেন যে তিনি তাঁদের ভোট পেয়ে গেছেন। তিনি তখন তাঁদের পরামর্শ দেন যে আপনাদের কষ্ট করে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই। আমি আপনাদের ভোট পেয়ে গেছি। আর সঙ্গের চেলা-চামুণ্ডাদের বলে দিলেন এ অঞ্চলের কোনো ভোটার যেন কষ্ট করে ভোটকেন্দ্রে না যায়, সেটা নিশ্চিত করতে। সংখ্যালঘু ভোটাররা তাঁর ইঙ্গিত

বুঝতে পারেন এবং ভয়ে কেউ ভোটকেন্দ্রে হাজির হননি। বিপুল ভোটে ফজলুল কাদের চৌধুরী নির্বাচিত হন। ভোটকেন্দ্রে কোনো জাল ভোট দেওয়া হয়নি, কোনো প্রিসাইডিং বা পোলিং অফিসার বা পুলিশ কর্মকর্তাকে কোনো উৎকোচ দিতে হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, যদিও সব ভোটার উপস্থিত থাকলে তিনি নির্বাচিত হতে পারতেন না। এখানে পেশিশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি, পেশিশক্তির ভয় দেখিয়েই ফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের নির্বাচন নিশ্চয়ই অবাধ ও সুষ্ঠু নয়।

আসলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি অত্যন্ত দুরূহ প্রক্রিয়া। সুশাসন থেকে যেকোনো বিচ্যুতি নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। কাজেই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন এমন একটি সরকার, যা নির্বাচন-ব্যবস্থাকে কোনোভাবেই প্রভাবান্বিত হতে দেবে না। এই অধ্যায়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। অধ্যায়টি মূলত পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে নির্বাচনকালীন সরকার-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রস্তাবনার পর দ্বিতীয় খণ্ডে নির্বাচনকালীন সরকার-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে ই-ভোটিং (বৈদ্যুতিন ভোট)-এর সম্ভাবনা ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কী কী ব্যবস্থা জরুরি, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## ১২.২ নির্বাচনকালীন সরকার

নির্বাচনকালীন সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল। যেখানে গণতন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভের কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। তাই সরকারে যে-ই থাকুক না কেন, ভোটাররা নির্ভয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং ভোটের ফলাফলে জনমতই প্রতিফলিত হয়। তবে উন্নয়নশীল দেশে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও অন্তরে অনেক রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নেই। এসব দেশে নির্বাচন মানে একধরনের খেলা এবং এরা ভোটে জেতার জন্য যেকোনো প্রতারণা-ছলনা এবং জাল-জালিয়াতি করতে দ্বিধাবোধ করে না। এর ফলে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে উন্নত দেশগুলোতে তত মাথাব্যথা নেই। এটি প্রধানত উন্নয়নশীল দেশের একটি বড় সমস্যা।

দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এখানে ক্ষমতাসীন দল নানাভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* ১৯৫৪ সালে ক্ষমতাসীন সরকার তাঁকে পরাজিত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিল, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> ঢাকা থেকে পুলিশের প্রধানও গোপালগঞ্জে হাজির হয়ে পরিষ্কারভাবে তার কর্মচারীদের হুকুম দিলেন মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে। ফরিদপুর জেলার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আলতাফ গওহর সরকারের পক্ষে কাজ করতে রাজি না হওয়ায় সরকার তাকে বদলি করে আরেকজন কর্মচারী আনলেন। তিনি আমার এলাকায় যেয়ে নিজেই বক্তৃতা করতে শুরু করলেন এবং ইলেকশনের তিন দিন পূর্বে সেন্টারগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলেন, যেখানে জামান সাহেবের সুবিধা হতে পারে। আমার পক্ষে জনসাধারণ, ছাত্র ও যুবকরা কাজ করতে শুরু করল নিঃস্বার্থভাবে। নির্বাচনের চার দিন পূর্বে শহীদ সাহেব সরকারি দলের ঐসব অপকীর্তির খবর পেয়ে হাজির হয়ে দু'টা সভা করলেন। আর নির্বাচনের একদিন পূর্বে মওলানা সাহেব হাজির হয়ে একটা সভা করলেন। নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্বে খন্দকার শামসুল হক মুক্তার সাহেব, রহমত জান, শহীদুল ইসলাম ও ইমদাদকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে ফরিদপুর জেলে আটক করা হলো। একটা ইউনিয়নের প্রায় চল্লিশজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। নির্বাচনের মাত্র তিনদিন পূর্বে আরও পঞ্চাশ জনের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়।[১]

তবে ১৯৫৪ সালে জনমত সরকারের এত বিপক্ষে ছিল যে নির্বাচনকালীন সরকারের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও নির্বাচনে ভরাডুবি ঠেকানো যায়নি। ১৯৫৪ সালের পর সামরিক শাসনামলে ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করার জন্য নতুন নতুন কৌশল বের করে। বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণসমর্থনহীন সামরিক শাসকেরা তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচনকে একটি প্রহসনে পরিণত করেন। এ ধরনের পরিস্থিতি ব্রিটিশ শাসনামলে ছিল না, তার কারণ হলো যে দেশীয় রাজনীতিবিদেরা জালিয়াতি করতে চাইলেও তাতে বিদেশি শাসকেরা বাধা দিত। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ ধরনের হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়ে যায় এবং নির্বাচন-ব্যবস্থায় লোকের আস্থা কমে যায়। বাংলাদেশে এরশাদের শাসনামলে সরকারের হস্তক্ষেপ এত বেড়ে যায় যে নির্বাচন প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে যখন ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে গেল, তখন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ

দাবি করল যে ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় থেকে নয়, ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতা ছাড়ার পর স্বাধীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে তাদের ব্যবস্থাপনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশে সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন ১৯৯৬-এর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পাওয়া না যায়, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হবে। যদি এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্যে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহৃত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনা করে কাউকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে। যদি এটিও সম্ভব না হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এসব নির্বাচনে যে দল হেরে যায়, তারা নির্বাচনকে কারচুপির নির্বাচন বলে প্রত্যাখ্যান করে। তবে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরা অভিমত ব্যক্ত করেন, এসব নির্বাচন স্বাধীন, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। ২০০০ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন প্রোগ্রাম তাদের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report 2000)-এ বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নতুন গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়যাত্রারূপে (an important advance in new democracy) আখ্যায়িত করেছে।[২] ইতিমধ্যে বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থাকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়। এই রায়ের প্রধান যুক্তি হলো, তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অনির্বাচিত সরকার এবং একটি গণতান্ত্রিক দেশ অনির্বাচিত সরকার দ্বারা শাসিত হতে পারে না। অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে যে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার বৈধতা মেনে নেন এবং নির্দেশ দেন যে সংসদ সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা আরও দুটি নির্বাচনে বহাল রাখতে পারে। অবশ্য পরে বিস্তারিত রায়ের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন আইনগত দিক থেকে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না? এ ব্যবস্থার সমালোচকেরা বলে থাকেন যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। ভারতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো বিধান নেই, কিন্তু পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়াই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশ গণতন্ত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থা নেই। এ ধরনের অনির্বাচিত সরকার গণতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। সুতরাং বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো প্রয়োজন নেই। এই বক্তব্যে যেসব যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা সঠিক। কিন্তু শুধু উপরিউক্ত যুক্তির ভিত্তিতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক হবে না। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে :

### ১. বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর অসাধারণ ক্ষমতা

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা রয়েছে, পৃথিবীর খুব অল্প রাষ্ট্রেই সরকারপ্রধানের এত ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাধারণত তিন পর্যায়ের সরকার থাকে। প্রথমত, সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার; দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে প্রাদেশিক সরকার; এবং তৃতীয় পর্যায়ে থাকে স্থানীয় সরকার। প্রাদেশিক সরকার ও স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধস্তন স্তরের হলেও তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা কেন্দ্রের আদেশ বাস্তবায়ন না করে নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশে মাত্র এক স্তরের সরকার (Unitary) রয়েছে এবং সরকারপ্রধান যা চাইবেন, তা-ই ঘটবে। ভারতে বর্তমানে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার রয়েছে কিন্তু সব প্রদেশে বিজেপির শাসন নেই। কাজেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ভারতের সর্বত্র যা খুশি তা-ই করা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষেও অনেক কিছু করা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন পুলিশ বাহিনী আছে, তেমনি প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারেরও নিজস্ব পুলিশ বাহিনী রয়েছে। কোন ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পুলিশ বাহিনী কাজ করবে, সে সম্পর্কেও দেশটিতে আইন রয়েছে। কাজেই ট্রাম্প চাইলেই প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনী অথবা স্থানীয় সরকারের পুলিশ বাহিনী কোনো ব্যবস্থা নেবে না। অন্যদিকে আইন অনুসারে বাংলাদেশে পুলিশ বাহিনী একটি এবং এই পুলিশ বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করেন দেশের সরকারপ্রধান। তিনি যে আদেশ দেবেন, পুলিশ বাহিনী সে আদেশ পালন করবে। এ ধরনের কেন্দ্রীভূত সরকার পৃথিবীর খুব কম দেশেই রয়েছে। পুলিশের ওপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই

অসীম ক্ষমতা নির্বাচনের ওপর অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে। (যদি বিরোধী দলের বক্তব্য মেনে নিই, তাহলে এ ধরনের প্রভাব পড়ছেও)।

### ২. সরকারপ্রধান দলের প্রধান

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধিই নন, তিনি একটি রাজনৈতিক দলের প্রধানও বটে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হলো 'ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সবার প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করা'। অথচ দলীয় প্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হলো দলের লোকদের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করা। নির্বাচনের সময় তাই স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশি।

### ৩. আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণ

এখানে আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যে ভাগ সরকারের অনুগত থাকে, সরকার তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়। আর যারা সরকারের বিরোধী থাকে, তাদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যায়, অতি সম্প্রতি অনুগত কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো পদ ছাড়া বাংলাদেশে হাজার হাজার কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সরকারকে বছরে ১০০ কোটি টাকার বেশি গচ্চা দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে আমলাতন্ত্র নির্বাচনী কারচুপিতে অংশ নিয়েছে এবং তার ফলে এদের ওপর জনগণের আস্থা অনেকাংশে কমে গেছে। ভারতে এক থেকে তিন মাস সময় ধরে নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনে প্রদত্ত ব্যালট ভোট গণনার পূর্ব পর্যন্ত কর্মকর্তাদের কাছে গচ্ছিত থাকে। ভারতে এখন পর্যন্ত এ ধরনের ব্যালটে কোনো হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, এমন অভিযোগ কোনো নির্বাচনী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়নি। অথচ বাংলাদেশে একজন নির্বাচনী কর্মকর্তাও পাওয়া যাবে না, যার কাছে এক দিনের জন্যও ব্যালট জমা রাখতে সব রাজনৈতিক দল রাজি হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করা না হবে, তত দিন পর্যন্ত বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা থেকে যাবে।

### ৪. রাজনৈতিক সংস্কৃতি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রের জন্য একটি বড় সমস্যা। এখানে সংঘাতের রাজনীতি চলছে। এক দল অপর দলকে যেকোনো মূল্যে রাজনীতি

থেকে উৎখাত করার জন্য তৎপর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একদল অপর দলের ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণু থাকে। এখানে এ ধরনের সহিষ্ণুতা নেই। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যেকোনো হীন কাজ করতেও অনেক ক্ষেত্রে আপত্তি করে না। কাজেই উদার রাজনৈতিক দল ছাড়া এখানে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়।

### ৫. শুধু নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট নয়

বাংলাদেশের জন্য নির্বাচন একটি বড় উদ্যোগ। সারণি-১২.১ থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০০৯ সালে নবম সংসদ নির্বাচনে শুধু নির্বাচনী কেন্দ্রসমূহে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন প্রায় ১৩ লাখ ৪২ হাজার কর্মকর্তা (যার মধ্যে নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন ৫.৬৭ লাখ কর্মকর্তা এবং আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে ছিলেন পুলিশ ও আনসার বাহিনীর ৭.৭৫ লাখ সদস্য)। এর বাইরে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা টহলে ও ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচনী কেন্দ্রসমূহে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত অসামরিক কর্মকর্তাদের কাজ করতে হয়েছে। তাই সর্বসাকল্যে এই নির্বাচনে সাড়ে চৌদ্দ লাখ থেকে পনেরো লাখ ব্যক্তি কাজ করেছেন। ভোটারসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৪ সালে নির্বাচন খণ্ডিত ছিল। ৯.১৯ কোটি ভোটারের মধ্যে মাত্র ৪.৩৯ কোটি ভোটারের ভোটদানের সুযোগ ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচনে অধিকাংশ ভোটারের ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিল না। অর্থাৎ ভোটদান ছিল অত্যন্ত সীমিত। মোট ভোটারের মাত্র ১৬% ভোট দেয় এবং যেসব কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মাত্র ৩২ শতাংশ ভোটার ভোট দিতে পারে। তাই ২০১৪ সালের নির্বাচনের তথ্যসমূহ ব্যবহার না করে যদি ২০০৯ সালের সংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তির প্রক্ষেপণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে ২০১৪ সালে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কমপক্ষে ষোলো থেকে সাড়ে ষোলো লাখ ব্যক্তিকে কর্তব্য পালন করতে হতো। পরবর্তী নির্বাচনে এই সংখ্যা সতেরো লাখ থেকে সাড়ে সতেরো লাখে দাঁড়াতে পারে। এঁরা সরকারের প্রত্যক্ষ কর্মচারী অথবা সরকারনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। এরা নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা নন। নির্বাচন কমিশনের এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তাই নির্বাচন কমিশনের প্রতি সরকারের পূর্ণ সমর্থন না থাকলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এই বিপুল কর্মী বাহিনীর কাছ থেকে কাজ আদায় করা সম্ভব নয়। কাজেই দেশে এমন সরকার থাকতে হবে, যারা নির্বাচন কমিশনের সাথে একযোগে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বাধীন নির্বাচন করতে চায়।

| | সপ্তম সংসদ, ১৯৯৬ | অষ্টম সংসদ, ২০০১ | নবম সংসদ, ২০০৯ | দশম সংসদ, ২০১৪ |
|---|---|---|---|---|
| ভোটার সংখ্যা | ৫.৬৭ কোটি | ৭.৪৯ কোটি | ৮.১০ কোটি | ৯.১৯ কোটি (নির্বাচন হয় ৪.৩৯ কোটি ভোটারের |
| প্রদত্ত ভোট | ৪.২৮ কোটি | ৫.৬১ কোটি | ৭.০৬ কোটি | ১.৩৯ কোটি |
| প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার | ৭৬% | ৭৫% | ৮৮% | ১৬% সকল ভোটের এবং ৩২% যেসব কেন্দ্রে নির্বাচন হয়েছে তার ভিত্তিতে। |
| নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা | ২৫,৯৫৭ | ২৯,৯৭৮ | ৩৫,২৬৩ | ১৮,২০৮ (যেসব কেন্দ্রে নির্বাচন হয়েছে) |
| নির্বাচনী বুথের সংখ্যা | ১,১৪,৭৪৯ | ১,৪৯,২৮৮ | ১,৭৭,২৭৭ | ৯১,২১৩ (যেসব বুথে নির্বাচন হয়েছে) |
| রিটার্নিং অফিসারের সংখ্যা | ৬৭ | ৬৮ | ৬৬ | ৬৬ |
| সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সংখ্যা | ৫০৬ | ৫২৫ | ৫৮৭ | ৫৭৭ |
| প্রিসাইডিং অফিসারের সংখ্যা | ২৫,৯৫৭ | ২৯,৯৭৮ | ৩৫,২৬৩ | ১৮,২০৮ |
| সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার | ১,১৪,৭৪৯ | ১,৪৯,২৮৮ | ১,৭৭,২৭৭ | ৯১,২১৩ |
| দায়িত্বরত মোট কর্মকর্তার সংখ্যা | ৩,৭০,২০৪ | ৪,৭৭,৮৪২ | ৫,৬৭,০৯৪ | ২,৮১,৮৪৭ |
| কর্তব্যরত পুলিশ ও আনসার (এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে অতিরিক্ত দুজন ও মোবাইল কর্তব্যরত সেনাবাহিনী ও বিজিবির সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি) | ৫,৭১,০৫৪ | ৬,৫৯,৫১৬ | ৭,৭৫,৭৮৬ | --- |

তাত্ত্বিকভাবে চার ধরনের নির্বাচনকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব :

১. অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার।
২. সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার।
৩. নির্বাচন ঘোষণার সময়ে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল, সেই সরকার কর্তৃক নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন।
৪. নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনার জন্য সরকার ও বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রীদের সমন্বয়ে দেশ পরিচালনা করা।

## ১. অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বাংলাদেশের আগে পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানে এ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান ছিল না। বাংলাদেশে এই বিধান সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের অনুকরণে পাকিস্তানে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানে ২২৪ ১এ ও ১বি অনুচ্ছেদে ২০১০ সালে অষ্টম সংবিধান সংশোধনী আইনে নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছে :

> (1A) On dissolution of the Assembly on completion of its term, or in case it is dissolved under Article 58 or Article 112, the President, or the Governor, as the case may be, shall appoint a care-taker Cabinet:
>
> Provided that the care-taker Prime Minister shall be (appointed) by the President in consultation with the Prime Minister and the Leader of the Opposition in the outgoing National Assembly, and a care-taker Chief Minister shall be appointed by the Governor in consultation with the Chief Minister and the Leader of the Opposition in the outgoing Provincial Assembly:
>
> [Provided further that if the Prime Minister or a Chief Minister and their respective Leader of the Opposition do not agree on any person to be appointed as a care-taker Prime Minister or the care-taker Chief Minister, as the case may be, the provisions of Article 224A shall be followed:]
>
> Provided [also] that the Members of the Federal and Provincial care-taker Cabinets shall be appointed on the advice of the care-taker Prime Minister or the care-taker Chief Minister, as the case may be.
>
> (1B) Members of the care-taker Cabinets including the care-taker Prime Minister and the care-taker Chief Minister and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections to such Assemblies.

যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের বিষয়ে একমত হতে ব্যর্থ হন, সেখানে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

224A. (1) In case the Prime Minister and the Leader of the Opposition in the outgoing National Assembly do not agree on any person to be appinted as the care-taker Prime Minister, within three days of the dissolution of the National Assembly, they shall forward two nominees each to a Committee to be immediately constituted by the Speaker of the National Assembly, comprising eight members of the outgoing National Assembly, or the Senate, or both, having equal representation from the Treasury and the opposition, to be nominated by the Prime Minister and the Leader of the Opposition respectively.

(2) In case a Chief Minister and the Leader of the Opposition in the outgoing Provisional Assembly do not agree on any person to be appinted as the care-taker Chief Minister, within three days of the dissolution of that Assembly, they shall forward two nominees each to a Committee to be immediately constituted by the Speaker of the Provincial Assembly., comprising six members of the outgoing Provincial Assembly having equal representation from the Treasury and the Opposition, to be nominated by the Chief Minister and the Leader of the Opposition repectively.

(3) The Committee constituted under clause (1) or (2) shall finalize the name of the care-taker Prime Minister or care-taker Chief Minister, as the case may be, within three days of the referral of the matter to it:

Provided that in case of inability of the Committee to decide the matter in the aforesaid period, the names of the nominees shall be referred to the Election Commission of Pakistan for final decision within two days.

(4) The incumbent Prime Minister and the incumbent Chief Minister shall continue to hold office till appointment of the care-taker Prime Minister and the care-taker Chief Minister, as the case may be.

(5) Notwithstanding anything contained in clauses (1) and (2), if the members of the Opposition are less than five in the Majlis-e-Shoora (Parliament) and less than four in any Provincial Assembly, then all of them shall be members of the Committee mentioned in the aforesaid clauses and the Committee shall be deemed to be duly constituted].[৩]

পাকিস্তানে যদি সর্বসম্মতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা সম্ভব না হয়, তাহলে কমিটি কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়। এবং সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তত্ত্বাবধায়ক

সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা নির্ধারণ করে। পাকিস্তানে সংবিধানের এই সংশোধনী নিয়ে কোনো আইনগত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। অতি সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার ইচ্ছা করলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দাখিল করতে পারে। তবে সুপ্রিম কোর্ট এই পিটিশন যে গ্রহণ করবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

## ২. সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার

এ ধরনের সরকার এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে সংবিধান সংশোধন করে নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ৯০ দিনের জন্য একটি নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে নিম্নরূপ :

ক. বিদায়ী সংসদ এই নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচন করবে। তবে এই সরকারের মেয়াদ হবে ৯০ দিন। ৯০ দিনের পর এই সরকার থাকবে না, যদি ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ব্যর্থ হয়, তবে পুরোনো সংসদ আবার ৯০ দিনের জন্য আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন করবে।

খ. নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ২০টি আসন থাকবে। ২০টি আসনের মধ্যে ১০টি আসনের জন্য সরকারি দল ২০ জন দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেবে আর বিরোধী দলসমূহ বাকি ১০টি আসনে ২০ জন দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেবে। সংসদ সরকারি দলের মনোনীত ২০ জন প্রার্থী থেকে ১০ জন এবং বিরোধী দলের মনোনীত প্রার্থী থেকে ১০ জন সদস্যকে নির্বাচিত করবে।

গ. নির্বাচিত ২০ জন সদস্য গোপন ব্যালটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবেন। যদি ব্যালটে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তাহলে লটারির মাধ্যমে এই ২০ জনের মধ্যে একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হবেন।

ঘ. এই সরকারের দায়িত্ব হবে নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনা করা এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা।

যেহেতু এই সরকার সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে, সেহেতু এই সরকারকে অগণতান্ত্রিক সরকার বলা যাবে না। তাই সুপ্রিম কোর্টের রায় এ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তবে এ ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠায় মূল সমস্যা আইনগত নয়, সমস্যাটি হলো রাজনৈতিক। বর্তমান

সরকার যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কোনোমতেই রাজি নয়, সেহেতু এ ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে খুব একটা আছে বলে মনে হয় না।

**৩. নির্বাচন ঘোষণার সময়ে যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, সেই সরকার কর্তৃক নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন**

বাংলাদেশে বর্তমানে সংঘাতের রাজনীতি চলছে। এই সংঘাতের রাজনীতিতে বিরোধী দল কখনো ক্ষমতাসীন সরকারের নিরপেক্ষতার দাবি মানবে না। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলও তাদের ক্ষমতা হ্রাস করতে রাজি হবে না। এই অবস্থাতে এ ধরনের সরকার অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে সক্ষম হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

**৪. নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনার জন্য সরকার ও বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রীদের সমন্বয়ে দেশ পরিচালনা করা**

বিগত নির্বাচনের সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের একটি প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু বিরোধী দল এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। বিরোধী দলের বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশে বর্তমানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু আছে, তাতে সব ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। মন্ত্রীরা ঠুঁটো জগন্নাথ। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কোনো ক্ষমতা নেই। কাজেই বিরোধীদলীয় সদস্য মন্ত্রিসভায় থাকলেও সরকারের ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে প্রধানমন্ত্রী নিজে চাইলে তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করা সম্ভব। তাঁর ক্ষমতার উৎস হলো কার্যবিধিমালা বা Rules of Business। কার্যবিধিমালায় বিধান রয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী চাইলে যেকোনো বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিতে পারবেন। আর ওই নির্দেশ মন্ত্রণালয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। উপরন্তু প্রজাতন্ত্রের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ ও বদলিতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলে কার্যবিধিমালা ভেঙে ব্যবস্থা নেওয়ার অগ্রিম অনুমতি দিতে পারেন অথবা কার্যবিধিমালার যেকোনো বিচ্যুতি অনুমোদন করতে পারেন। এই অবস্থায় নির্বাচনকালীন সরকারের ক্ষেত্রে কার্যবিধিমালায় দুটি পরিবর্তন আনলে বিরোধীদলীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যরাও সরকার পরিচালনায় সমদায়িত্ব পালন করতে পারেন। প্রথমত, ওপরে বর্ণিত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাসমূহ নির্বাচনকালে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে মন্ত্রিপরিষদের হাতে দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাচনকালীন সরকারের জন্য বিধান করা যেতে পারে যে এই

সরকারের সব সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হতে হবে। তাহলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং বিরোধী দলের পক্ষে সরকারে অর্থবহ অংশগ্রহণ সম্ভব হতে পারে। আরও একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। নির্বাচনকালে কোনো দলের প্রধান বা মহাসচিব নির্বাচনী মন্ত্রিসভার সদস্য হবেন না, এ ধরনের বিধান করা যেতে পারে। এ ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন নেই। Rules of Business এ সংশোধন এনে তা প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করতে পারেন।

## ১২.৩ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবলই সংবিধান ও আইনের অধীন হবে। তবে এই স্বাধীনতা তাত্ত্বিক। সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে যে নির্বাচন কমিশনকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মাধ্যমেই নির্বাচন করতে হবে। তাই সংবিধানের ১২০ অনুচ্ছেদে বিধান করা হয়েছে যে, 'এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।' সংবিধানের ১২৬ ধারায় আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে তাকে সহায়তা করা সব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলে গণ্য হবে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কারও ওপর নির্ভর না করে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ বিষয়গুলো হলো নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের নিয়মাবলি, নির্বাচন অনুষ্ঠানের তফসিল এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ভিত্তিতে নির্বাচন সংক্রান্ত সব বিষয়ে নির্দেশ প্রদান। কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন দেশের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল। নির্বাচন কমিশন ছাড়া চার ধরনের কর্মকর্তা নির্বাচন অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেন :

১. রিটার্নিং অফিসার
২. অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৩. প্রিসাইডিং অফিসার
৪. পোলিং অফিসার।

রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা সম্পর্কে The Representation of the People Order, ১৯৭২-এর ৭(৪ ও ৫) ধারাতে নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছে :

4. It shall be the duty of a Returning Officer to do all such acts and things as may be necessary for effectively conducting an election in accordance with the provisions of this order and the rules.

5. Subject to the superintendence, direction and control of the Commission, the Returning Officer shall supervise all work in the district in connection with the conduct of elections and shall also perfonn such other duties and functions as may be entrusted to him by the Commission.[8]

এই বিধানের ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারকে দেওয়া হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারের ওপর নির্বাচন কমিশনের মাত্র তিনটি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে : 'Suprintendence direction and control. এই ধরনের দায়িত্ব অবশ্যই আইনের মাধ্যমে পালন করতে হয়। পক্ষান্তরে রিটার্নিং অফিসারের নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতা আইনের ৯(২) ধারায় প্রিসাইডিং অফিসারকে দেওয়া হয়েছে :

A Presiding Officer shall conduct the poll in accordance with the provisions of this Order, and the rules, shall be responsible for maintaining order at the polling station and shall report to the Returning Officer any factor or incident which may, in his opinion, affect the fairness of the poll:

Provided that during the course of the poll the Presiding Officer may entrust such of his functions as may be specified by him to any Assistant Presiding Officer and it shall be the duty of the Assistant Presiding Officer to perform the functions so entrusted.

আইন অনুসারে সরকার সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকেই রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ দিতে পারে। এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কোনো দায়িত্ব নেই, তবে কোনো নিয়োগের বিরুদ্ধে কেউ আপত্তি করলে নির্বাচন কমিশন সে কর্মকর্তাকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। তাই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের ভূমিকা নির্বাচন কমিশনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। তবে রিটার্নিং অফিসারের পক্ষে একা সব ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। কাজেই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শুধু নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাই যথেষ্ট নয়, এর জন্য রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের নিরপেক্ষতাও অপরিহার্য। নিচের সারণি-১২.২-এ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাঁদের কাজের অসুবিধাসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

| | | |
|---|---|---|
| তালিকা প্রণয়ন | ২. নির্বাচন কমিশন<br>৩. ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প | কার্যকর হতে হবে :<br>ক. মৃত ভোটারদের নাম দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা থাকতে হবে,<br>খ. নতুন ভোটার যথাসময়ে যোগ করতে হবে,<br>গ. ভুয়া ভোটার যাতে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় না ঢুকে পড়ে, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। |
| ৩. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি | ১. মূল ভূমিকা সরকারের<br>২. নির্বাচন কমিশন সরকারকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে বাধ্য করতে পারে | ১. দেশের সব আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে<br>২. নির্বাচন কমিশন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবে এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করবে। সরকার ব্যবস্থা না নিলে কমিশন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত অথবা বাতিল করবে। সরকার সহযোগিতা না করলে কমিশন প্রয়োজনবোধে সুপ্রিম কোর্টের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ করবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১৫ দিন আগে থেকে পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং নির্বাচন সমাপ্তির কমপক্ষে সাত দিন পর্যন্ত এই পরিবীক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। |
| ৪. ভোটের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা | ১. রিটার্নিং অফিসার<br>২. নির্বাচন কমিশন | ১. ভোটকেন্দ্র নির্বাচনের কাজটি দুই ধাপে করা যেতে পারে। প্রথম দফায় সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করে জনসাধারণকে আপত্তি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সব আপত্তি বিবেচনা করে নির্বাচনী কেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করা যেতে পারে।<br>২. রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। |

| | | |
|---|---|---|
| ৫. সম্ভাব্য প্রিসাইডিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন | ১. রিটার্নিং অফিসার<br>২. নির্বাচন কমিশন | ১. বর্তমানে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারকে দেওয়া হয়েছে। যদি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোকে আপত্তি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই বিতর্কিত কর্মকর্তা নিয়োগ বন্ধ করা যেতে পারে।<br>২. যদি কারও কাছে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে না হয়, তবে তাঁকে নির্বাচন কমিশনে আপিল করার সুযোগ দিতে হবে। বর্তমানে এই ধরনের আপত্তি শোনার কোনো বিধান নেই। কিন্তু এই বিধানটি অত্যন্ত জরুরি। উপরন্তু বর্তমান আইনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োগের বিধান রয়েছে। এর ফলে রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিষ্ঠানের (যথা ইসলামী ব্যাংক অথবা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মালিকানাধীন ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি) কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব। এ বিধান সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। |
| ৬. পোলিং এজেন্টের উপস্থিতি | ১. প্রিসাইডিং অফিসার<br>২. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ<br>৩. সংশ্লিষ্ট নির্বাচন প্রার্থী অথবা রাজনৈতিক দল | ১. পোলিং এজেন্টদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার সব সুযোগ দানের জন্য প্রিসাইডিং অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।<br>২. তাঁদের জানমাল হেফাজতের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।<br>৩. এই সুযোগ গ্রহণের জন্য নির্বাচনের প্রার্থী ও অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোকেও নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। |
| ৭. ভোটকেন্দ্র দখল | ১. প্রিসাইডিং অফিসার ও অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ<br>২. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ<br>৩. পোলিং এজেন্ট | ১. ভোটকেন্দ্র দখলের ঘটনায় অনেক সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের যোগসাজশ থাকে। যে কারণে নির্বাচনী কেন্দ্রের ব্যবস্থাপকের পক্ষ থেকে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে কোনো সরাসরি সাহায্য পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় ফলাফল প্রকাশের আগে কী পরিমাণ ভোট দেওয়া হয়েছে, সেটা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। |

| | | |
|---|---|---|
| পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত সুযোগ প্রদান | অফিসার ও অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ<br>২. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ<br>৩. পর্যবেক্ষকবৃন্দ | স্বচ্ছ নির্দেশ থাকা উচিত। যদি তাঁদের যথোপযুক্ত সুযোগ না দেওয়া হয়, তা দেখার জন্য ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শনকারী দলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। |
| ৯. ভোট গণনায় জাল ভোট | ১. নির্বাচন কমিশন<br>২. রিটার্নিং অফিসার | ১. যেখানে জাল ভোট বেশি পড়ে, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভোটের হারও অত্যন্ত বেশি হয়। যেসব কেন্দ্রে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে ভোটের হার অধিক (৯০ অথবা ৯৫ শতাংশের বেশি), সেসব কেন্দ্রের ফলাফল নির্বাচন কমিশনের বিবেচনায় নেওয়া উচিত এবং যদি জালিয়াতির আপাতগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে নির্বাচন কমিশন সেই ভোট বাতিল করে কেন্দ্রে নতুন ভোট অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিতে পারে। তেমনি আবার যদি কোনো কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে, তাহলে সেখানে ভোটার উপস্থিতির হারও খুবই কম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে পূর্ববর্তী দুটি কিংবা তিনটি নির্বাচনে কোনো কেন্দ্রে যদি ৭০-৭৫ ভাগ ভোটার উপস্থিত থাকেন এবং সর্বশেষ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার হয় ৩০ বা ৪০ শতাংশ, তাহলে নির্বাচন কমিশন সেই নির্বাচন কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করে পুনরায় ভোট গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে। এ ছাড়া যদি নির্বাচনে জালিয়াতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে রিটার্নিং অফিসার অথবা নির্বাচন কমিশন সেই কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল ঘোষণা করে পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা নিতে পারে। |

ওপরের সারণি থেকে যেসব সংস্কার প্রয়োজনীয় বিবেচিত হচ্ছে, সেগুলোকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :

১. সংস্কারের প্রয়োজন কিন্তু এ ধরনের সংস্কার কার্যকর করার জন্য দীর্ঘ সময়ের দরকার। সে ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদে এ সমস্ত ত্রুটি-দুর্বলতা হ্রাস করার উদ্যোগ নিতে হবে।
২. সংস্কারের প্রয়োজন এবং এই মুহূর্তেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১. সংস্কারের প্রয়োজন কিন্তু এ ধরনের সংস্কার কার্যকর করার জন্য দীর্ঘ সময়ের দরকার—

ক. **নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা :** নির্বাচন কমিশন ও সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়ে থাকে যে নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নেই এবং অর্থের অভাবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ কথা সত্যি, বাজেট বরাদ্দের জন্য নির্বাচন কমিশনকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং সব সময় কমিশন অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায় না। অন্যদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অভিযোগ করা হয় যে নির্বাচন কমিশনের সব ব্যয় জরুরি ভিত্তিতে করা হয় এবং সব ক্ষেত্রে সরকারের বিধিমালা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না। এর ফলে এ ধরনের খরচে দুর্নীতি ও অনিয়মের অবকাশ রয়েছে। কাজেই নির্বাচন কমিশনকে তার চাহিদামতো অর্থ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। উপরন্তু সরকারের সম্পদ অসীম নয়, ফলে নির্বাচন কমিশনকে অতিরিক্ত অপ্রত্যাশিত বরাদ্দ দিতে গেলে সরকারের অন্যান্য ব্যয়ের ওপর চাপ পড়ে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে Charged Expenditure ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ বাজেট পাস করে। একমাত্র ব্যতিক্রম করা হয়েছে জাতীয় সংসদের নিজের বাজেটের ক্ষেত্রে। এই বাজেট জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি (যাতে স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা থাকেন) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু এই কমিটি বাজেট অনুমোদনের পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য বিবেচনা করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের আপত্তির ভিত্তিতে প্রস্তাবিত বাজেটের আকার হ্রাস করা হয়। যেহেতু সংসদ নির্বাচনের সময়ে সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়, সেহেতু জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তবে নির্বাচন ঘোষণার আগে এ ধরনের বাজেট কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করা যেতে পারে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, অতীতে যেখানে নির্বাচন

কমিশনের সব দাবি মেটানো সম্ভব হয়নি, সেখানেও নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো বড় সমস্যা দেখা দেয়নি।

খ. **নির্বাচনী ব্যয়সংক্রান্ত আইনের সংস্কার :** পৃথিবীর সর্বত্র অনৈতিক নির্বাচনী ব্যয় গণতন্ত্রের জন্য একটি বড় সমস্যা। একজন পর্যবেক্ষক যথার্থই লিখেছেন :

> Lavishly funded electoral campaigns have become the only way to get elected and the biggest threat to good government once the polls have closed. Money and politics have been intimately linked since democracy's earliest days, and campaign finance scandals are exposed and forgotten with dismaying regularity. But a recent rash of scandals in affluent and stable democracies reveals new forces at work.[৫]

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জার্মানি, ইসরায়েল থেকে দক্ষিণ এশিয়া—সর্বত্রই নির্বাচনের ক্ষেত্রে কালোটাকার অভিযোগ রয়েছে। এ সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে বিশ্বায়ন। উন্নত দেশের বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে চায়। আবার উন্নত দেশসমূহেও এ ধরনের দুর্নীতি চলছে।

কোনো কোনো দেশে নির্বাচনে দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য জাতীয় নির্বাচনে সরকারের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই বরাদ্দের ফলে নির্বাচনে দুর্নীতি কমেনি। মূল প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার বাইরে, সমর্থকেরাও তাঁদের পছন্দের প্রার্থীর সমর্থনে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু আইন অনুসারে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় নেই। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই নির্বাচনে কালোটাকার দৌরাত্ম্য কমানো সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে মাত্র তিনটি দেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। সেই দেশগুলো হলো সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে। বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়েতে নির্বাচনী ব্যয় সীমিত। এর কারণ হলো ওই তিন দেশে রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্বাস করে যে যেসব প্রার্থী নির্বাচনে বেশি অর্থ ব্যয় করেন, তাঁদের মনোনয়ন দেওয়া ঠিক হবে না। এই তিন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দুর্নীতিবাজ প্রার্থীদের বাদ দেওয়া হয়। এ সংস্কৃতির জন্যই এই তিনটি দেশে নির্বাচনের ব্যয় সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে। কাজেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোতে একই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই পরিবর্তন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীদের কোনো সরকারি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় না। তবে প্রার্থীদের অর্থ সংগ্রহ এবং নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কে সর্বোচ্চ সীমা আইনে নির্ধারণ

করা হয়েছে। নির্বাচন শেষে সব প্রার্থীর জন্য এ সম্পর্কে হিসাব দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে এ ধরনের বিধান নির্বাচনে দুর্নীতি হ্রাসে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয় না। তবু প্রচলিত বিধিবিধানকে কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্বাচনে কালোটাকার দৌরাত্ম্য হ্রাস করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ. **নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ নির্বাচন কমিশনের অধীনে সৃষ্টি করা :** নির্বাচন কমিশনকে বর্তমানে কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাঁদের ওপর নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ। যদি নির্বাচনের সময় সব গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা অধিষ্ঠিত থাকেন, তবে তাঁদের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন করা অনেক সহজ হয়। তবে এ ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব বলে মনে হয় না। বাংলাদেশে নির্বাচনের কাজে প্রায় ৫.৬৭ লাখ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ব্যবহার করা হয়। নির্বাচন সব সময় অনুষ্ঠিত হয় না। কাজেই নির্বাচন কমিশনে এত পদ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যদি ধরে নেওয়া হয় যে শুধু নির্বাচন পরিচালনার জন্য দরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পদগুলো কমিশনে সৃষ্টি করতে হবে, তাহলেও প্রায় ছয় শ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করতে হয়। যখন নির্বাচন থাকবে না, তখন এসব কর্মকর্তার যথেষ্ট কাজ থাকবে না। এখানে আরও একটি বড় সমস্যা রয়েছে, রিটার্নিং অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারকে সরকারের সব শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজের সমন্বয় করতে হয়। এ ধরনের কাজ প্রশাসন পরিচালনায় অভিজ্ঞ না হলে করা সম্ভব নয়। এ জন্য বাংলাদেশে রিটার্নিং অফিসার পদে সব সময়ই ডেপুটি কমিশনার বা অ্যাডিশনাল কমিশনারদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ভারতেও একই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তানে যে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে নির্বাচনে জেলা জজদের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক পরিবেশে নির্বাচন কমিশনে পাঁচ-ছয় শ প্রথম শ্রেণির অফিসার পদ মঞ্জুর করা হলেও এ ধরনের কর্মকর্তারা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবেন কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আরও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন।

২. সংস্কারের প্রয়োজন এবং এই মুহূর্তেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে—

ক. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। অতীতে এই উপমহাদেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক

দলগুলোই প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দিয়েছে, কিন্তু এ ধরনের নিয়োগ নিয়ে অতীতে কোনো বিতর্ক দেখা যায়নি। বর্তমানে সরকার যাকেই নিয়োগ দেয়, বিরোধী দল সেটাকেই সন্দেহ করে। কাজেই নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও সদস্যদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা অসম্ভব যদি না রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে মনোনয়নের জন্য বিভিন্ন কমিটি সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এসব কমিটির মনোনয়ন নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা মোটামুটিভাবে সন্তোষজনকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালনে সফল হয়েছেন (যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদেরও সমালোচনা করা হয়েছে)। গত তিন দশকে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক মনোনীত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনের সদস্যরা বিরোধী দলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হননি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ সমস্যার কোনো চটজলদি সমাধান নেই। যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলে বিধান করা যেতে পারে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করবে এবং তারা একটি স্বাধীন কমিটি এই সব পদে মনোনয়নের জন্য গঠন করবে। কিন্তু আপাতত বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সংসদীয় কমিটির অনুমোদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেহেতু সংসদীয় কমিটির বেশির ভাগ সদস্যই সরকারি দলের, সেহেতু এসব ক্ষেত্রে সরকারি মনোনয়ন সংসদীয় কমিটিতে পাস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু সংসদীয় কমিটিতে বিরোধী দলীয় সদস্যরা থাকেন এবং তাঁরা সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের বিশেষ অযোগ্যতা শুনানির সময় তুলে ধরতে পারেন। এর ফলে সরকার হয়তো অতি বিতর্কিত প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। উপরন্তু নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্য কমিশনারদের নির্বাচন ও যোগ্যতা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই আইনে সংসদীয় কমিটির অনুমোদনের জন্য বিধান রাখতে হবে।

খ. **ভোটকেন্দ্র নির্বাচনে স্বচ্ছতা এবং এ সম্পর্কে আপিলের ব্যবস্থা করা :** অনেক সময় প্রার্থীরা তাঁদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে চান। এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন। ভোটকেন্দ্রের অবস্থান

নির্বাচনে নিরপেক্ষতার জন্য জরুরি, তাই রিটার্নিং অফিসারদের দায়িত্ব হবে এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসাররা প্রতিটি নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করবেন। এই তালিকা প্রণয়নে পূর্ববর্তী নির্বাচন যেসব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেসব কেন্দ্রকে পুনরায় নির্বাচন করবেন। যদি কোনো পরিবর্তন হয়, তাহলে কেন পরিবর্তন হয়েছে, সে ব্যাখ্যাসহ নতুন কেন্দ্রের স্থান ঘোষণা করবেন। এই প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের পর রাজনৈতিক দল ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের এ ব্যাপারে আপত্তি করার সুযোগ দিতে হবে। রিটার্নিং অফিসার সে আপত্তির ওপর প্রকাশ্য শুনানির ব্যবস্থা করবেন এবং শুনানি শেষে নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করার সুযোগ থাকবে। নির্বাচন কমিশনও প্রকাশ্য শুনানির মাধ্যমে এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে।

গ. **নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা :** পর্যবেক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। কোনো পর্যবেক্ষক যদি উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা না পান, তাহলে রিটার্নিং অফিসার এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর অভিযোগ দাখিল করার স্বচ্ছ পদ্ধতি থাকা উচিত। উপরন্তু পর্যবেক্ষকদের যাতে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়, সেটা নিশ্চিত করার জন্য ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক দলের ব্যবস্থা করা উচিত।

ঘ. **ফলাফল ঘোষণার আগে সম্ভাব্য জাল ভোট চিহ্নিতকরণ ও ওই সব কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা :** নির্বাচন কমিশন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বিগত দুটি বা তিনটি নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করবে। সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করবে যে ওই নির্বাচনী এলাকাতে সর্বোচ্চ কত শতাংশ ভোট পড়া সম্ভব এবং সর্বনিম্ন ভোটের শতকরা হার কী হতে পারে। যদি কোনো কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ভোটের হারের চেয়ে বেশি ভোট পড়ে অথবা সর্বনিম্ন ভোটের হারের চেয়ে কম ভোট পড়ে, তাহলে নির্বাচন কমিশন সেই কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত করতে পারে এবং ওই কেন্দ্রে পুনরায় ভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারে। এই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে যারা জাল ভোট দেয়, তাদেরকে খানিকটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এর ফলে জাল ভোটের পরিমাণ কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে।

ঙ. **নির্বাচনী কর্মকর্তা নিয়োগে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা :** বর্তমানে নির্বাচন কমিশন প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য রিটার্নিং অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে। তাঁরা সাধারণত বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য। এই

ক্যাডারের অনেক কর্মকর্তাই রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত। কাজেই নির্বাচন কমিশন প্রথমে তাঁদের নিয়োগের প্রস্তাব সম্পর্কে একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করতে পারে। এই তালিকা প্রকাশের পর রাজনৈতিক দলগুলো এ সম্পর্কে তাদের লিখিত আপত্তি জানাতে পারে। এসব লিখিত আপত্তি বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবে। প্রিসাইডিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগদান করেন রিটার্নিং অফিসাররা। যে পদ্ধতিতে নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে, সে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে রিটার্নিং অফিসাররাও প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করবেন।

## ১২.৪ ই-ভোটিং বা বৈদ্যুতিন ভোটিং

প্রাচীনকালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালিত হতো মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে। এ ধরনের আলোচনা নগররাষ্ট্রে করা সহজ কিন্তু আধুনিক বিশ্বে এ ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অচল। তাই আজকের দুনিয়ায় বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই ভোটাররা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে ব্যালট ছিল একটি কাগজ। কাগজের মাধ্যমে ভোটাররা তাঁদের পছন্দ নির্দেশ করতেন। অতি সম্প্রতি বিশ্বের সর্বত্র বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কাগজ ছাড়া ভোট দেওয়া সম্ভব। ভোটাররা সরাসরি কম্পিউটারে বোতাম টিপে তাঁদের পছন্দ প্রকাশ করতে পারেন। বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ের অনেক সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, এ ধরনের ভোটের হিসাব করা সহজ। কাগজের ভোট হিসাব করতে অনেক সময় লাগে, বৈদ্যুতিন ভোটের হিসাব কম্পিউটার অল্প সময়েই করে দেয়। কাগজের ভোটে ভোটাররা সব সময় সঠিকভাবে দাগ দিতে পারেন না, এর ফলে অনেক ভোট নষ্ট হয়। বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ে ভোট খুব কম নষ্ট হয়। বৈদ্যুতিন ভোটিং অনেক তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব। এর ফলে ভোটার উপস্থিতির হার বেড়ে যায়। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে বৈদ্যুতিন ভোট দেওয়ার জন্য ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বাড়িতে বসে থেকেই ভোট দেওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই বৈদ্যুতিন ভোট চালু হয়েছে। কিন্তু কোথাও এ ব্যবস্থা পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করেনি। বৈদ্যুতিন ভোটিং ব্যবস্থা নিয়ে নিম্নলিখিত দেশসমূহে সমস্যা দেখা দিয়েছে: বেলজিয়াম, ব্রাজিল, এস্টোনিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি।[৬]

বৈদ্যুতিন ভোটিং ব্যবস্থা নিয়ে অনেক সন্দেহ এবং সংশয়ও রয়েছে। সমালোচকেরা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলে থাকেন যে জটিল ব্যবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত ত্রুটি সমস্যাকে তীব্রতর করে তোলে। এ ধরনের দুর্ঘটনাজনিত ত্রুটি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়ে থাকে System failure, therefore, occurs not as a result of predicted vulnerablitities, but because errors occur and interact in unexpected ways. তবে শুধু দুর্ঘটনাজনিত ত্রুটিই ঘটে না, ভোট পরিচালনায় অনেক সময় প্রোগ্রামিংয়ে ত্রুটি ও জালিয়াতি দেখা দেয়। ২০০৪ সালে বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারীরা ভোটিং হিসাব ব্যবস্থাতে বেআইনিভাবে ঢুকে পড়ে এবং ফলাফলকে প্রভাবান্বিত করে। কাজেই বৈদ্যুতিন ভোটিং সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। তবে কাগজের ব্যালটে ভোট পুনর্গণনা সহজ, বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ে পুনর্গণনা করে কোনো লাভ হয় না। যেসব দেশে প্রার্থীরা জাল ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে জিততে চান, তাঁরা কাগজের ভোটের মতো বৈদ্যুতিন ভোট-ব্যবস্থাকেও ব্যবহার করতে পারেন। এ সমস্ত ঝুঁকি বিবেচনা করে ডোনাল্ড পি মইনিহান (Donald P. Moynihan) যথার্থই সুপারিশ করেছেন,

> The most critical and obvious policy implication of DREs is that they may undermine the electoral process, the basis for representative democracy. While all election technologies have risks of error or manipulation, the danger of DREs is that the manipulation could be catastrophic and would be extremely difficult to detect or prove.[৭]

বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ের আরেকটি অসুবিধা হলো যে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সর্বোত্তম প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। সরকারি খাতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে সময় লাগে। কাজেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যেখানে বৈদ্যুতিন ভোটিং হয়, সেখানে কয়েক বছর আগের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। অথচ বেসরকারি খাতে তখন এর চেয়েও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এর ফলে ভোট লুণ্ঠনকারীরা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটকে প্রভাবান্বিত করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ের তিনটি সুবিধা অনস্বীকার্য। প্রথমত, বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ে ফলাফল অনেক কম সময়ে গণনা করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ে ব্যালট প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের ভোট দেওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। বিশেষ করে ইন্টারনেটে ভোটিং ব্যবস্থা চালু করা হলে ভোটারদের ভোট দেওয়ার সময় অনেক কমে যেতে পারে। তবে এখনো বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে অনেক সন্দেহ রয়েছে। ২০০৪ সালে মার্কিন

সেনাবাহিনীতে তাই ইন্টারনেটে ভোটিং নিষিদ্ধ করা হয়। যেসব দেশে জালিয়াতির আশঙ্কা কম, সেসব দেশে বৈদ্যুতিন ভোটিং পর্যায়ক্রমে চালু করা যেতে পারে। নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে এই পদ্ধতিকে আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। কিন্তু যেসব দেশে ব্যাপক জালিয়াতি চালু রয়েছে, সেসব দেশে বৈদ্যুতিন ভোটিং প্রবর্তনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে ভোটের ক্ষেত্রে জালিয়াতির ব্যাপারে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলেরই কোনো অনীহা দেখা যায় না। তাই বাংলাদেশে বৈদ্যুতিন ভোটিং ব্যবস্থা সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে একটি বড় পদক্ষেপ না হয়ে একটি বড় সমস্যা হিসেবে দাঁড়াতে পারে।

## ১২.৫ উপসংহার

সুষ্ঠু, অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়; মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অত্যাবশ্যক। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে তাই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'The will of the people shall be the basis of the authority of government, this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.' শুধু বিধি অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ফল ঘোষণা করলেই তাকে সুষ্ঠু নির্বাচন বলা যাবে না। সুষ্ঠু নির্বাচন হলো সে নির্বাচন, যে নির্বাচনে হেরে যাওয়া দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহী থাকে (loosing parties and candidates with incentives to remain participants in the process)।[৮] বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যবশত এই সংজ্ঞা অনুসারে অনেক নির্বাচনই সুষ্ঠু হয়নি। যখন হেরে যাওয়া দলগুলোর নির্বাচন-ব্যবস্থার ওপর কোনো আস্থা থাকে না, তখন দেশে সংঘাতের রাজনীতি সৃষ্টি হয়। বিজয়ী দলগুলো মনে করে যে জালিয়াতি ছাড়া নির্বাচন করে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়, আর পরাজিত দলগুলো মনে করে যে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা নেই। এই অবস্থায় বিরোধী দলগুলো নির্বাচন-ব্যবস্থা থেকে সরে পড়ে এবং দেশে সংঘাত, সহিংসতা এবং অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের দুষ্টচক্র দেখা দেয়।

স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ১৮৮৫ সালে বাংলাদেশ অঞ্চলে নির্বাচন-প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮৮৫ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত মোট ১১টি বড় ধরনের গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়। (১৮৮৫, ১৯১৯, ১৯৩৫, ১৯৪৬, ১৯৫৪, ১৯৭০, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮)। এই কয়টি নির্বাচন ছাড়া দেশে

আর যেসব নির্বাচন হয়, সেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের জাল-জালিয়াতির অভিযোগ শোনা যায়।

গণতন্ত্রের ধারণাটি সহজ কিন্তু এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন। গণতন্ত্র এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যার প্রতি দেশের বেশির ভাগ লোকের সমর্থন আছে। কিন্তু এই বেশির ভাগ লোকের সমর্থন বিষয়টি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের সাফল্য নির্ভর করে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনগণের জ্ঞানের ওপর। যেখানে জনগণ সমস্যাটি বুঝতে পারে, সেখানে অবশ্যই জনগণের সিদ্ধান্ত সবচেয়ে ভালো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের কাছে প্রকৃত সমস্যা তুলে ধরে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বিকৃত হতে পারে।

নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন পরিচালনা করেন। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী ভোট জালিয়াতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাঁদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ভোটারদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে এবং জাল-জালিয়াতিকে উৎসাহিত করতে পারে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। কাজেই দেশে একটি নিরপেক্ষ সরকার না থাকলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে। উপরন্তু বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসমূহের বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে গ্রাম পুলিশ বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী অনেক ক্ষেত্রে দলীয়করণে দুষ্ট। সেনাবাহিনীতে দলীয়করণের মাত্রা কম। নির্বাচনের সময় তাই সেনাবাহিনীর যথাযথ ব্যবহার নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুতর করতে পারে। নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনীকে কী ভূমিকা পালন করতে দেওয়া হবে, সেটা অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে নিরপেক্ষ না হলে নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে। বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কোনো রাজনৈতিক মতৈক্য নেই। যদি নির্বাচিত নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলে এ সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। (এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা স্মরণ করা যেতে পারে) যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হয়, তাহলে নির্বাচনকালে সর্বদলীয় সরকার গঠন করা যেতে পারে। সেই সর্বদলীয় সরকারে এমন কোনো প্রার্থী মন্ত্রী

হবেন না, যিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান বা সাধারণ সম্পাদক। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাসমূহ মন্ত্রিপরিষদের কাছে ন্যস্ত করা যেতে পারে এবং কার্যবিধিমালা সংশোধন করে বিধান করা যেতে পারে যে নির্বাচনকালে সব সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে। যদি ঐকমত্য সম্ভব না হয় এবং নির্বাচনের আগে এ সম্পর্কে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছে সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হবে। বিষয়টি নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের মতামত নেবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ ও নির্বাচন কমিশনের মন্তব্য বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

পৃথিবীর অনেক দেশে নির্বাচনকালীন সরকারের অশুভ প্রভাবকে নির্বাচন কমিশন প্রতিহত করে থাকে। ভারতে নির্বাচন কমিশন অনেক ক্ষেত্রে সরকারের চাপের কাছে নতিস্বীকার করেনি এবং প্রয়োজন বোধে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। যদি দেশে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন থাকে এবং বিচারব্যবস্থা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে, তবে নির্বাচনকালীন সরকারের অশুভ কর্মকাণ্ডের প্রভাব হ্রাস করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের আগে তাঁদের মনোনয়ন সংসদীয় কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করার বিধান করা যেতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এসব ব্যক্তি সম্পর্কে প্রকাশ্য শুনানি হবে এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের সম্ভাবনা কমে যাবে। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনে স্বচ্ছতা এবং নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিতে পারে। উপরন্তু নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণা করার আগে প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং প্রয়োজন হলে যেসব কেন্দ্রে জালিয়াতি হয়েছে বলে সন্দেহ হয়, সেসব কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণার আগে পুনরায় নির্বাচনের সুবিধা দিতে পারে। উপরন্তু নির্বাচনী পর্যবেক্ষকেরাও নির্বাচনের সুষ্ঠুতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন। নির্বাচন কমিশনকে বিদেশি নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। অবশ্যই নির্বাচনী প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সহজ কাজ নয়। কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে।

## পাদটীকা


১. শেখ মুজিবুর রহমান। ২০১৪। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২৫৬-৫৭।

২. UNDP. 2000. *Human Development Report 2000*. New York: Oxford University Press. 65

৩. National Assembly of Pakistan. 2012. *Constitution of the Islamic Republic of Pakistan*. Islamabad.

৪. Ministry of Law, The People's Republic of Bangladesh. The Representation of People Order. 1972.

৫. Gene Bussy. 2000. *Campaign Finance Goes Global*. Foreign Policy. No 115, 74-84.

৬. Wikipedia. 2016. Electronic Voting wikipedia. Org/wiki/Electronic Voting.

৭. Donald P. Moynihan. 2004. 'Building Secure Elections, E-Voting, Security and Systems Theory', *Public Administration Review* Vol. 64. No. 515-528

৮. G. Shabbir Cheema. *Building Democratic Institutions* Bloomfield, Ct: Kumarian Press.

## পঞ্চম খণ্ড

# রাজনৈতিক সংস্কৃতি : কান্ডারি হুঁশিয়ার

No man is an island, entire of itself, every man
Is a piece of the continent, a part of the main.

—John Donne

Cowardice asks the question: Is it safe?
Vanity asks the question: Is it popular?
Expediency asks the question: Is it political?
But Conscience asks the question: Is it right?

—Anonymous

কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারি, দিতে হতে পারি, নিতে হতে তরী পার।

—কাজী নজরুল ইসলাম

১৩

# রাজনৈতিক দল : কান্ডারি হুঁশিয়ার

## ১৩.১ উপক্রমণিকা

একজন চিকিৎসক, একজন প্রকৌশলী ও একজন রাজনীতিবিদের মধ্যে বিতর্ক চলছে কার পেশা সবচেয়ে পুরোনো। চিকিৎসক বললেন, বাইবেলে আছে যে সৃষ্টির পঞ্চম দিনে ভগবান হজরত আদম (আ.)-এর একটি বুকের হাড় বের করে নেন এবং সেই হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে পয়দা করেন। হজরত আদম (আ.)-এর ওপর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। সুতরাং চিকিৎসা পেশার জন্ম বিবি হাওয়া সৃষ্টির আগে। প্রকৌশলী বললেন, আপনি তো সৃষ্টির পঞ্চম দিনের কথা বলছেন, কিন্তু আদিতে কী ছিল? বাইবেলে বলা আছে যে ভগবান বিশৃঙ্খলা থেকে স্বর্গ এবং মর্ত্যের সৃষ্টি করেন। স্বর্গ ও মর্ত্য আকাশ থেকে পড়েনি, এগুলো সৃষ্টির জন্য অবশ্যই প্রকৌশলীদের দরকার পড়েছিল। কাজেই প্রকৌশল পেশা চিকিৎসা পেশার চেয়েও পুরোনো। এবার রাজনীতিবিদ মুখ খুললেন। তিনি বললেন, প্রকৌশলীর বক্তব্য আংশিকভাবে সত্য, তবে পুরোপুরি সত্য নয়। আংশিকভাবে সত্য এ জন্য যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টিতে অবশ্যই প্রকৌশলীর প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু আদিতে কী ছিল? আদিতে ছিল বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলা কে সৃষ্টি করতে পারে? একমাত্র রাজনীতিবিদদের পক্ষেই এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সম্ভব। সুতরাং সবচেয়ে বনেদি পেশা হলো রাজনীতি।

বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে সাধারণ লোকের বিশ্বাস, রাজনীতিবিদেরা সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। আসলে রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির পক্ষে তার দাবিদাওয়া নিশ্চিত করার কোনো উপায় নেই। তাই দাবিদাওয়া অর্জন করতে হলে সমমনা ব্যক্তিদের জোট বাঁধতে হয়। এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভারের (MacIver) রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, রাজনৈতিক দল হচ্ছে, 'an association

organized in support of some principles or policy which by constitutional means it endeavors to make the determinant of government'। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বা আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হলে সমমনা লোকদের রাজনৈতিক দলে সম্মিলিত হতে হয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। যেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালু ছিল, সেখানে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব তত ছিল না। কিন্তু প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে বিভিন্ন প্রশ্নে ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেন না, সিদ্ধান্ত নেন গণপ্রতিনিধিরা। গণপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য তাই সমমনা ভোটারদের একটি রাজনৈতিক দলে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের পাঁচটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে।

১. **রাজনৈতিক দল ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র সম্ভব নয় :** সংসদে গণপ্রতিনিধিরা থাকেন। এই প্রতিনিধিরা দল ভিত্তিতে সংগঠিত হন। ভোটাররা দলের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তারাই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়, আর যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয় তারা বিরোধী দল হিসেবে সরকারকে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

২. **রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিনির্ধারণ করে :** প্রতিটি রাজনৈতিক দল একটি রাজনৈতিক মেনিফেস্টোর মাধ্যমে সংগঠিত হয়। এই মেনিফেস্টোর ভিত্তিতেই জনগণ রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়। কাজেই রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হলো তাদের রাজনৈতিক মেনিফেস্টো বা ঘোষণার আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করা।

৩. **রাজনৈতিক দল জনমত সৃষ্টি করে :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য তাদের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। যে দেশের ভোটাররা রাজনৈতিক দিক থেকে যত শিক্ষিত, তাদের চেতনা রাজনৈতিক দিক থেকে তত সমৃদ্ধ। রাজনৈতিক দলগুলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে জনগণকে শিক্ষা দেয়। জনগণকে তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সতর্ক করে। রাজনৈতিক দল ছাড়া ভোটারদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।

৪. **রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে :** প্রতিটি দেশেই স্থানীয় পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে এবং ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এসব পরস্পরবিরোধী শক্তিকে একটি সাধারণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা সৃষ্টি করতে হয়। এ কাজটি করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান বা লেনদেনের দরকার হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নেপথ্যে এ কাজটি করে। এর ফলে স্থিতিশীলতার পক্ষের শক্তিগুলো শক্তিশালী হয়। অন্যথায় অস্থিতিশীল শক্তিসমূহ জোরদার হয়ে উঠতে পারে।

৫. **রাজনৈতিক দলগুলো নেতা নির্বাচনে সহায়ক হয়:** গণতান্ত্রিক দেশে নেতাদের জনসমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের আগে তাঁরা জনগণের কাছে পরিচিত হতে পারেন না। রাজনৈতিক দলের ভেতর সমমনা ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করে তাঁরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কাজেই রাজনৈতিক নেতারাই পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করেন।

তবে রাজনীতির যে রকম সৃষ্টিশীল ভূমিকা রয়েছে, তেমনি তার ধ্বংসাত্মক দিকও রয়েছে। রাজনৈতিক দল কোন্দলের সৃষ্টি করে। এই কোন্দলের হোতা হলো দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহ। এর সঙ্গে সঙ্গে দলের ভেতরে গড়ে ওঠে মক্কেলতন্ত্র (Clientism)। মক্কেলতন্ত্রের লক্ষ্য হলো, দলের উচ্চ পর্যায়ের পৃষ্ঠপোষকেরা নিম্ন পর্যায়ের মক্কেলদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে আর নিম্ন পর্যায়ের মক্কেলরা উচ্চ পর্যায়ের পৃষ্ঠপোষকদের ভোটের জোগান দেবে। মক্কেলতন্ত্রের ফলে রাজনীতিতে অপরাধপ্রবণতা ঢুকে পড়ে। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে দাবিয়ে রাখার জন্য মক্কেলরা অনেক ক্ষেত্রেই হিংসাত্মক ও অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থের জোগান দুর্নীতি ও জোরজবরদস্তির মাধ্যমে দেওয়া হয়। সমাজে তাই অপরাধমূলক কার্যকলাপ বেড়ে যায়। একদিকে রাজনীতি জনসাধারণের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, অন্যদিকে অনেক দেশে রাজনীতির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সমাজকে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। এই প্রবন্ধটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে উপক্রমণিকা। দ্বিতীয় খণ্ডে রাজনৈতিক দল-সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে রাজনৈতিক দলগুলোর অর্জন ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের জন্য সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

## ১৩.২ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের আইনসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫২ অনুচ্ছেদে রাজনৈতিক দলের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

> 'রাজনৈতিক দল' বলিতে এমন একটি অধিসঙ্গ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যে অধিসঙ্গ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোন নামে কার্য করেন এবং কোন রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোন রাজনৈতিক

তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসঙ্গ হইতে পৃথক কোন অধিসঙ্গ হিসাবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন।

অধিসঙ্গ বলতে জনগোত্র বা Group বোঝায়, এই সংজ্ঞা অনুসারে রাজনৈতিক দলের দুটি অবশ্যপালনীয় শর্ত রয়েছে। প্রথমত, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই একটি স্বতন্ত্র নাম থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকতে হবে। তবে রাজনৈতিক দল যেমন সংসদে থাকতে পারে তেমনি সংসদের বাইরেও কাজ করতে পারে। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে জনশৃঙ্খলার ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সমিতি বা সংঘ গঠন করার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। এই বিধান অনুসারে জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আরোপিত আইনে নিষেধাজ্ঞা ছাড়া রাজনৈতিক দলের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ করার কোনো উপায় নেই। তবে ৩৮ অনুচ্ছেদে একটি শর্ত যোগ করা হয়েছে। এই শর্ত হলো এই যে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।'

বাংলাদেশে দুই ধরনের রাজনৈতিক দল রয়েছে। এক ধরনের রাজনৈতিক দল গণপ্রতিনিধি আইন ১৯৭২-এর অধীনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত। আবার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত নয়, এরূপ রাজনৈতিক দলও রয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনের শর্তসমূহ প্রযোজ্য নয়। তবে তাদেরকেও জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধ মানতে হবে। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িক সমিতি বা এ ধরনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক কোনো সমিতি গঠন করার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত নয়।

গণপ্রতিনিধি আইন ১৯৭২-এ (The Representation of People Order 1972) রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্তসমূহ ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক অধ্যাদেশের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ কিছু পরিবর্তনসহ নিবন্ধনের শর্তসমূহ অনুমোদন করে। বর্তমানে প্রচলিত আইনে কোনো দলকে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য নিম্নরূপ শর্তের যেকোনো একটি পূরণ করতে হয়।

- বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতীয় সংসদের যেসব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার যেকোনো একটিতে কমপক্ষে একটি আসন লাভ করে থাকলে সে দলকে নিবন্ধন দেওয়া হবে।

- যদি কোনো দল কোনো আসন না-ও পেয়ে থাকে, তবে যেসব কেন্দ্রে সে দলের প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, সেসব নির্বাচনী এলাকায় কমপক্ষে ৫ শতাংশ ভোট পেয়ে থাকলে দলটি নিবন্ধের জন্য বিবেচিত হবে।
- যদি ওপরের দুটি শর্তের একটি শর্তও কোনো দল পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে দলের একটি কার্যকর কেন্দ্রীয় অফিস থাকতে হবে এবং কমপক্ষে দেশের এক-তৃতীয়াংশ জেলায় শাখা অফিস থাকতে হবে এবং কমপক্ষে ১০০টি উপজেলাতে ২০০ ভোটার সদস্যসহ দলীয় সংগঠন থাকতে হবে।

উপরিউক্ত শর্তসমূহ পূরণ করলেও নিম্নলিখিত কারণে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিবন্ধন দেওয়া যাবে না :

- যদি দলের সংবিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচিত হয়, তবে সে দলকে নিবন্ধিত করা যাবে না।
- যদি দলের সংবিধানে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা ও লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক কোনো বিধান থাকে, তাহলে সে দলকেও নিবন্ধন করা যাবে না।
- যদি কোনো দলের নামে, পতাকায় বা কোনো প্রতীকে বা কোনো কার্যকলাপে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা দেশের কোনো অংশের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে সে দলকে নিবন্ধন দেওয়া যাবে না।
- যদি কোনো দলের সংবিধানে একদলীয় রাষ্ট্র অথবা দলবিহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থাকে, তাহলে সে দলকেও নিবন্ধন দেওয়া যাবে না।
- যদি দলের সংবিধানে বাংলাদেশের বাইরে ওই দলের অফিস শাখা অথবা কমিটি প্রতিষ্ঠার বিধান থাকে, তাহলে সে দলকেও নিবন্ধন দেওয়া যাবে না।

এ ছাড়া দলের ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নিবন্ধিত দলসমূহের ওপর নিম্নরূপ শর্ত আরোপ করা হয়েছে :

- দলের সব পর্যায়ের কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সব সদস্যকে নির্বাচিত হতে হবে।
- ২০২০ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সব কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ মহিলা নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের নিয়ে কোনো সংগঠন করা যাবে না।

গণপ্রতিনিধি আইন অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত দলসমূহের তালিকা সারণি-১৩.১-এ দেখা যাবে।

## সারণি-১৩.১
## বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দলের তালিকা

| ক্রমিক নং | দলের নাম |
|---|---|
| ১. | লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) |
| ২. | জাতীয় পার্টি (জেপি) |
| ৩. | বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এনএল) |
| ৪. | কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ |
| ৫. | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| ৬. | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
| ৭. | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) |
| ৮. | গণতন্ত্রী পার্টি |
| ৯. | বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ |
| ১০. | বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টি |
| ১১. | বিকল্পধারা বাংলাদেশ |
| ১২. | জাতীয় পার্টি |
| ১৩. | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) |
| ১৪. | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| ১৫. | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) |
| ১৬. | জাকের পার্টি |
| ১৭. | বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) |
| ১৮. | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) |
| ১৯. | বাংলাদেশ হকিকত ফেডারেশন |
| ২০. | বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন |
| ২১. | বাংলাদেশ মুসলিম লীগ |
| ২২. | ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) |
| ২৩. | জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ |
| ২৪. | গণফোরাম |
| ২৫. | গণফ্রন্ট |
| ২৬. | প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিজিডি) |
| ২৭. | বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) |
| ২৮. | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি |
| ২৯. | ঐক্যবদ্ধ প্রগতি আন্দোলন |
| ৩০. | ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ |
| ৩১. | বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি |
| ৩২. | ইসলামী ঐক্যজোট |

| | |
|---|---|
| ৩৩. | বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস |
| ৩৪. | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| ৩৫. | বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট |
| ৩৬. | জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) |
| ৩৭. | বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি |
| ৩৮. | খেলাফত মজলিস |
| ৩৯. | বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বিএমএল) |
| ৪০. | বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট) |
| ৪১. | বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফ্রন্ট (বিএনএফ) |

ৎস : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট

বাংলাদেশে ৪১টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত রয়েছে। অথচ সারণি-১৩. াকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে কখনো সংসদে ১২টির বেশি দল থেকে তিনিধি নির্বাচিত হয়নি।

## সারণি-১৩.২
## বাংলাদেশে সংসদে বিভিন্ন দলের আসন লাভ

| সংসদ | নির্বাচিত দলের সংখ্যা | সংসদে নির্বাচিত দলের নাম | দলীয় সদস্য কর্তৃক বিজিত আসনের হার | নির্দলীয় সদস্যদের বিজিত আসনের হার |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম সংসদ ১৯৭৩ | ৪ | আওয়ামী লীগ<br>ন্যাপ (মোজাফফর)<br>জেএসডি<br>বাংলাদেশ জাতীয় লীগ | ৯৭ | ৩ |
| দ্বিতীয় সংসদ ১৯৭৯ | ১১ | আওয়ামী লীগ<br>আওয়ামী লীগ (মিজান)<br>বিএনপি<br>বাংলাদেশ মুসলিম লীগ<br>ইসলামিক গণতান্ত্রিক দল<br>জেএসডি<br>ন্যাপ (মোজাফ্ফর)<br>বাংলাদেশ গণফ্রন্ট<br>বাংলাদেশ সমাজবাদী দল<br>বাংলাদেশ জাতীয় লীগ<br>জাতীয় একতা পার্টি<br>বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন | ৯৪.৫ | ৫.৫ |

| | | |
|---|---|---|
| সংসদ<br>১৯৮৬ | | জাতীয় পার্টি<br>জামায়াতে ইসলামী<br>জেএসডি (রব)<br>বাংলাদেশ মুসলিম লীগ<br>ন্যাপ<br>সিপিবি<br>জেএসসি (সিরাজ)<br>ন্যাপ (মোজাফ্ফর)<br>বাকশাল<br>বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি |
| চতুর্থ<br>সংসদ<br>১৯৮৮ | ৪ | জাতীয় পার্টি<br>সম্মিলিত বিরোধী দল (COP)<br>বাংলাদেশ ফ্রিডম পার্টি<br>জেএসডি (সিরাজ) |
| পঞ্চম<br>সংসদ<br>১৯৯১ | ১২ | আওয়ামী লীগ<br>বিএনপি<br>জাতীয় পার্টি<br>জামায়াতে ইসলামী<br>বাকশাল<br>সিপিবি<br>ন্যাপ (মোজাফ্ফর)<br>বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি<br>জেএসডি (সিরাজ)<br>গণতন্ত্রী পার্টি<br>ইস্‌লামী ঐক্যজোট<br>জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি |
| ৬ষ্ঠ<br>সংসদ<br>১৯৯৬ | সব আসনে<br>নির্বাচন সম্ভব<br>হয়নি | |
| ৭ম<br>সংসদ<br>১৯৯৬ | ৬ | আওয়ামী লীগ<br>বিএনপি<br>জাতীয় পার্টি<br>জামায়াতে ইসলামী<br>ইসলামী ঐক্যজোট<br>জেএসডি (রব) |
| ৮ম<br>সংসদ<br>২০০১ | ৯ | বিএনপি<br>আওয়ামী লীগ<br>জাতীয় পার্টি (এরশাদ)<br>জামায়াতে ইসলামী<br>বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (নাজিউর)<br>ইসলামী ঐক্যজোট<br>কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ<br>জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৯ম সংসদ ২০০৮ | ৮ | আওয়ামী লীগ<br>বিএনপি<br>জাতীয় পার্টি<br>জেএসডি<br>জামায়াতে ইসলামী<br>বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি<br>এলডিপি<br>বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি | ৯৮.৬৬ | ১.৩৪ |
| ১০ম সংসদ ২০১৪ | ৭ | আওয়ামী লীগ<br>জাতীয় পার্টি<br>জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)<br>বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি<br>জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল<br>বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন<br>বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট | ৯৪.৭ | ৫.৩ |

উৎস : রওনক জাহান, ২০১৫, *Political Parties in Bangladesh*. Dhaka, Prothoma

সারণি-১৩.১ ও সারণি-১৩.২-এর তুলনা করলে বাংলাদেশে রাজনীতির কয়েকটি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, বর্তমানে ৪১টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নিবন্ধিত হলেও এদের সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না। দ্বিতীয়ত, যারা নির্বাচনে অংশ নেয়, তাদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্রসংখ্যক দলই আসন লাভে সমর্থ হয়। বাংলাদেশের সংসদে বিভিন্ন দলের আসনবণ্টন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সংসদে সর্বনিম্ন ৪টি এবং সর্বোচ্চ ১২টি দল প্রতিনিধি প্রেরণে সাফল্য অর্জন করে। সুতরাং নিবন্ধনকৃত ৪১টি দলের মাত্র ৩০ শতাংশ দল সংসদে আসন লাভ করে।

নিবন্ধনকৃত দলগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, ডানপন্থী; দ্বিতীয়ত, মূলধারার রাজনৈতিক দল এবং তৃতীয়ত, বামপন্থী দলসমূহ। বাংলাদেশে ৭টি দলকে নামের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রপন্থী দল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে ১১টি দলের নামের মধ্যে ইসলাম বা মুসলিম শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এই দলগুলোকে ডানপন্থী দল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সর্বাধিক ২৩টি দলকে মূলধারার রাজনৈতিক দল বলা যেতে পারে।

সাধারণত ডানপন্থী ও বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে যারা উগ্র মতবাদে বিশ্বাস করে, তাদের চরমপন্থী দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বেশির ভাগ চরমপন্থী দলই নিবন্ধনে আগ্রহী হয় না; কারণ, তারা বিশ্বাস করে যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের

মাধ্যমে সমাজ পুনর্গঠন করতে চায়। এ ধরনের রাজনৈতিক দল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্বাচন কমিশন থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না।

পৃথিবীর অনেক দেশেই এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে অতীতে চরমপন্থীদের মধ্যে বামপন্থীরাই ছিল প্রধান। কিন্তু আশির দশকের শেষ দিকে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার ফলে চরমপন্থায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন অনেক ক্ষেত্রেই উবে গেছে। যদিও নেপাল ও ভারতের কোনো কোনো রাজ্যে এখনো বাম চরমপন্থীরা সক্রিয়, তবু সারা পৃথিবীতে চরম বামপন্থীদের সমর্থন কমে গেছে। বাংলাদেশে কিছু কিছু দুর্বৃত্তের দল সর্বহারা বা সমাজতন্ত্রের নাম নিয়ে বেআইনিভাবে সংগঠন গড়ে তোলে। তবে দেশের মানুষের ওপর তাদের কোনো প্রভাব নেই এবং আইনের দৃষ্টিতে তারা বেশির ভাগই দুর্বৃত্ত।

সম্প্রতি ডানপন্থীদের মধ্যে চরমপন্থায় আগ্রহ বেড়েছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে ইসলামি মৌলবাদীরা চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কতিপয় সদস্য জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ নামে একটি বেআইনি সংগঠন গড়ে তোলে এবং সেই সঙ্গে জনসমর্থন আদায় করার জন্য জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ নামে একটি সহযোগী সংগঠন স্থাপন করে। ২০০৫ সালে দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় ৭ মিনিটের ব্যবধানে এই সংগঠন বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। সংগঠনটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ও তার নেতাদের বিচারে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সংগঠনটি আবার নতুন নামে ও নতুন নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করে। একটি হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে ২৯ থেকে ৩৩টি চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী দল রয়েছে, যারা দেশে ইসলামি বিপ্লব করতে চায়। এর মধ্যে হরকাতুল জিহাদ-উল-ইসলাম বাংলাদেশ, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ, জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ ও শাহাদাতে আল হিকমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরবর্তীকালে হিযবুত তাহ্‌রীর নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বাংলাদেশে প্রায় ১০০টি ইসলামপন্থী দল রয়েছে, যারা চরমপন্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করছে। এই দলগুলোকে আইনের দিক থেকে রাজনৈতিক দল বলা যায় না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই তারা রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পালন করছে। এই দলগুলোর দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, বাংলাদেশে বেশির ভাগ রাজনীতিবিদই বৈষয়িক স্বার্থে রাজনীতিতে অংশ নেন। আদর্শবাদী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত, অথচ এই ইসলাম-সমর্থক চরমপন্থী দলগুলো আদর্শবাদী সংগঠন। সে জন্য তাদের অপরাধমূলক

কার্যকলাপকে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ বিনা বাধায় সহ্য করে। এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে তারা পরোক্ষভাবে গণসমর্থন আদায় করে।

দ্বিতীয়ত, আর্থিক দিক থেকে এ সংগঠনগুলো অত্যন্ত সবল। এদের অনেকেই বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাছ থেকে সাহায্য হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যসহ অনেক দেশ থেকে টাকা পেয়ে থাকে। এই অর্থ সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে যেসব সংগঠন এসব বৈদেশিক সাহায্য লাভ করেছে, তারা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে ইতিমধ্যে দেশে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে জামায়াতে ইসলামী দলটি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভেতরে তাদের নিজস্ব অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। এরা ব্যাংক চালায়, বিশ্ববিদ্যালয় চালায়, বিমা কোম্পানি চালায়, গণমাধ্যম পরিচালনা করে, স্বাস্থ্যসেবা বিপণন করে এবং বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা খাতে বিনিয়োগ করে প্রচুর অর্থ অর্জন করেছে। কুয়েতভিত্তিক Revival of Islamic Society, সৌদি আরবভিত্তিক Haramin Islamic Foundation, Hayatul Igacha প্রভৃতি বিদেশি সংস্থাও এ দেশে মসজিদ উন্নয়নের নামে প্রচুর অর্থ দিয়েছে। জানা যায়, তারও একটি অংশ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যয়িত হচ্ছে। এ ছাড়া সন্ত্রাসবাদী সংগঠনসমূহ দেশের ভেতর থেকেও অর্থ সংগ্রহ করে। মধ্যপ্রাচ্যে যখন তেলের দাম বাড়ে, তখন চরমপন্থী ইসলামি সংগঠনগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের অনুদান বেড়ে যায়। ২০০৬ সালে একজন পর্যবেক্ষক লিখেছেন :

> The Rising price of oil has translated in to greater resources for Islamists which have usually been channeled to Bangladesh through Islamic Development Organizations and Banks like Al-Arafa Islami Bank and Al-Hamman Islamic Foundations. Currently many Bangladeshi Islamists run financial Institutions, such as, Hospitals and Industries backed by funding from abroad.[১]

২০১৩ সালে আরেকজন পর্যবেক্ষক অভিমত প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশে ইসলামিক সংগঠনগুলো বছরে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা) মুনাফা করে। এই মুনাফার কমপক্ষে ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ২৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২০০ কোটি টাকা) চরমপন্থীদের দেওয়া হয়। এই গবেষকের হিসাবে প্রায় ৫ লাখ পূর্ণকালীন কর্মীর বেতন এই অর্থ থেকে দেওয়া সম্ভব।[২] যদি এই হিসাব সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলে প্রতি পূর্ণকালীন কর্মীর জন্য বছরে মাত্র চার হাজার টাকা খরচ হয়। এই অঙ্ক খুবই কম, যদি ২৫ মিলিয়ন ডলার এই কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তাতে সর্বাধিক লাখ দুয়েক কর্মীর অর্থের সংস্থান হতে পারে। বাংলাদেশে ইসলামি চরমপন্থীদের আয়ের হিসাব কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশে চরমপন্থী সংগঠনগুলোর অর্থায়নের ক্ষেত্রে কোনো বড় সমস্যা নেই।

## ১৩.৩ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর অর্জন ও ব্যর্থতা

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর একটি বড় অর্জন হলো, এই দলগুলো দেশের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। এই সাফল্যের একটি উদাহরণ হলো বাংলাদেশে ভোটারদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের হার।

**সারণি-১৩.৩**

**বাংলাদেশে ভোটার উপস্থিতির হার**

| বছর | ভোটার উপস্থিতির হার | মোট ভোট | নিবন্ধনকৃত ভোটার |
|---|---|---|---|
| ২০০৮ | ৮৫.২৬% | ৬৯,১৭২,৬৪৯ | ৮১,১৩০,৯৭৩ |
| ২০০১ | ৭৪.৯৭% | ৫৬,১৮৫,৭০৭ | ৭৪,৯৪৬,৩৬৪ |
| ১৯৯৬ | ৭৫.৬০% | ৪২,৮৮০,৫৬৪ | ৫৬,৭১৬,৯৩৫ |
| ১৯৯১ | ৫৫.৪৫% | ৩৪,৪৭৭,৮০৩ | ৬২,১৮১,৭৪৩ |
| ১৯৮৮ | ৫১.৮১% | ২৫,৮৩২,৮৫৮ | ৪৯,৮৬৩,৮২৯ |
| ১৯৮৬ | ৬০.৩১% | ২৮,৮৭৩,৫৪০ | ৪৭,৮৭৬,৯৭৯ |
| ১৯৭৯ | ৫১.২৯% | ১৯,৬৭৬,১২৪ | ৩৮,৩৬৩,৮৫৮ |
| ১৯৭৩ | ৫৪.৯১% | ১৯,৩২৯,৬৮৩ | ৩৫,২০৫,৬৪২ |

উৎস : রওনক জাহান, ২০১৫, *Political Parties in Bangladesh*. Dhaka, Prothoma

সারণি-১৩.৩ সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন ওঠে। প্রথমত, ১৯৭৩ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভোটের পরিমাণ ছিল ৭৫.৬ শতাংশ। ২০০৮ সালে এই হার ৮৫.২৬ শতাংশে উন্নীত হয়। এই বৃদ্ধি কতটুকু সঠিক, সেটি পরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। যদি এই সংখ্যা সঠিক হয়, তবে বাংলাদেশে ভোটারদের অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ভোটারদের অংশগ্রহণের অবস্থা কী? এ সম্পর্কে তথ্য সারণি-১৩.৪-এ দেখা যাবে।

সারণি-১৩.৪-এ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর সাফল্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। সারণি-১৩.৪ অনুসারে ১৬৯টি দেশের মধ্যে ভোটার উপস্থিতির হারের দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান ১৪৩তম। এর অর্থ হলো বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর নিম্নতম ভোটার উপস্থিতির ২০ শতাংশের মধ্যে। সারণি-১৩.৪-এ বাংলাদেশে ৬টি নির্বাচনের ভিত্তিতে ভোটার উপস্থিতির হার হিসাব করা হয়েছে। এই হিসাবে যদি ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ

## সারণি-১৩.৪
## নিবন্ধনকৃত ভোটারদের সংসদ নির্বাচনে ভোটদানের শতকরা হার, ১৯৪৫-২০০১

| দেশের নাম | নির্বাচনের সংখ্যা | নিবন্ধনকৃত ভোটারদের ভোটদানের শতকরা হার |
|---|---|---|
| (ক) ৯০ থেকে ৮৫% ভোট | | |
| অস্ট্রেলিয়া | ২২ | ৯৪.৫ |
| সিঙ্গাপুর | ৮ | ৯৩.৫ |
| উজবেকিস্তান | ৩ | ৯৩.৫ |
| লিচটেনসটেইন | ১৭ | ৯২.৮ |
| বেলজিয়াম | ১৮ | ৯২.৫ |
| নউরো | ৫ | ৯২.৪ |
| বাহমাস | ৬ | ৯১.৯ |
| ইন্দোনেশিয়া | ৭ | ৯১.৫ |
| বুরুন্ডি | ১ | ৯১.৪ |
| অস্ট্রিয়া | ১৭ | ৯১.৩ |
| অ্যাঙ্গোলা | ১ | ৯১.২ |
| মঙ্গোলিয়া | ৪ | ৯১.১ |
| নিউজিল্যান্ড | ১৯ | ৯০.৮ |
| কম্বোডিয়া | ২ | ৯০.৩ |
| খ) ৮৫ থেকে ৮৯.৯৯ | | |
| ইতালি | ১৫ | ৮৯.৮ |
| লুক্সেমবার্গ | ১২ | ৮৯.৭ |
| সাইপ্রাস | ৭ | ৮৯.৭ |
| আইসল্যান্ড | ১৭ | ৮৯.৫ |
| সাউথ আফ্রিকা | ১ | ৮৯.৩ |
| কোক আইল্যান্ড | ১ | ৮৯.০ |
| তাজিকিস্তান | ২ | ৮৮.৭ |
| গায়ানা | ৭ | ৮৮.৫ |
| থাইল্যান্ড | ১৫ | ৮৮.৩ |
| মাল্টা | ১৪ | ৮৮.২ |
| আলবেনিয়া | ৪ | ৮৮.০ |

| | | |
|---|---|---|
| এলায়ি | ২ | ৮৬.২ |
| পূর্ব তিমুর | ১ | ৮৬.০ |
| ডেনমার্ক | ২২ | ৮৫.৯ |
| জার্মানি | ১৪ | ৮৫.৪ |
| স্লোভাকিয়া | ৪ | ৮৫.২ |
| মরিসাস | ৬ | ৮৪.৪ |
| আর্জেন্টিনা | ১৮ | ৮৪.২ |
| চেক রিপাবলিক | ৪ | ৮২.৮ |
| পশ্চিম সামুয়া | ৩ | ৮২.৩ |
| বলিভিয়া | ১১ | ৮২.২ |
| তাভালু | ২ | ৮১.৯ |
| পালাউ | ৬ | ৮১.৭ |
| বুলগেরিয়া | ৪ | ৮১.৪ |
| আন্দোরা | ৩ | ৮১.৪ |
| তুর্কি | ১০ | ৮১.৩ |
| ফিজি | ৩ | ৮১.০ |
| ফিলিপাইন | ৭ | ৮০.৯ |
| বেলিজ | ৫ | ৮০.৪ |
| নরওয়ে | ১৫ | ৮০.৪ |
| পেরু | ৯ | ৮০.৩ |
| ইসরায়েল | ১৫ | ৮০.৩ |
| ভেনেজুয়েলা | ১৫ | ৮০.০ |
| উরুগুয়ে | ১১ | ৮০.০ |
| **গ) ৭৫ থেকে ৭৯.৯৯** | | |
| গ্রিস | ১৬ | ৭৯.৯ |
| কুয়েত | ৫ | ৭৯.৬ |
| চিলি | ১১ | ৭৮.৯ |
| লাটভিয়া | ৪ | ৭৮.৭ |
| নামিবিয়া | ৩ | ৭৮.৬ |

| | | |
|---|---|---|
| প্যারাগুয়ে | ৯ | ৭৮.৩ |
| মোজাম্বিক | ২ | ৭৮.০ |
| কিরিবাতি | ৪ | ৭৭.৯ |
| ব্রাজিল | ১৪ | ৭৭.৮ |
| কোস্টারিকা | ১২ | ৭৭.৭ |
| ইরান | ১ | ৭৭.৩ |
| আজারবাইজান | ২ | ৭৭.০ |
| পর্তুগাল | ১০ | ৭৭.০ |
| স্লোভেনিয়া | ৩ | ৭৬.৬ |
| কাজাকিস্তান | ১ | ৭৬.২ |
| ফিনল্যান্ড | ১৬ | ৭৬.০ |
| নিকারাগুয়া | ৬ | ৭৫.৯ |
| পানামা | ৪ | ৭৫.৫ |
| আর্মেনিয়া | ২ | ৭৫.৪ |
| ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ | ১ | ৭৫.৪ |
| যুক্তরাজ্য | ১৬ | ৭৫.২ |
| **ঘ) ৭০ থেকে ৭৪.৯৯** | | |
| তানজানিয়া | ২ | ৭৪.৬ |
| ডমিনিকা | ১২ | ৭৪.৪ |
| শ্রীলঙ্কা | ১১ | ৭৪.৩ |
| সেন্ট কিটস ও নেভিস | ১১ | ৭৪.২ |
| সুরিনাম | ৬ | ৭৪.২ |
| ক্যামেরুন | ৪ | ৭৪.০ |
| কানাডা | ১৮ | ৭৩.৯ |
| ফ্রান্স | ১৫ | ৭৩.৮ |
| স্পেন | ৮ | ৭৩.৬ |
| গাম্বিয়া | ৫ | ৭৩.৪ |
| আইল্যান্ড | ১৬ | ৭৩.৩ |
| ইউক্রেন | ২ | ৭৩.২ |
| রিপাবলিক অব কোরিয়া | ১০ | ৭২.৯ |

| | | |
|---|---|---|
| হন্ডুরাস | ১১ | ৭২.৮ |
| মলদোভা | ৩ | ৭২.৮ |
| রোমানিয়া | ৩ | ৭২.৫ |
| মাদাগাস্কার | ৫ | ৭২.৫ |
| সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিয়া | ১৪ | ৭২.২ |
| লেসথো | ৪ | ৭২.১ |
| মালদ্বীপ | ২ | ৭২.০ |
| টোগো | ২ | ৭১.৯ |
| মালয়েশিয়া | ২ | ৭১.৫ |
| মরক্কো | ৫ | ৭১.২ |
| ক্রোয়েশিয়া | ৩ | ৭১.২ |
| ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো | ১ | ৭০.৯ |
| মনাকো | ৭ | ৭০.৯ |
| উগান্ডা | ৩ | ৭০.৮ |
| ইয়েমেন | ২ | ৭০.৭ |
| তাইওয়ান | ৫ | ৭০.৫ |
| কমোরাস আইসল্যান্ড | ২ | ৭০.৩ |
| গ্রানাডা | ৬ | ৭০.৩ |
| **ঙ) ৬৫ থেকে ৬৯.৯৯** | | |
| অজ্যাঙ্গোলা | ৮ | ৬৯.৫ |
| জাপান | ২২ | ৬৯.৫ |
| নেপাল | ৭ | ৬৯.১ |
| ইকুয়েডর | ১২ | ৬৮.৯ |
| জর্জিয়া | ৩ | ৬৮.৯ |
| বার্বাডোজ | ১১ | ৬৮.৮ |
| কেপ ভার্দে | ৩ | ৬৮.৬ |
| ভানুয়াতু | ৫ | ৬৮.৩ |
| এস্তোনিয়া | ৪ | ৬৮.১ |
| জ্যামাইকা | ১২ | ৬৮.১ |
| হাঙ্গেরি | ৩ | ৬৭.০ |
| ডমিনিকান রিপাবলিক | ৬ | ৬৬.৬ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ১৭ | ৬৬.৫ |
| বেনিন | ৩ | ৬৫.৯ |

| | | |
|---|---|---|
| মোজ্বকো | ১৯ | ৬৫.২ |
| সাও তোমে ও প্রিন্সিপি | ৩ | ৬৪.৫ |
| পাপুয়া নিউ গিনি | ৮ | ৬৪.১ |
| সেন্ট লুসিয়া | ১২ | ৬৪.১ |
| সলোমন আইল্যান্ড | ৪ | ৬৩.৮ |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১২ | ৬৩.৩ |
| কেন্দ্রীয় আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ২ | ৬৩.২ |
| মিয়ানমার | ২ | ৬২.৭ |
| কিরগিজস্তান | ৩ | ৬২.৫ |
| গিনি বিসাও | ২ | ৬২.৫ |
| আলজেরিয়া | ২ | ৬২.৩ |
| এন্টিগোয়া ও বারবুডা | ১১ | ৬২.২ |
| কেনিয়া | ২ | ৬২.১ |
| জিনিয়া | ১ | ৬১.৯ |
| সিরিয়া | ১ | ৬১.২ |
| বতসোওয়ানা | ৬ | ৬০.৭ |
| বেলারুস | ২ | ৬০.৬ |
| সিয়েরা লিওন | ১ | ৬০.২ |
| **চ) ৫৫ থেকে ৬৯.৯৯** | | |
| বসনিয়া ও হারজেগোভিনা | ৩ | ৫৯.৪ |
| ভারত | ১৩ | ৫৮.৪ |
| রাশিয়া | ৩ | ৫৮.২ |
| বাংলাদেশ | ৬ | ৫৭.৬ |
| সুদান | ২ | ৫৬.৫ |
| সুইজারল্যান্ড | ১৪ | ৫৬.৩ |
| টংগা | ৪ | ৫৬.২ |
| **ছ) ৫০ থেকে ৫৪.৯৯** | | |
| নাইজার | ৩ | ৫৪.১ |
| মেসিডোনিয়া | ২ | ৫৩.৮ |

| | | |
|---|---|---|
| পোল্যান্ড | ৬ | ৫০.৩ |
| নাইজেরিয়া | ৩ | ৫০.১ |
| **জ) ৪৫ থেকে ৪৯.৯৯** | | |
| চাদ | ১ | ৪৯.৬ |
| এল সালভাদর | ১১ | ৪৮.৭ |
| জিম্বাবুয়ে | ৩ | ৪৭.৬ |
| কলম্বিয়া | ১৮ | ৪৭.১ |
| হাইতি | ৩ | ৪৫.৫ |
| মৌরিতানিয়া | ২ | ৪৫.৩ |
| পাকিস্তান | ৬ | ৪৫.১ |
| **ঝ) ৪৪.৯৯ এর নিচে** | | |
| ইজিপ্ট | ৫ | ৪১.৭ |
| বার্কিনা ফাসো | ৪ | ৩৯.৫ |
| লেবানন | ৩ | ৩৭.০ |
| আইভরিকোস্ট | ২ | ২১.৩ |
| মালি | ২ | ২১.৩ |

উৎস: Voter Turnout from a Comparative Perspective-Fortune.' https//fortune dotcom files:wordpress.com

সংসদের জন্য যে ব্যর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই নির্বাচনের ভোটার হার অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, তবে বাংলাদেশে ভোটার উপস্থিতির হার ৫ থেকে ১০ শতাংশ বেশি হওয়ার কথা। তাতেও বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম ৫০ শতাংশের মধ্যে উন্নীত হয় না। দ্বিতীয় সমস্যা হলো ২০০৮ সালে ৮৫.২৬ শতাংশ ভোটার উপস্থিত ছিল বলে হিসাব করা হয়েছে। এই হিসাব আগের নির্বাচনগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৭৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৮টি নির্বাচন হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি নির্বাচনে উপস্থিতির হার ছিল ৫০ থেকে ৬০ শতাংশের মধ্যে। একটি নির্বাচনে উপস্থিতির হার ছিল ৬০ শতাংশ। মাত্র দুটি নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল ৭৪.৯৭ থেকে ৭৫.৬০ শতাংশ। ২০০৮ সালের নির্বাচনে এই হার প্রায় ১০ শতাংশ বেড়ে যায়। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার সময় ফটোসহ পরিচয়পত্র দেওয়া হয়। এর ফলে জাল ভোটার নিবন্ধনের সংখ্যা কমে যায়।

যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহলে ২০০৮ সালের আগের নির্বাচনগুলোতে ভোটার উপস্থিতির হার জাল ভোটসহ ছিল অতিরঞ্জিত। সুতরাং ২০০৮ সালে সঠিক ভোট হয়ে থাকলে ভোটার উপস্থিতির হার খুব বেশি বাড়ার কথা নয়। এই অবস্থায় ২০০৮ সালের নির্বাচনে জাল ভোটার এবং এর উপস্থিতি সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা হলো ৪১। তবে ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ১৭ বছরের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ৪টি রাজনৈতিক দল দেশের ভোটারদের নিয়ন্ত্রণ করছে। বাকি রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য।

**সারণি-১৩.৫**

**প্রধান ৪টি দল কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা**

| দলের নাম | ৫ম সংসদ | ৭ম সংসদ | ৮ম সংসদ | ৯ম সংসদ |
|---|---|---|---|---|
| বিএনপি | ৩০.৮ | ৩৩.৬ | ৪১.৪ | ৩২.৫ |
| আওয়ামী লীগ | ৩০.১ | ৩৭.৪৪ | ৪০.০২ | ৪৮.০৪ |
| জাতীয় পার্টি | ১১.৯ | ১৬.৪০ | ৭.২২ | ৭.০৪ |
| জামায়াতে ইসলামী | ১২.১ | ৮.৬১ | ৪.২৮ | ৪.৭০ |
| প্রধান চার দলের প্রাপ্ত ভোটের হার | ৮৪.৯ | ৯৬.০৫ | ৯২.৯২ | ৯২.২৪ |
| নির্দলীয় প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট | ৪.৪ | ১.০৬ | ৪.০৬ | ২.৯৪ |
| অন্য সব দলের প্রাপ্ত ভোট | ১০.৭ | ১.৯ | ৩.০২ | ৪.৮২ |

উৎস : রওনক জাহান, ২০১৫, *Political Parties in Bangladesh*. Dhaka, Prothoma

সারণি-১৩.৫ থেকে দেখা গেছে যে গত ৩০ বছরে প্রধান চারটি দল কমপক্ষে ৯৪.৯ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৯৬.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। আর ৩০টির বেশি বিরোধী দল সর্বনিম্ন ভোট পেয়েছে ১.৯ শতাংশ আর সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে ১০.৭ শতাংশ। নির্দলীয় প্রার্থীরা সর্বনিম্ন ভোট পেয়েছেন ১.০৬ শতাংশ আর সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন ৪.৪ শতাংশ।

উপরিউক্ত তথ্য থেকে মনে হয় যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো দল হলো জামায়াতে ইসলামী। এরপর আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির জন্ম বাংলাদেশ সৃষ্টির পর। এ দুটি দলই দুজন সমরনায়কের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় পার্টি স্থাপিত হয়

১৯৮৬ সালে। এরপরও অনেক দল আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু তাদের কেউই জনসমর্থন লাভে সফল হয়নি। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সাফল্য এটাই প্রমাণ করে, যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গিয়ে তাদের সমর্থকদের পুরস্কৃত করতে সমর্থ হয়েছে, একমাত্র তারাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে টিকে রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর একটি বড় দুর্বলতা হলো এসব দলের ভেতরে কোনো গণতন্ত্রের চর্চা হয় না। প্রথমত, প্রধান চারটি দলের তিনটি দলই বংশভিত্তিক রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এরপর তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৮১ থেকে এখন পর্যন্ত (প্রায় ৩৬ বছর ধরে) অব্যাহতভাবে দলের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৮৩ থেকে তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অব্যাহতভাবে এখন পর্যন্ত বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। জাতীয় পার্টি ১৯৮৬ সালে লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং গত ৩০ বছর ধরে তিনি দলের সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর স্ত্রী ও ভাইকে দলের কো-চেয়ারপারসন নিযুক্ত করেছেন। জামায়াতে ইসলামীতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এ ধরনের বংশানুক্রমিক নেতৃত্বের প্রচলন নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে মাত্র দুজন সভাপতি দীর্ঘদিন ধরে এই পদটি আঁকড়ে ধরেছিলেন। গোলাম আযম ১৯৬০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত দলের আমির ছিলেন এবং মাওলানা নিজামী ২০০০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দলের আমিরের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রতিটি দলের গঠনতন্ত্রে সভাপতি নির্বাচনের বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ বিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিপালিত হয় না। বংশানুক্রমিকভাবে মনোনীত নেতা অথবা দলের প্রতিষ্ঠাতারা দলকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য পদেও নির্বাচন হয় না। সভাপতিরাই তাঁদের ইচ্ছেমতো এসব পদে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এই দলগুলোর মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনগুলোর সম্পর্ক দুই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমত, প্রতিটি দলেরই ফ্রন্ট বা সহযোগী সংগঠন রয়েছে। এই সহযোগী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। সারণি-১৩.৬-এ বাংলাদেশের প্রধান চারটি দলের ফ্রন্ট/সহযোগী সংগঠনের তালিকা দেখা যাবে।

## সারণি-১৩.৬
## বাংলাদেশে প্রধান চারটি দলের ফ্রন্ট/সহযোগী প্রতিষ্ঠানের তালিকা

| রাজনৈতিক দলের নাম | ফ্রন্ট/সহযোগী প্রতিষ্ঠান |
|---|---|
| আওয়ামী লীগ | বাংলাদেশ ছাত্রলীগ<br>বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ<br>বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ<br>বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ<br>আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ<br>বাংলাদেশ কৃষক লীগ<br>জাতীয় শ্রমিক লীগ<br>বাংলাদেশ তাঁতী লীগ<br>বাংলাদেশ আইনজীবী পরিষদ |
| বিএনপি | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল<br>বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল<br>জাতীয়তাবাদী যুবদল<br>জাতীয়তাবাদী মহিলা দল<br>বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল<br>জাতীয়তাবাদী কৃষক দল<br>জাতীয়তাবাদী তাঁতী দল<br>বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)<br>বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী উলামা দল<br>বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল<br>বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দল |
| জাতীয় পার্টি | জাতীয় ছাত্র সমাজ<br>জাতীয় যুব সংহতি<br>জাতীয় মহিলা পার্টি<br>জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক পার্টি<br>জাতীয় কৃষক পার্টি<br>জাতীয় সাংস্কৃতিক পার্টি<br>জাতীয় উলামা পার্টি<br>জাতীয় প্রাক্তন সৈনিক পার্টি<br>জাতীয় তাঁতী পার্টি<br>জাতীয় শ্রমিক পার্টি<br>জাতীয় আইনজীবী ফেডারেশন<br>জাতীয় মৎস্যজীবী পার্টি |
| বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | ইসলামী ছাত্রশিবির |

উৎস : রওনক জাহান, ২০১৫, *Political Parties in Bangladesh*. Dhaka, Prothoma

ওপরের তালিকার দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, এই তালিকা অসম্পূর্ণ। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বত্র সহযোগী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় না, তবু বাংলাদেশে এমন কোনো পেশা নেই, যেখানে দলভিত্তিক সংগঠন গড়ে ওঠেনি। সাংবাদিক বলুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলুন, কলেজ শিক্ষক বলুন, মাদ্রাসাশিক্ষক বলুন, মাধ্যমিক শিক্ষক অথবা প্রাথমিক শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ইত্যাদি সর্বত্র দলের সহযোগীরা কাজ করেন। এর ফলে বাংলাদেশে সিভিল সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দলের মতো জামায়াতে ইসলামীরও সহযোগী সংগঠন সর্বত্র রয়েছে। কিন্তু তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে না, কেননা, অনেক ক্ষেত্রে তারা গোপনে কাজ করতে চায়। জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তৃণমূল সংগঠনগুলোর দ্বিতীয় যোগসূত্র হলো দলের বিভিন্ন পর্যায়ের শাখা সংগঠন। এই শাখা সংগঠনগুলো সাধারণত জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌর এলাকা ও গ্রাম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংবিধান অনুসারে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নির্বাচিত হওয়ার বিধান রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের সংগঠনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এসব সংগঠনের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। জাতীয় নেতৃত্ব পরিবর্তন করার ক্ষমতা তৃণমূল সংগঠনগুলোর নেই। তারা বড়জোর কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারে কিন্তু সেই বক্তব্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক গৃহীত না হলে তাদের কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা নেই। ফলে তৃণমূল সংগঠনগুলো দলের মেনিফেস্টো বা নেতৃত্বকে প্রভাবিত করতে পারে না।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে মুরব্বি-মক্কেলের (Patron-cliant) সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রথমত, জাতীয় পর্যায়ের মূল নেতৃত্ব বংশানুক্রমিক ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে যেসব নেতা মূল নেতার আশীর্বাদ লাভ করেন, তাঁরাই জাতীয় নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্ত হন। এই জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃত্বের মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃণমূল তাদের কার্যকলাপের জন্য সরকারের সমর্থন চায়। এই সমর্থন পেলে তারা তৃণমূল পর্যায়ে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এবং সরকারের বিভিন্ন সম্পদ, প্রকল্প ও সুযোগ-সুবিধা থেকে অনুপার্জিত মুনাফা লাভ করতে পারে। যেমন তারা চায় যে থানাগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব থাকবে। তারা চায় বিভিন্ন সরকারি অফিসে তাদের মর্যাদা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। এ জন্য তারা কেন্দ্রীয় নেতাদের সমর্থন আশা করে। কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের এই শর্তে সমর্থন দেন যে তারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করবে। তবে এই ব্যবস্থার দুটি সমস্যা রয়েছে। প্রথম সমস্যা হলো, তৃণমূল

পর্যায়ের নেতারা তাদের আধিপত্য বিস্তার ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করতে চায়। এভাবে এই সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে মাস্তানরা চলে আসে। মাস্তানরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত এবং সরকারি ব্যবস্থা থেকে তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। বিরোধী দলের যারা সমর্থক, তাদের মধ্যেও একই ধরনের নেতৃত্ব রয়েছে। ফলে দলগুলোর মাস্তানরা অনেক ক্ষেত্রেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সারণি-১৩.৭-এ ২০০২ থেকে ২০১৩ সালে যেসব আন্তদলীয় সহিংস ঘটনা ঘটেছে, তার তালিকা দেখা যাবে।

**সারণি-১৩.৭**
**২০০২ থেকে ২০১৩ সালে আন্তদলীয় সংঘর্ষ**

| রাজনৈতিক দলের নাম | ২০০২ থেকে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত ঘটনা | প্রতিবছরে ঘটনার গড় | ২০০২ থেকে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত ঘটনায় আহত ব্যক্তির সংখ্যা | প্রতিবছর গড়ে আহত লোকের সংখ্যা | ২০০২ থেকে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা | গড়ে প্রতিবছর নিহত লোকের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আওয়ামী লীগ-বিএনপি | ১,২৫৭ | ১১৪ | ২১,৬৩৬ | ১,৯৬৭ | ২৫৬ | ২৩ |
| আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টি | ১৪ | ১.৩ | ১৬২ | ১৪ | ০ | ০ |
| আওয়ামী লীগ-জামায়াতে ইসলামী | ৮৯ | ৮ | ৪৯ | ৭৭ | ১৭ | ১.৫ |
| বিএনপি-জাতীয় পার্টি | ৭ | .৫ | ৬১ | ৫.৫ | ১ | ০.১ |
| বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী | ২১৭ | ১৯ | ২০১ | ১৮ | ৯ | ০.৯ |
| আওয়ামী লীগ-বিএনপি ও জামায়াত | ২৫ | ২.৩ | ১৬৭ | ১৫ | ১৮ | ১.৭ |
| অন্যান্য | ৭০ | ৬.৬ | ১,৬৩৭ | ১৪৯ | ৩৯ | ৩.৫ |

উৎস : রওনক জাহান, ২০১৫, *Political Parties in Bangladesh*. Dhaka, Prothoma

দ্বিতীয়ত, এই সংঘর্ষ শুধু বিভিন্ন দলের মধ্যেই ঘটছে না, এই সংঘর্ষ দলের ভেতরেও দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন দলের মধ্যে উপদলীয় সংঘাতের উপাত্ত সারণি-১৩.৮-এ দেখা যাবে।

**সারণি-১৩.৮**
**দলের মধ্যে উপদলীয় সংঘর্ষ, ২০০২ থেকে ২০১৩**

| রাজনৈতিক দলের নাম | ২০০২ থেকে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত ঘটনা | প্রতিবছরে ঘটনার গড় | ২০০২ থেকে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত ঘটনায় আহত ব্যক্তির সংখ্যা | প্রতিবছর গড়ে আহত লোকের সংখ্যা | ২০০২ থেকে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত ঘটনায় নিহতের সংখ্যা | গড়ে প্রতিবছর নিহত লোকের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আওয়ামী লীগ | ১,২৩৬ | ১১২ | ১৬,৫১৪ | ১,৫০০ | ১৫৯ | ১৪.৫ |
| বিএনপি | ৬১৩ | ৫৬ | ১২,০৭২ | ১,০৯০ | ৮৬ | ৭.৫ |
| জাতীয় পার্টি | ৪ | .৩ | ৪৫ | ৪.৫ | ০ | ০ |
| জামায়াতে ইসলামী | ২ | ০.২৫ | ৪ | ০.৪ | ০ | ০ |

উৎস : রওনক জাহান, ২০১৫, *Political Parties in Bangladesh*. Dhaka, Prothoma

সারণি-১৩.৮ থেকে দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আন্তদলীয় সংঘর্ষের তীব্রতা ও বিস্তৃতি অন্তর্দলীয় সংঘর্ষের সঙ্গে তুলনীয়। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে বছরে গড়ে সংঘর্ষ হয় ১ হাজার ২৫৭টি অথচ আওয়ামী লীগে অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ ঘটে ১ হাজার ২৩৬টি। আর বিএনপির মধ্যে অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ ঘটে গড়ে ৬১৩টি। বিএনপি-আওয়ামী লীগের আন্তদলীয় সংঘর্ষে গড়ে আহত হয় ১ হাজার ৯৬৭ জন এবং মারা যায় ২৫৬ জন। একই সময়ে আওয়ামী লীগের অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে বছরে গড়ে মারা যান ১৫৯ জন আর আহত হন ১ হাজার ৫০০ জন।

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূল পর্যায়ে দলীয় সংগঠনগুলো উপদলীয় বিরোধে জর্জরিত। এই উপদলীয় দ্বন্দ্ব নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় না। সহিংস ঘটনায় এর আত্মপ্রকাশ দেখা যায়। অতি সম্প্রতি এ ঘটনা আরও বেড়ে চলেছে। কিন্তু কোনো দলের কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলো তৃণমূল

পর্যায়ে উপদলীয় সংঘর্ষ হ্রাস করাতে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। তৃণমূল পর্যায়ে তাই সংগঠনগুলোর মধ্যে পেশিশক্তির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সহিংস ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

মোটকথা, দলগুলোর গঠনতন্ত্রে দলের ভেতরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিস্তারিত কাঠামো প্রণয়ন করা সত্ত্বেও তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে না। উপরন্তু কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যদিও নির্বাচনের বিধান রয়েছে, তবু সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচন হয় না। বংশগত ক্ষমতার জোরে যিনি দলের প্রধান হন, তিনিই কেন্দ্রীয় নেতাদের বেছে নেন। এর ফলে বাংলাদেশের মূল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে কিংবা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কোথাও গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে না।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আরও কয়েকটি অসম্পূর্ণতা রয়েছে। যদিও আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোকে মহিলা ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর যথোপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবু বাংলাদেশে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই এসব ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেয়নি। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলাদের ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর ভূমিকা এখনো সীমিত। নির্বাচনী আইনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর চাঁদা তোলার এবং ব্যয়ের হিসাব রাখার ব্যাপারে যেসব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও তেমন কার্যকর হয়নি। এ জন্য আরও ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক চেতনা প্রসারে অবদান রাখলেও এরা এখনো গণতান্ত্রিক দলের উপযোগী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারেনি। তাই দলগুলোর গণতন্ত্রায়ণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমানে মুরব্বি-মক্কেলের যে সম্পর্ক প্রতিটি দলের ভেতরে গড়ে উঠেছে, সে সম্পর্কের পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র কেন্দ্রীয় ও তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের কেউই চান না।

## ১৩.৪ উপসংহার

রাজনৈতিক জগতে নিয়ত পরিবর্তন চলছে। তাই বেশির ভাগ দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরেও রূপান্তর চলছে। উনিশ ও বিশ শতকে রাজনৈতিক দলগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। লিঙ্গ-বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ফলে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য বিরাট জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অথচ যেসব গণমাধ্যম তখন প্রচলিত ছিল, তা

এ ধরনের সমর্থন সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ছিলেন অপরিহার্য। অথচ আজকের পৃথিবীতে গণমাধ্যমের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে রাজনৈতিক কর্মীদের ভূমিকার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে ২০০২ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিপা নরিস Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেন।[৩] এই সমীক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনের প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

১. যেসব দেশে টেলিভিশন সীমিতভাবে চালু হয়েছে, সেসব দেশে দলীয় সদস্যদের গুরুত্ব বেশি। কারণ, এ ধরনের দেশে রাজনৈতিক বক্তব্যসমূহ মুখে মুখে প্রচার করতে হয়। যেসব রাষ্ট্রে বেশির ভাগ মানুষের সঙ্গে টেলিভিশনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব, সেসব রাষ্ট্রে রাজনৈতিক কর্মীদের গুরুত্ব কমে যায়।

২. অতীতে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো গির্জা অথবা ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থন নিয়ে গড়ে উঠত। কিন্তু এখন রাজনীতির ওপর ধর্মের প্রভাব অনেক হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অনেক দেশে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব কমে গেছে। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর চিরাচরিত উৎসসমূহের পরিবর্তন ঘটছে।

৩. গণমাধ্যমের দ্রুত অগ্রগতির ফলে রাজনৈতিক দলের বাইরে 'প্রতিবাদ রাজনীতির' আত্মপ্রকাশ ঘটছে। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম ব্যবহার করে গণদরখাস্ত, বিক্ষোভ, ক্রেতাদের বয়কটসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা সম্ভব। এ ধরনের কর্মসূচি রাজনৈতিক দলের কোনো কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ ধরনের কর্মকাণ্ডে উচ্চশিক্ষিত, তরুণ ও পেশাজীবী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (marginal groups) অংশ নিত। কিন্তু এখন প্রতিবাদ রাজনীতি সমাজের মূলধারার (mainstream) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ছে।

৪. কেউ কেউ মনে করেন যে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কমছে। তবে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে এ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যেসব প্রবণতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, তার প্রভাব বাংলাদেশের রাজনীতিতেও অবশ্যই পড়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে টেলিভিশনের ব্যাপক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ২০১০ সালের জুন মাসে *ডেইলি স্টার*-এর ফোরামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০১০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ লোক টেলিভিশন দেখার সুযোগ পায়। গত ছয় বছরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও পল্লি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে টিভি দর্শকের পরিমাণ আরও বেড়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা

টেলিভিশন দেখে। এ ধরনের রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারের জন্য রাজনৈতিক কর্মী অত্যাবশ্যক নয়। তবু দুটি কারণে বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পায়নি। প্রথমত, বাংলাদেশে সংঘাতের রাজনীতি চালু রয়েছে। সংঘাতে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, যারা রাজনীতিতে অংশ নেয়, তাদের বেশির ভাগেরই নিজস্ব কোনো পেশা নেই। এই উদ্বৃত্ত জনশক্তি তাই প্রয়োজন না থাকলেও নিজেদের স্বার্থে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকছে।

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে 'প্রতিবাদের রাজনীতি' অনেক দুর্বল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিবাদ সাধারণত দুই রাজনৈতিক জোটের সংঘর্ষের রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়। এর ফলে রাজনৈতিক দলের বাইরের জনগোষ্ঠীর এতে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে না। পক্ষান্তরে সম্প্রতি সংঘটিত 'আরব বসন্ত'কে প্রতিবাদের রাজনীতির উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যতক্ষণ বাংলাদেশে সংঘর্ষের রাজনীতি চলবে, তত দিন এখানে 'প্রতিবাদের রাজনীতি'র আত্মপ্রকাশ ঘটার সম্ভাবনা কম। তবু সম্প্রতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যথা রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন) প্রতিবাদের রাজনীতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

বৈশ্বিক পরিবর্তনের বাইরেও বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলসমূহের রূপান্তর ঘটছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসংক্রান্ত আইনকানুন ও উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের নিম্নলিখিত প্রবণতাসমূহ সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে :

১. **মুরব্বি-মক্কেল চক্র ও নিয়ন্ত্রণহীন দুর্নীতি :** এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে মুরব্বি-মক্কেল চক্র। এই রাজনীতির চাবিকাঠি হচ্ছে পৃষ্ঠপোষকদের আশীর্বাদ। মক্কেলরা হালুয়া-রুটির রাজনীতি করে। যেখানে মুরব্বিরা পৃষ্ঠপোষকতা দিতে পারেন, সেখানেই মক্কেলদের ভিড় জমে। তবে দেশে সম্পদ সীমিত। কাজেই আইনসম্মতভাবে পৃষ্ঠপোষকতার প্রসার সম্ভব নয়। বেশির ভাগ পৃষ্ঠপোষকতাই এখানে বেআইনি। এই বেআইনি পৃষ্ঠপোষকতাকে টিকিয়ে রেখেছে দুর্নীতির দুষ্টচক্র। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ দেশগুলোর অন্যতম। তবু এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন দেখা যায় না। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক দলগুলোই দুর্নীতির প্রধান সমর্থক বলে সন্দেহ করা হয়।

২. **বংশানুক্রমিক রাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাণ হচ্ছে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের

চর্চা। এই ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সব রাজনৈতিক নেতা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন। দলের সাধারণ সদস্যরা চাইলে যেকোনো পর্যায়ে নেতা পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বংশভিত্তিক। দলের প্রতিষ্ঠাতার গোষ্ঠীর নেতাকেই দলের প্রধান নির্বাচন করতে হয়। দলের প্রধান দলের কোন পদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তা তিনিই নির্ধারণ করেন। এখানে দলের সাধারণ ভোটারদের কোনো দায়িত্ব নেই। দলের সংবিধানে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বিধান থাকলেও আসলে কোনো নির্বাচন হয় না।

৩. **পরিবর্তনহীন রাজনীতি :** সাধারণত রাজনৈতিক দলে নতুন সদস্যরা যোগ দেন রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে। তৃণমূল পর্যায় থেকে দলের কর্মসূচি নিয়ে বিতর্ক হয় এবং গণসমর্থনের ভিত্তিতে নতুন কর্মসূচি গৃহীত হয় ও নতুন নেতৃত্ব দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেসব দেশে দলের ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব, সেসব দেশে নতুন দলের প্রয়োজন পড়ে না। বাংলাদেশে পুরোনো রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব নয়।

৪. **সহযোগী সংগঠনের আধিক্যের ফলে সিভিল সমাজের বিভক্তি ও সংঘর্ষমূলক রাজনীতির উদ্ভব :** সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে সিভিল সমাজের সংগঠনসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। কিন্তু যেসব দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সাংঘর্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান, সেসব দেশে সিভিল সমাজের রাজনৈতিকীকরণ হলে সংঘর্ষের দুষ্টচক্র থেকে পরিত্রাণ অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে বেশির ভাগ বড় দলের সমর্থকেরা সহযোগী সংগঠন বা ফ্রন্ট সংগঠন করে সিভিল সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছে। সংঘর্ষের রাজনীতি তাই সমাজের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে।

৫. **উপদলীয় কোন্দল (Factionalism) :** উপদলীয় কোন্দল সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে কমবেশি থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল আদর্শভিত্তিক নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ এখানে রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। তাই বাংলাদেশে উপদলীয় রাজনীতি অনেক বেশি সহিংস। এর ফলে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ অনেক ক্ষেত্রে রুদ্ধ।

৬. **দলীয় ও সরকারি নেতৃত্ব অভিন্ন :** গণতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে দল ও সরকার ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তাদের নেতৃত্বও হবে ভিন্ন। সরকার পরিচালনা করবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। সরকার সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, তার তদারক করবে দলীয় নেতৃত্ব। দলীয় ও সরকারি নেতৃত্ব অভিন্ন হলে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৭. **অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ঘাটতি :** গঠনতন্ত্র অনুসারে নিয়মিতভাবে দলের নেতৃত্বের জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না। জাতীয় নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী নির্বাচনেও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করা হয় না।
৮. **তহবিল সংগ্রহে অনিয়ম এবং স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণে ব্যর্থতা :** পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই রাজনৈতিক দলসমূহের তহবিল সংগ্রহে অনিয়ম ঘটে। যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো এ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ মানতে চায় না, তাই এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের হিসাব রক্ষার নিয়মগুলোও সঠিকভাবে প্রতিপালন করে না।

ওপরের আলোচনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে, তা অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল। এগুলোর সমাধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। এসব সংস্কারে রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান নেতৃত্বের কোনো লাভ নেই। কাজেই তাঁদের এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। এখানে সংস্কারের কয়েকটি সম্ভাব্য পথ রয়েছে। প্রথমত, একটি পথ হতে পারে একবারে সব সংস্কার না করে আস্তে আস্তে সংস্কার করা। এ ধরনের সংস্কারে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হবে না। দ্বিতীয়ত, একবারে সব আইনকানুন ঠিক করা। এর জন্য প্রয়োজন অরাজনৈতিক নেতৃত্ব। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এমন একটি সুযোগ এসেছিল। ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কার কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় এই সংস্কার-উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়ে। অধ্যাপক রওনক জাহান ২০১৫ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর একটি অভিসন্দর্ভ প্রকাশ করেন।[৪] বাংলাদেশে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার প্রসঙ্গে তাঁর মূল সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ :

১. রাজনৈতিক দলগুলোকে অগণতান্ত্রিক রীতিনীতি বর্জন করতে হবে। ক্ষমতাসীন দলকে রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রের সম্পদের অপব্যবহার করে তাদের সমর্থকদের পুরস্কার ও বিরোধীদের শাস্তি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দুর্নীতি হ্রাস করতে হবে।
২. বিরোধী দলকে বয়কটের রাজনীতি বর্জন করতে হবে এবং গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে সরকারের সমালোচনা করতে হবে।
৩. সব রাজনৈতিক দলকে দলের ভেতরে ও বাইরে সহিংস রাজনীতি বর্জন করতে হবে।

৪. সরকারপ্রধান ও দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি হবেন না। দলের নির্বাহী কর্মকর্তারা সরকারি দায়িত্ব পালন করবেন না।
৫. রাজনৈতিক দলগুলো মুরব্বি-মক্কেলদের জটাজাল সৃষ্টি না করে বিস্তারিত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও কর্মসূচিসমূহ প্রণয়ন করবে এবং সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে।
৬. রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের গঠনতন্ত্র ও নিবন্ধনের আইনগত শর্তসমূহ অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে। দলের ভেতরে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলতে হবে।
৭. রাজনৈতিক দলগুলোর চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। দরকার হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করতে হবে।

ওপরের প্রতিটি সুপারিশই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা হলো, এসব প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সব বড় রাজনৈতিক দলের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। অতীতের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করলে রাজনৈতিক দলগুলোর এ ধরনের সহযোগিতার সম্ভাবনা মনে হয় সুদূরপরাহত। বড় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে গণতান্ত্রিক শাসনের ক্ষেত্রে অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এসব অন্তরায় অপসারণে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। কাজেই আপাতত রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্যোগে রাজনৈতিক সংস্কারের সম্ভাবনা ক্ষীণ। যাঁরা আশাবাদী, তাঁরা মনে করেন যে দীর্ঘদিন এ অবস্থা বিরাজ করলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংস্কারের পক্ষে সমর্থন সৃষ্টি হতে পারে। তবে দীর্ঘ মেয়াদ কত দীর্ঘ, তা কেউ জানে না। উপরন্তু দেশের জনগণ এ অবস্থা এত দীর্ঘ সময় ধরে মেনে না-ও নিতে পারে। এর ফলে সমস্যার সমাধান সহজ না হয়ে সমস্যা আরও জটিল হতে পারে।

স্বল্প মেয়াদে আরও তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। একটি হলো, প্রতিবাদের রাজনীতি। যেমনটি ঘটেছিল অতি সম্প্রতি আরব দুনিয়াতে। অন্যটি হলো ক্ষুদ্র চরমপন্থী দলের বিদ্রোহ। আরেকটি সম্ভাবনা হতে পারে সংস্কারের সমর্থনে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর হস্তক্ষেপ। পরাশক্তিগুলোর মধ্যে অতীতে যতটা ঐকমত্য ছিল, এখন আর তা নেই। পরাশক্তিগুলোর মধ্যে নতুন টানাপোড়েন চলছে। নতুন নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটছে। কাজেই এই সব সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁরা এসব নৈরাশ্যজনক প্রক্ষেপণে হতাশ হন না। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এঁরা নিশ্চয়ই সাফল্যের পথ খুঁজে পাবেন।

বাংলাদেশে শুধু গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণের জন্যই রাজনৈতিক সংস্কার প্রয়োজনীয় নয়; বাংলাদেশে দুর্নীতি হ্রাস করতে হলেও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। অবশ্য পৃথিবীর সব দেশেই রাজনীতির সঙ্গে দুর্নীতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে একটি মার্কিন চুটকি স্মরণ করা যেতে পারে। চুটকিটিতে বলা হয়, একদিন এক সুবেশধারী লোক সন্ধ্যার পর ওয়াশিংটন ডিসিতে কংগ্রেস ভবনের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ছিনতাইকারী এসে তাঁকে আক্রমণ করে। সে ছুরি দেখিয়ে বলে, 'তোর যত টাকা আছে, সব টাকা আমাকে দিয়ে দে, অন্যথায় তোকে খুন করে ফেলব।' লোকটি তখন ছিনতাইকারীকে পাল্টা ধমক দিয়ে বললেন, 'একি করছিস, জানিস না আমি একজন কংগ্রেসম্যান। আমি অফিসে যাচ্ছি। বেশি বাড়াবাড়ি করিস না।' ছিনতাইকারী এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং বলল, 'হারামজাদা, তোর পকেটে যে টাকা আছে, সে টাকা তোর টাকা নয়, সে টাকা আমার মতো সাধারণ করদাতাদের টাকা। তোর টাকা দিতে হবে না, আমার টাকাই আমাকে ফেরত দে।' এই বলে ছিনতাইকারী যখন কংগ্রেসম্যানকে ছুরিকাঘাত করল, তখন বাধ্য হয়ে মানিব্যাগটি ছিনতাইকারীর হাতে দিয়ে তিনি চলে যান। পৃথিবীর সর্বত্রই রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ শোনা যায়। দুর্নীতি একটি জটিল সমস্যা। এর রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়। তবে যদি রাজনীতিবিদদের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে হয়তো এ সমস্যা আস্তে আস্তে কমে আসবে।

## পাদটীকা

১. Maneeza Hossin. 2006. 'The Rising Tide of Islamists in Bangladesh'. (Mimeo). New York: Hudson Institute.

২. Abul Barakat. 2013. 'Political Economics of Fundamentalism in Bangladesh' (Mimeo). Bdrc. Bd. @ gmail. Com.: gmail.com.info@hdear.bd.com.

৩. Pippa Norris. 2002. *Democratic Phoenix: Reinventing Political activism.* Cambridge: Cambridge University Press.

৪. Rounaq Zahan. 2015. *Political Parties in Bangladesh*: Dhaka. Prothoma

## ১৪

# বাংলাদেশে সিভিল সমাজ : সুশীল না দুঃশীল?

### ১৪.১ সিভিল সমাজের সংজ্ঞা ও তত্ত্ব

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে একটি পরাক্রমশালী রাজনৈতিক শক্তির নাম ছিল 'Holy Roman Empire.' কিন্তু আসলে তা রোমান ছিল না (কেননা, একই সঙ্গে পনেরো শতক পর্যন্ত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বেঁচে ছিল), প্রকৃত অর্থে এটি সাম্রাজ্যও ছিল না (এ সাম্রাজ্যে অনেক স্বশাসিত রাজ্য ছিল) এবং এ সাম্রাজ্য মোটেও 'পবিত্র' (সব খ্রিষ্টানের কাছে গ্রহণযোগ্য) ছিল না। ইংরেজরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের নাম দিয়েছিল 'Indian Civil Service'। আসলে তা ভারতীয় ছিল না (বেশির ভাগ সদস্য ছিলেন ইংরেজ), মোটেও তাঁরা 'সিভিল' ছিলেন না (তাঁদের বেশির ভাগ ছিলেন দুর্বিনীত), তাঁদের মধ্যে সার্ভিস বা সেবার ছিটেফোঁটাও ছিল না (তাঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক)। সম্প্রতি অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী ইংরেজি 'সিভিল সোসাইটির' বাংলা পরিভাষা করেছেন 'সুশীল সমাজ'। 'হলি রোমান এম্পায়ার' ও 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে'র মতো অবস্থা সুশীল সমাজেরও। প্রচলিত অর্থে সুশীল সমাজ মোটেও সুশীল নয় (সৎ ও ভদ্র নয়) এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ নয়। সুশীল সমাজ সিভিল সোসাইটির সঠিক পরিভাষা নয়। ইংরেজি 'সিভিল' শব্দের দ্যোতনা 'সুশীল' শব্দে প্রতিফলিত হয় না। তাই এ প্রবন্ধে সিভিল সোসাইটির পরিভাষা হিসেবে 'সিভিল সমাজ' ব্যবহার করা হয়েছে। যদি বাংলা একাডেমির নামে ইংরেজি 'একাডেমি' শব্দের ব্যবহার জায়েজ হয়, তবে সিভিল সমাজও সিভিল সোসাইটির পরিভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য দেন দার্শনিক হেগেল। তিনি মনে করতেন, আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার এত শক্তিশালী

হয়ে পড়ছে যে এখানে ব্যক্তির ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। তাই ব্যক্তিরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের বাইরে বিভিন্ন সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এসব সংগঠনই হচ্ছে সিভিল সোসাইটি। হেগেল মনে করতেন, সিভিল সোসাইটি যেমন রাষ্ট্রের খবরদারি করে, রাষ্ট্রেরও তেমনি সিভিল সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে বাজার-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? ডানপন্থীরা দাবি করেন যে যেহেতু বাজার ব্যক্তিগত অধিকারের সমর্থক, সেহেতু বাজার-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অন্যদিকে এই বক্তব্যের সমালোচকেরা দাবি করেন যে বাজারও ব্যক্তিকে শোষণ ও বঞ্চনা করে, বাজারের বিরুদ্ধেও ব্যক্তিকে লড়তে হয়। বণিকদের সংগঠন সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না, সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। তাই বণিকদের সংগঠন সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়।

সিভিল সমাজের আন্তর্জাতিক সংগঠন Civicus World Alliance for Citizen Participation সিভিল সমাজের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন: 'The arena outside of the family, the state and market where people associate to advance common interests.' পরিবার, রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে গির্জার মতো ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন, বিতর্ক সমিতি, স্বাধীন গণমাধ্যম, উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান (ইংরেজিতে যাকে বলা হয় একাডেমিয়া), সংক্ষুব্ধ নাগরিকদের সংগঠন, তৃণমূল সমাজসেবী বা সমবায় সংগঠন, পেশাভিত্তিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও, লিঙ্গ ও পরিবেশসহ বিভিন্ন দাবিসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দল। অবশ্য রাজনৈতিক দলকে সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না, সেটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড সিভিল সমাজের বাইরে থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোকে সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না। এই মতবাদের সমালোচকেরা বলেন, সিভিল সমাজে পরিবার, রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে যে জনগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময় ও লেনদেন ঘটে। এ ধরনের সম্পর্কের জন্য রাজনৈতিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সিভিল সমাজের সংজ্ঞা নির্ধারণের একটি বড় অসুবিধা হলো, 'সিভিল সমাজ' নামক মোড়কে একই সঙ্গে তিনটি ধারণা রয়েছে। মাইকেল

এডওয়ার্ডের ভাষায়, সিভিল সমাজ হচ্ছে একই সঙ্গে লক্ষ্য, লক্ষ্য উপার্জনের উপায় এবং লক্ষ্য ও উপায় সম্পর্কে জনগণের পারস্পরিক ভাববিনিময় ও সম্পর্ক স্থাপনের কাঠামো।[১] সিভিল সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক সম-অধিকার, বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার নিষ্পত্তি। সিভিল সমাজ বিশ্বাস করে, ভালো সরকার থাকলেও দেশে সিভিল সমাজের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, ভালো সরকার কখনো সৎ প্রতিবেশীর বিকল্প হতে পারে না। সমাজের সবাইকে মিলেমিশে থাকতে হবে। প্রতিবেশীদের মধ্যেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নীরা চন্দক লিখছেন :

> The concept of civil society highlighted one basic precondition of democracy: state power has to be monitored, engaged with and rendered accountable through intentional and engaged citizen action.[২]

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য একই ধরনের নয়। এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। তাই এদের মতবিনিময় ও পারস্পরিক লেনদেনের জন্য একটি কাঠামো দরকার। এই কাঠামোকে public sphere বা গণক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। রাষ্ট্র, বাজার আর পরিবারের বাইরে যে সমাজ রয়েছে, তা পুরোটিই গণক্ষেত্র। এই গণক্ষেত্রের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এর আগে ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করত। তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল সীমিত। আঠারো শতকে শিল্পোন্নত দেশগুলোর শহরগুলোতে মোড়ে মোড়ে নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য কফি হাউস গড়ে ওঠে। এসব দোকানে নিম্নমধ্যবিত্তরা কফি খেতেন আর আড্ডা দিতেন। এই কফি হাউসগুলোতে মানুষের মধ্যে মতবিনিময় শুরু হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্লাব গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদের মাধ্যমে তর্কবিতর্ক হয় আরও জমজমাট। গণক্ষেত্র হয়ে ওঠে একটি রঙ্গমঞ্চ, যেখানে তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে জনমত গড়ে ওঠে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিভিল সমাজ তত্ত্বের প্রথম সার্থক প্রয়োগ করেন রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিক আলেকসিস দ্য তোকভিল। তিনি সরাসরি সিভিল সমাজ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেননি, তবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন। এসব সংগঠনই হচ্ছে সিভিল সোসাইটির মৌলিক উপাদান। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তোকভিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। মার্কিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অন্তর্নিহিত শক্তি হচ্ছে সারা দেশে ছড়ানো স্থানীয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলো। এসব সংগঠনই রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তোকভিল মনে করতেন,

ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য গণতন্ত্র যথেষ্ট নয়। অনেক সময় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহের অধিকার হরণ করে। এ ধরনের পরিস্থিতিকে তিনি সংখ্যাগুরুর স্বেচ্ছাচার বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলো এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিরোধের জন্য অত্যাবশ্যক। তোকভিল তাই মনে করতেন, তৃণমূল জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠন ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক আন্তনিও গ্রামসি। তাঁর বিশ্লেষণে সমাজে দুই ধরনের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো Hegemony বা আধিপত্য। আরেকটি হলো Domination বা বলপূর্বক শাসন। রাষ্ট্র বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকদের সম্মতির প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সিভিল সমাজ অনেক সময় রাষ্ট্রের সহযোগী হিসেবে কাজ করে। আবার যেসব রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্রের বিপক্ষে, সেসব ক্ষেত্রে সিভিল সমাজ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিহত করে।

গ্রামসির বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে সিভিল সমাজ কখনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে আবার কখনো সংঘাতের জন্ম দেয়। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সিভিল সমাজের প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এক ঘরানার দার্শনিকেরা বলছেন যে সিভিল সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজে ঐকমত্য গড়ে তোলা। প্রতিদ্বন্দ্বী ঘরানার দার্শনিকেরা বলছেন, সিভিল সমাজের কাজ হচ্ছে সংঘাতের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করা।

প্রথম ঘরানার প্রধান প্রবক্তা হলেন জারগান হাবেরমাস। সমাজবিজ্ঞানে তাঁর একটি বড় অবদান হলো জনমত গঠনে গণক্ষেত্র বা Public sphere-এর ভূমিকার বিশ্লেষণ। তাঁর মতে, গণক্ষেত্রে সিভিল সমাজের যে অংশ সক্রিয় রয়েছে, তাদের মধ্যে যুক্তিবাদী ভাববিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট সবার সম-অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে ওঠে।

হাবেরমাসের বিশ্লেষণে একটি আদর্শ ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবতার যোগাযোগ ক্ষীণ। সমাজের চালিকাশক্তি সব সময় যুক্তি নয়, অনেক সময় ক্ষমতা। সংবিধান ও আইনকানুন না মানা হলে এসব দলিল নিছক কাগজ। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাব পরিবর্তন করা যায় না।

মিশেল ফুকোর বক্তব্য হলো: (Michel Foucault, 1926-84) সমাজ ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না, সমাজের চালিকাশক্তি হলো সংঘাত। এই সংঘাত হচ্ছে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। সাধারণত

হাবেরমাসের মতো চিন্তাবিদেরা সংঘাতকে সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক ও বিপজ্জনক হিসেবে গণ্য করে থাকেন। এই ধরনের মতবাদ খণ্ডন করে ফুকোর সমর্থকেরা লিখছেন :

> There is mounting evidence, however, that social conflicts produce themselves the valuable ties that hold modern democratic societies together and provide them with the strength and cohesion they need, that social conflicts are the true pillars of democratic society (Hirschman 1994, 206). Governments and societies that suppress conflict do so at their own peril. ...In a Foucaultian interpretation, suppressing conflict is suppressing freedom, because the privilege to engage in conflict is part of freedom.[৩]

সংঘাতকে অস্বীকার করে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা কখনো টেকসই হয় না। জোর করে সংঘাত দমন করলে সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যা পরে আরও তীব্রতর আকারে ফিরে আসে।

তবে ফুকোর 'সিভিল সমাজ' তত্ত্বের একটি বড় দুর্বলতা রয়েছে। সিভিল সমাজে সংঘাত দুই ধরনের। একটি হলো সিভিল সমাজের সঙ্গে বাইরের সংঘাত। এ সংঘাত রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের মধ্যে চলে। এর ভালো দিক রয়েছে, কেননা, সিভিল সমাজ রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচার খর্বিত করে। আরেকটি সংঘাত হলো অভ্যন্তরীণ। এ সংঘাত চলে সিভিল সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে। প্রথম ধরনের সংঘাত সমাজে পরিবর্তনের অগ্রদূত। দ্বিতীয় ধরনের সংঘাত সিভিল সমাজকে অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় করে। যদি সিভিল সমাজের মধ্যে বড় ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সংঘাতের মাধ্যমে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

সিভিল সমাজ সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলো পর্যালোচনা করলে মনে হয়, পৃথিবীর সব দেশে সিভিল সমাজের ভূমিকা একই ধরনের ছিল না। সামাজিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ভেদে বিভিন্ন দেশে সিভিল সমাজের ভূমিকা ভিন্ন ছিল। কাজেই একটিমাত্র তত্ত্ব দিয়ে সব ধরনের সিভিল সমাজের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

রাজনীতিতে সিভিল সমাজের ভূমিকা প্রশ্নে সিভিল সমাজ তত্ত্বের মধ্যেই স্ববিরোধিতা রয়েছে। তত্ত্ব অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলো সিভিল সমাজের অংশ। পক্ষান্তরে সিভিল সমাজের অবস্থান রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকে কি সিভিল সমাজের বাইরের না ভেতরের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে? এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো, সরকারের বাইরে ক্ষমতাসীন দলের নিজস্ব অস্তিত্ব আছে কি না। যেসব দেশে দলপ্রধান ও সরকারপ্রধান সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি,

সেখানে দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে সরকারি দলও সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে বাংলাদেশের মতো কোনো কোনো দেশে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। এসব দেশে সরকারি দল সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এ ধরনের সরকার গোটা সিভিল সমাজকে বিরোধী দল বলে গণ্য করে ও সিভিল সমাজকে অনুগত গৃহপালিত সংগঠনে পরিণত করতে চায়। সিভিল সমাজ মাথা তুলতে চাইলে তাকে দমন করতে এরা নির্মমভাবে খড়্গহস্ত। ওপরের তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সিভিল সমাজের ভূমিকা দেশভেদে ভিন্ন। কাজেই সিভিল সমাজের ভূমিকা কতটুকু কার্যকর, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে দেশভিত্তিক আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে সিভিল সমাজের ভূমিকার বিশ্লেষণ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য। এই প্রবন্ধ তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সিভিল সমাজের সংজ্ঞা ও তত্ত্বসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের দুর্বলতা ও সম্ভাবনাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## ১৪.২ বাংলাদেশে সিভিল সমাজ

দক্ষিণ এশিয়াতে ব্রিটিশ শাসনামলে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং দান-খয়রাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিভিল সমাজ সংগঠনের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এদের বেশির ভাগই জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সমর্থিত ছিল। সুতরাং পরোক্ষভাবে সিভিল সমাজ এবং রাজনীতির মধ্যে যোগাযোগ ছিল।[৪] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিভিল সমাজ সংগঠনের প্রসার ঘটে। বিশেষ করে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর যোগাযোগ ছিল। তবু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা একই পেশাগত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাজ করত।

বাংলাদেশের জন্মের পর এখানে দুটি পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমত, পেশাগত সংগঠনগুলোর মধ্যে দলভিত্তিক রাজনীতি শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান বিভক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে বাংলাদেশে সিভিল সংগঠনের সংখ্যা হিসাব করা বর্তমানে অত্যন্ত কঠিন। ফারহাদ তাসনিম তাঁর অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংগঠনের সংখ্যা ২ লাখ ৫৯ হাজার ৭০০ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই তালিকায় ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮৪৭টি সমবায় সমিতি

অন্তর্ভুক্ত। সমবায় সমিতির বেশির ভাগই নিষ্ক্রিয়। উপরন্তু বাংলাদেশে কমপক্ষে ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, সরকার কর্তৃক অর্থায়িত ও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এরা কোনো অভিধাতেই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নয়। এদের সিভিল সমাজ সংগঠন হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে না। সমবায় সমিতিগুলো বাদ দিলে সিভিল সমাজ সংগঠনের সংখ্যা হবে প্রায় ৭০ হাজার। এই হিসাবের মধ্যে ৪৫ হাজার ৫০৮টি সমাজকল্যাণ সংগঠন বা এনজিও রয়েছে। এই ৪৫ হাজার ৫০৮টি সংগঠনের মধ্যে বড়জোর হাজার বিশেক এনজিও সক্রিয়। এদের মধ্যে হাজার দুয়েক এনজিও বৈদেশিক সাহায্যের জন্য নিবন্ধিত। এই হিসাবে বাংলাদেশের প্রায় ৪৫ হাজার সিভিল সমাজ সংগঠন আছে বলে হিসাব করা যেতে পারে। তবে শুধু এই সংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগঠনের বিস্তৃতি পরিমাপ করা যাবে না। এর মধ্যে অনেক এনজিও রয়েছে যাদের শত শত শাখা রয়েছে। এনজিও-সংক্রান্ত একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে দেখা যায়, বাংলাদেশে শতভাগ শহরে ও কমপক্ষে ৯০ শতাংশ গ্রামে একটি সিভিল সংগঠন রয়েছে। সারণি-১৪.১-এ বাংলাদেশে সিভিল সংগঠনগুলোর প্রতিষ্ঠার সময়ভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখা যাবে।

সারণি-১৪.১ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের ৯০ শতাংশের বেশি সিভিল সমাজ সংগঠনের জন্ম হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০—এই দুই দশক সময়কালে ৪৩ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ শতাংশ সিভিল সংগঠন ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে সিভিল সমাজ সংগঠনের বিস্তৃতির একটি বড় কারণ হলো, ১৯৯০-এর দশকে পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর সিভিল সমাজের ধারণা দাতাদের আনুকূল্য লাভ করে। ১৯৯০-এর দশকের আগেই বাংলাদেশে বেসরকারি সংগঠনগুলোর প্রসার ঘটে।

তবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে শুধু সিভিল সমাজেরই বিকাশ ঘটেনি, অসিভিল বা দুষ্ট সমাজও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশে অসিভিল সমাজেরও বিস্তৃতি ঘটছে। অসিভিল সমাজের একটি বড় উৎস হলো মাস্তানরা। মাস্তানরা বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা করে, লোকজনের কাছ থেকে টাকা আদায় করে এবং বেআইনি মুনাফা অর্জন করে। মাস্তানদের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। বাংলাদেশে দুঃশাসনের মূলে অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে মাস্তান, রাজনৈতিক দল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যেকার পারস্পরিক সহযোগিতা। এই মাস্তানি কার্যকলাপ আস্তে আস্তে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিকে গ্রাস করেছে। বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির

## সারণি-১৪.১
## বাংলাদেশে সিভিল সংগঠনের সংখ্যা

| সময় | মোট সিভিল সংগঠনের সংখ্যা | ১৯১০-২০০৬ সময়কালে প্রতিষ্ঠিত মোট সংগঠনের শতাংশ | ক্রমপুঞ্জিত শতাংশ |
|---|---|---|---|
| ১৯১০-৩৪ | ০ | ০ | ০ |
| ১৯৩৫-৩৯ | ১ | ০.২ | ০.২ |
| ১৯৪০-৪৪ | ১ | ০.২ | ০.৪ |
| ১৯৪৫-৪৯ | ২ | ০.৪ | ০.৮ |
| ১৯৫০-৫৪ | ৫ | ১.০ | ১.৮ |
| ১৯৫৫-৫৯ | ০ | ০ | ১.৮ |
| ১৯৬০-৬৫ | ১৫ | ৩.০ | ৪.৮ |
| ১৯৬৫-৬৯ | ১০ | ২.০ | ৬.৮ |
| ১৯৭০-৭৫ | ৩৮ | ৭.৬ | ১৪.৪ |
| ১৯৭৫-৮০ | ৪০ | ৮.০ | ২২.৪ |
| ১৯৮০-৮৪ | ৭০ | ১৩.৮ | ৩৬.২ |
| ১৯৮৫-৮৯ | ৬৭ | ১৩.৩ | ৪৯.৫ |
| ১৯৯০-৯৫ | ৫০ | ৯.৯ | ৫৯.৪ |
| ১৯৯৫-৯৯ | ৯০ | ১৭.৮ | ৭৭.২ |
| ২০০০-২০০৬ | ১১৫ | ২২.৮ | ১০০ |

ত্র : ফারহাত তাসনিম (২০০৭, ১০৪)

গীরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে াধীনতাসংগ্রাম—সর্বত্র ছাত্র-রাজনীতিবিদেরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন রেছেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাস্তানি করে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি াভের সুযোগ খুলে যায়। এর ফলে ছাত্রনেতারা মাস্তানির দিকে ঝুঁকে াড়েন। মাস্তানিতে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ক্তাক্ত অভিযানের সূচনা হয়। তারা শুধু বিরোধী রাজনৈতিক ছাত্রনেতাদেরই াক্রমণ করে ক্ষান্ত থাকেনি, উপদলীয় কোন্দলের ক্ষেত্রেও সহিংসতা ব্যবহার রে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে মাস্তান এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর সদস্যসংখ্যা ম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য নেই। তবে এ ধরনের সংগঠনগুলোর াদস্যসংখ্যা সিভিল সমাজের সংগঠনসমূহের সদস্যের চেয়ে কম হবে বলে নে হয় না।

বাংলাদেশে অসিভিল সমাজ শুধু মাস্তান ও ছাত্ররাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোর মধ্যেও অসিভিল সমাজ ছড়িয়ে পড়েছে। সিভিল শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেরোলিন এম এলিয়ট যথার্থই লিখেছেন, 'Civility implies tolerance, the willingness of individuals to accept disparate political views and social attitudes.' বাংলাদেশে বেশির ভাগ ধর্মীয় সংগঠন ইসলামি মৌলবাদে অনুপ্রাণিত। এদের পরমতসহিষ্ণুতা নেই এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার কোনো ইচ্ছাও নেই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সিভিল সমাজ সংগঠনের কিছু কিছু উপাদান থাকা সত্ত্বেও এদের অসিভিল সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সারণি-১৪.২-এ বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য দেখা যাবে।

**সারণি-১৪.২**
**বাংলাদেশের সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ**

| **প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি** | **মোট সদস্য সংখ্যা** | **শতকরা হার** |
|---|---|---|
| ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | ২৩০৮৩৮ | ৮৮.১২ |
| স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান | ১৬৫৮৬ | ৬.৩৩ |
| বিনোদনমূলক ও ক্রীড়া ক্লাব | ৫৭৮৪ | ২.২১ |
| বেসরকারি সংগঠন | ৩৪৩৩ | ১.৩১ |
| ট্রেড ইউনিয়ন | ২৬০৪ | ০.৯৯ |
| পেশাগত প্রতিষ্ঠান | ১৩০০ | ০.৫০ |
| কর্মচারীদের সংগঠন | ৭৫৫ | ০.২৯ |
| সাংস্কৃতিক সংগঠন ও অন্যান্য | ৬৬২ | ০.২৫ |
| | ২৬১৯২৬ | ১০০ |

উৎস : Bangladesh Bureau of Statistics 2007

উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ এদের সিংহভাগেরই কোনো সিভিল চেতনা নেই। এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠানে সিভিল চেতনা থাকার কথা, সেখানেও নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশের সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি বড় উৎস হতে পারত সমবায় সমিতিসমূহ। অথচ, আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সমবায় সমিতিগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নয়, এগুলো সরকারি

অর্থে সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন। এদের সিভিল সমাজ সংগঠন না বলে সরকারি কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে গণ্য করা উচিত।

বেসরকারি সংগঠনসমূহ (বা এনজিওগুলো) একই সঙ্গে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের একটি বড় সবলতা ও দুর্বলতা। তত্ত্ব অনুসারে বেসরকারি সংগঠনসমূহের সদস্যদের সিভিল সমাজের সদস্য গণ্য করা উচিত। দুই কোটির বেশি সদস্য সিভিল সমাজের ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। বাংলাদেশে মোট কতটি এনজিও রয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন সংস্থা ডিএফআইডির হিসাব অনুসারে ২০০০ সালে বাংলাদেশে ২২ হাজার এনজিও কাজ করছিল। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ২০০০ সালে ৫৪ হাজার ৫৩৬টি এনজিও সক্রিয় ছিল। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে তখন পর্যন্ত ২ লাখ ৬ হাজার 'নট ফর প্রফিট' অর্থাৎ লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত নয় এমন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছিল। বাংলাদেশের স্থূল জাতীয় উৎপাদের ৬ থেকে ৮ শতাংশ উদ্ভূত হয় এনজিও খাত থেকে। বাংলাদেশে ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ ঋণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত সেবার জোগান দেয় এনজিও খাত। প্রশ্ন হলো, এনজিও খাতের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের অংশ হিসেবে গণ্য করা সঠিক হবে কি না?

তাত্ত্বিক দিক থেকে এখানে তিনটি প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমত, সিভিল সমাজের প্রধান দায়িত্ব হলো ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করা। এ অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সিভিল সমাজ আপসহীন। কিন্তু বাংলাদেশের এনজিওগুলোর প্রধান কাজ হলো দাদনের ব্যবসা। বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষা হতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে এনজিওগুলোর ৯২ শতাংশ শাখার মূল কার্যক্রম হচ্ছে ঋণ বিতরণ। এই দাদনের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। যদি সিভিল সমাজের অংশ হিসেবে আন্দোলন করলে ঋণের ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কায় বেসরকারি সংগঠনগুলো এ ধরনের আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসে। ব্যবসা পরিচালনার জন্য এনজিওগুলোর সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রয়োজন। তাই তাদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন করা সম্ভব নয়। কাজেই এনজিওগুলোর পক্ষে পুরোপুরিভাবে সিভিল সমাজের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, এনজিওগুলো তাদের অর্থায়নের জন্য বিদেশি সাহায্য সংস্থা ও সরকারের ওপর নির্ভরশীল। এনজিওগুলো দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক অনুদান পায়। ২০০১ সালে বাংলাদেশকে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রায় ১৭ শতাংশ পেয়েছে এনজিওগুলো।[৫] বৈদেশিক সাহায্যের বাইরে বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়নেও এনজিওগুলো চুক্তিভিত্তিক দায়িত্ব পালন করে। এ ছাড়া পল্লি কর্ম সাহায্য সংস্থা, এনজিও ফাউন্ডেশন, গৃহায়ণ তহবিল ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে এনজিওগুলো সরকারের কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণ পায়।

বিদেশি সাহায্য পাওয়ার জন্যও সরকারের অনুমতির প্রয়োজন পড়ে। তাই এনজিওগুলোর সরকারের বিপক্ষে আন্দোলন করার ক্ষমতা সীমিত। বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত কর্মসূচিসমূহ অনেক সময় বিদেশি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়। জেফ্রি উড এ ধরনের কর্মসূচিকে ফ্রেঞ্চাইজ (Franchise) বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফ্রেঞ্চাইজ ব্যবসার নিয়ম হলো তা মূল কোম্পানির আদলে তাদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সিভিল সমাজের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না।[৬]

তৃতীয়ত, সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে অনেক সিভিল সমাজ সংগঠন দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশে সব এনজিওর একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল অ্যাডাব (ADAB)। এখন প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে নতুন সংস্থা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে অনেক এনজিও সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। সরকারের পক্ষ থেকেও যেসব এনজিও সরকারের নীতির বিরোধী বলে সন্দেহ করা হয়, তাদের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে গ্রামীণ ব্যাংক ও প্রশিকার মতো বড় এনজিওগুলোও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। বস্তুত, বাংলাদেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সিভিল সমাজের ভূমিকা পালনের পরিবেশ অত্যন্ত প্রতিকূল।

বাংলাদেশের বর্তমান বৈরী পরিবেশে বেশির ভাগ এনজিও সচেতন ও অচেতনভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সমর্থক না হয়ে স্থিতাবস্থার সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনজিওগুলোর দাবিদাওয়া বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে ৫০০টি সিভিল সমাজ সংগঠনের দাবিদাওয়া সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। এ দাবিদাওয়ার বিশ্লেষণ সারণি-১৪.৩-এ দেখা যাবে।

এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১৭ শতাংশ সংগঠন রাজনৈতিক ও মানবিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ৪৬ শতাংশ সংগঠন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সেবা প্রদান করে। ৪৪ শতাংশ সংগঠন সদস্যদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে। অর্থাৎ, সারণি-১৪.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সিভিল সমাজ সংগঠনের কাছে সদস্যদের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার রক্ষা সবচেয়ে কম পছন্দনীয় কর্মকাণ্ড। এর একটি বড় কারণ হলো বাংলাদেশে অধিকাংশ বেসরকারি সংগঠন অতি সতর্কতার সঙ্গে বিতর্কিত রাজনৈতিক ভূমিকা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাংলাদেশে বেশির ভাগ বেসরকারি সংগঠনকে সিভিল সমাজ সংগঠন হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না। যদি সমবায় সমিতি ও প্রধানত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলোকে (এনজিও) বাদ দেওয়া হয়, তাহলে বাংলাদেশে সিভিল

সমাজ সংগঠনের পরিমাণ ও বিস্তার জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। ৫০০ সিভিল সমাজ সংগঠনের জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৮৬ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ১২ হাজারের কম, ৬৫ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ১০০-এর কম। যুক্তিসংগত কারণেই এনজিওগুলোর বড় পরিবর্তনে আগ্রহ কম। অন্যদিকে ৯৬ শতাংশ সিভিল সমাজ সংগঠনের পক্ষে বড় ধরনের পরিবর্তনে নেতৃত্ব প্রদান করার সম্ভাবনা কম।

**সারণি-১৪.৩**

**সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর দাবিদাওয়ার বিশ্লেষণ**

| কোন ধরনের সিভিল সমাজ সংগঠন কত শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **দাবির বিষয়** | **অর্থনৈতিক** | **শিক্ষা ও সংস্কৃতি** | **দাবি আদায়ের জন্য সংগঠন** | **কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সংগঠন** | **মোট** |
| পল্লি উন্নয়ন | ২০.৭ | ৬.১ | ০ | ২৪.১ | ১৬ |
| স্থানীয় ক্ষমতায়ন | ২৫ | ১২.২ | ১২.৫ | ৫৪.৫ | ৩১ |
| স্থানীয় দাবিদাওয়া | ২০.৭ | ৬.১ | ২৫ | ২৭.২ | ১৮ |
| শিক্ষা ও সাক্ষরতা | ৩২.৮ | ৮১.৬ | ৫০ | ৬২.৫ | ৪৪ |
| স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা | ৪৬.৬ | ৫৭.১ | ৫০ | ৬৬.৫ | ৪৬ |
| আইনি, রাজনৈতিক ও মানবাধিকার | ১২.১ | ২০.৪ | ২৫ | ২৮.৬ | ১৭ |
| অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন | ৬৫.৫ | ২৮.৬ | ৩৭.৫ | ৫৭.৬ | ৪৪ |
| সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা | ২৬.৭ | ৩৬.৭ | ৫০ | ৪২.৯ | ৩০ |

উৎস : ফারহাত তাসনিম (২০০৭, ১৫৬)

## ১৪.৩ বাংলাদেশে সিভিল সমাজের অর্জন ও সম্ভাবনা

সমাজবিজ্ঞানী এন্থনি গ্রিডেন্স[৭] বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিনটি পায়ের ওপর দাঁড়ানো একটি টেবিলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর একটি পা হলো সরকার, দ্বিতীয় পা হলো অর্থনীতি এবং তৃতীয় পা হলো সিভিল সমাজ। এদের একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং কোনো একটি উপাদান প্রাধান্য লাভ করলে তাতে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংকট দেখা দিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সিভিল সমাজ বিভিন্ন দেশে পরিবর্তনে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বের দুটি অঞ্চলে রাজনীতিতে সিভিল সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। একটি অঞ্চল হলো রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ। এখানে কমিউনিস্ট দল ছাড়া আর সব ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। এর ফলে এসব দেশে কোনো বিরোধী দল ছিল না। আশির দশকের শেষ দিকে যখন এসব দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেওয়ার মতো কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। তবে গির্জা ও ট্রেড ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে সিভিল সংগঠন ছিল। এই সংগঠনগুলোই সে পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করে। দ্বিতীয়ত লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতেও সেনানায়কেরা বিরাজনীতিকরণ করেন। এর ফলে লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশেই কোনো বিরোধী দল ছিল না। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। তাই রাজনৈতিক সংগঠন না থাকলেও গির্জাকেন্দ্রিক সংগঠনগুলো সিভিল সমাজে অত্যন্ত সক্রিয়া ভূমিকা পালন করে। উপরিউক্ত দুটি উদাহরণ থেকে দেখা যায়, যেসব দেশে বিরাজনীতিকরণের মাত্রা যত বেশি, সেসব দেশের রাজনীতিতে সিভিল সমাজের ভূমিকা তত ব্যাপক।

পৃথিবীর অনেক দেশেই রাজনৈতিক সংকট রয়েছে। বেশির ভাগ দেশেই আশা করা হয়, রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করবেন রাজনীতিবিদেরাই। শুধু যেসব দেশে রাজনীতিবিদেরা নিজেরা সংকট সৃষ্টি করেন এবং সেই সংকট জিইয়ে রাখেন, সেসব দেশের ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদেরা সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশা করা হয় না। বাংলাদেশে তিন দশক ধরে সংঘর্ষের রাজনীতি চলছে। এ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসবে সিভিল সমাজের নেতৃত্বে।

সিভিল সমাজ সম্পর্কে এ আশাবাদের কারণ চারটি। প্রথম কারণ হলো, বাংলাদেশের সিভিল সমাজের ইতিহাস। লাতিন আমেরিকার মতো পাকিস্তান ও বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে সেনাশাসন বিরাজনীতিকরণের চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে সেনাশাসকদের আমলে সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোই সম্মিলিতভাবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। মানুষের অধিকার রক্ষায় এদের অবদান সিভিল সমাজের ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। তবে মনে রাখতে হবে, সিভিল সমাজ একা প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি; এদের পেছনে পরোক্ষ রাজনৈতিক সমর্থন ছিল। ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রাম মূলত আওয়ামী লীগ ও সেনা সমর্থনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো সামরিক শাসনের বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

এরশাদ শাসনের অবসানে এরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলে। রাজনৈতিক দলের সমর্থনে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠাও করা হয়। ২০০৭-০৮ সালে দেশে যখন সেনাসমর্থিত সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন সিভিল সমাজ সরকারে অনেকটা গুরুত্ব লাভ করে। এর কারণ হলো, সেই সরকারের কোনো জনসমর্থন ছিল না। এরা সিভিল সমাজকে ব্যবহার করে জনসমর্থন সৃষ্টির চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, বাংলাদেশে সিভিল সমাজে অসাধারণ নেতৃত্ব রয়েছে। ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস, স্যার ফজলে হাসান আবেদের মতো অনেক সম্মোহনী (charismatic) নেতা বাংলাদেশের সিভিল সমাজে রয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদেরাও স্বীকার করেন যে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ত যথেষ্ট রাজনীতিবিদ বাংলাদেশে নেই। তাই সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভার মোট সদস্যদের এক-দশমাংশ পর্যন্ত অনির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করার বিধান রাখা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ হলো, সিভিল সমাজের কর্মসূচি। রাজনীতিবিদেরা যেসব সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সিভিল সমাজ সেসব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। চতুর্থ কারণ হলো, বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ টেলিভিশন দেখতে পারে। এর ফলে রাজনৈতিক কর্মীদের গুরুত্ব বর্তমানে কমে গেছে। সিভিল সমাজের নেতারা টিভির মাধ্যমে সরাসরি জনগণের কাছে বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন। ২০১৭ সালে ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ (Emmanuel Macron) টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসমর্থন সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে জনসমর্থন গড়ে তোলেন। উপযুক্ত টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব পেলে সিভিল সমাজের প্রতিনিধির রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এসব যুক্তির সত্যতা রয়েছে; কিন্তু এসব যুক্তি বাংলাদেশে সিভিল সমাজের নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়। বস্তুত বাংলাদেশে সিভিল সমাজের নেতৃত্বে রাজনৈতিক পরিবর্তন অকল্পনীয় মনে হয়। এখানে সিভিল সমাজের একটি বড় অংশ রাজনীতিবিদদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়। সিভিল সমাজ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং বিভিন্ন দল সিভিল সমাজের বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতিবিদেরা এ দেশে কখনো সিভিল সমাজকে প্রাধান্য দেবেন না। বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের বিকল্প হতে পারে সামরিক স্বৈরশাসন, সিভিল সমাজ নয়। যারা সিভিল সমাজের মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, তাদের পক্ষে সামরিক শাসনের সমর্থক হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকল্প

হিসেবে সিভিল সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ২০০৬ সালের শেষ দিকে যখন বাংলাদেশে ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হয়, তখন সদ্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। আওয়ামী লীগ নেতারা পর্যন্ত তখন অবধি দারিদ্র্য হ্রাসে তাঁর অবদান নিয়ে কোনো তর্ক শুরু করেননি। সে মুহূর্তে ডক্টর ইউনূসকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। ডক্টর ইউনূস সামরিক শাসনের ঘুঁটি হতে চাননি এবং তিনি বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। প্রথমে তাঁর দলে যোগদানের জন্য অনেকে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখান। কয়েক মাসের মধ্যেই ডক্টর ইউনূস বুঝতে পারেন যে সামরিক শক্তির দোসর হিসেবে কাজ না করলে তাঁর রাজনৈতিক দলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। যাঁরা তাঁর দলে যোগ দেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই আদর্শবাদী ছিলেন না। ফলে বাইরের শক্তির সমর্থন, সিভিল সমাজের সমর্থন ও ডক্টর ইউনূসের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি। এত সুবিধা থেকেও যেখানে ডক্টর ইউনূস ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে বিভক্ত সুশীল সমাজের বিতর্কিত নেতৃত্বের পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হবে কি না, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

এ কথা সত্যি যে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের ভাবমূর্তি নিষ্প্রভ ও অনেক ক্ষেত্রে কালিমালিপ্ত। কিন্তু উল্টোদিকে সিভিল সমাজের ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন-ব্যবস্থা ও অনুদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের জবাবদিহি সীমিত। তবু মাঝেমধ্যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে সঠিক জনমত প্রতিফলিত হয়। পূর্ণাঙ্গ জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব না হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মাঝেমধ্যে ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

বাংলাদেশে অনেক এনজিও রয়েছে, যেখানে কোনো জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই। অনেক এনজিও রয়েছে, যা পারিবারিক ব্যবসায়ের মতো পরিচালিত হয়। সহজ বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ফলে অনেক ভুয়া বেসরকারি সংগঠন এখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলো বন্ধ করে দিতে হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে এসব প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা মানসম্মত নয় এবং এসব প্রতিষ্ঠানে অর্থের নয়ছয় হয়েছে এবং এদের প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। আরও অভিযোগ রয়েছে যে এসব প্রতিষ্ঠান অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত হয়। ডেভিড লুইস এ প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন :

A second type of criticism is that NGOs are self-serving and some NGOs had simply become money-making enterprises for their staff, many of whom enjoy a high standard of material life (such as the use of air-conditioned four-wheel drive vehicles) and a high status professional life. Those NGOs that have established business concerns have faced accusations of profiteering from personal gains from sections of the public, and allegations of unfair market competition from groups within the business community[৮].(১২৩)

এসব অভিযোগ সব এনজিওর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে অনেক এনজিওতে কমবেশি অনিয়ম রয়েছে। কাজেই সিভিল সমাজ রাজনীতিবিদদের চেয়ে ভিন্ন চরিত্রের, এ অনুমানের পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

বাংলাদেশের সিভিল সমাজের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয়, এমন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে এ ধরনের ২ লাখ ৬ হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৮৯ হাজার প্রতিষ্ঠান ধর্মভিত্তিক। এসব ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো আদৌ সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য কি না, সে সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। ইংরেজি 'সিভিলিটি' কথাটার তাৎপর্য হলো সহিষ্ণু ও ভিন্ন ধরনের মতবাদের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা। এই সংজ্ঞা অনুসারে বেশির ভাগ ধর্মভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। যারা আধুনিক অর্থে সিভিল সমাজ, তারা আধুনিক মূল্যবোধে ও বিশ্বায়নে বিশ্বাস করে। বেশির ভাগ ধর্মভিত্তিক সংগঠন এ ধরনের মূল্যবোধের বিরোধী। তাই বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের মধ্যে ঐক্য সম্ভব নয়, বরং এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। শুধু ধর্মীয় কারণেই নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও বাংলাদেশে সিভিল সমাজের সংগঠনগুলো বিভক্ত। এ প্রসঙ্গে স্টাইলস যথার্থই লিখছেন :

The degree of penetration of Civil society by politicians is extreme... labor unions, professional associations, university groupings, chambers of commerce, and of course newspapers are identified primarily for their political affiliations... Advancement in most professions is based in large part upon signing oneself to the political leaning of one's superior or joining the relevant association or coalition. Even NGOs have been the target of partisan Co-optation.

সিভিল সমাজের একটি বড় সমস্যা হলো, এদের দাবিদাওয়া দেশের বাস্তবতার আলোকে করা হয় না, করা হয় আন্তর্জাতিক সেরা রীতির আলোকে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের তিনটি প্রধান দাবি ছিল : নির্বাহী বিভাগ থেকে

বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথক্‌করণ, মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন। বৈদেশিক দাতাদের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশের সিভিল সমাজ দীর্ঘদিন ধরে এ তিনটি দাবি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু কোনো নির্বাচিত সরকারই সিভিল সমাজ ও দাতাদের প্রস্তাব গ্রহণে রাজি হয়নি। ২০০৭ সালে ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের সুস্পষ্ট কোনো গণসমর্থন ছিল না, এই সরকার মূলত দাতাদের ও সিভিল সমাজের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই এই সরকার সিভিল সমাজের তিনটি প্রস্তাবই একই সঙ্গে বাস্তবায়ন করে। আশা করা হয়েছিল যে এর ফলে বাংলাদেশে মানবাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য শর্ত। বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা বহুলাংশে চালু করা হয়; শুধু অধস্তন ফৌজদারি আদালতে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং সংবিধান এই বিচারব্যবস্থাকেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ দেয়। নির্বাহী বিভাগ প্রচলিত ব্যবস্থায় ফৌজদারি বিচারকে নির্বাহী বিভাগের স্বার্থে অপব্যবহার করে। তাই এ ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই ম্যাজিস্ট্রেসি ব্যবস্থার সঙ্গে পুলিশের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও জড়িত ছিল। প্রচলিত ব্যবস্থায় পুলিশের নিয়ন্ত্রণের ভার নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটদের দেওয়া হয়। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করার ফলে পুলিশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়। একটি এক স্তরবিশিষ্ট রাষ্ট্রে বাইরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পুলিশ একটি অতি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং সাধারণ মানুষের মানবাধিকারের জন্য তা একটি বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়। শুধু স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ নয়, বিচারব্যবস্থায় আইনজ্ঞদের প্রাধান্যের ফলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিও সম্ভব হয় না। প্রায় সাড়ে সাত শত বিচারককে নিয়োগ দেওয়া এবং অধস্তন ফৌজদারি আদালতের ওপর থেকে নির্বাহী বিভাগের সব ক্ষমতা তুলে নেওয়ার পরও বিচারব্যবস্থাতে লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখা যায়নি। পক্ষান্তরে মানবাধিকার সংস্থাসমূহ পুলিশি জুলুম বাড়ছে বলে অভিযোগ করছে। (এই বইয়ের ২১৭-২১৯ পৃষ্ঠার আলোচনা দেখুন)।

২০০৭ সালে মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৮ সালে এর কার্যকলাপ শুরু হয়। কিন্তু আট বছর ধরে কাজ করার পরও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এ কমিশনের কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা যাচ্ছে না। মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার আট বছর পরও দেখা যাচ্ছে যে ১৩ বছর আগে হাইকোর্ট খালাস দেওয়ার পরও একজন অভিযুক্তকে ১৩ বছর ধরে জেলে আটক

রাখা হয়েছে। অথচ জেল সংস্কারের ব্যাপারে গত আট বছরে মানবাধিকার কমিশনের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতার একটি বড় কারণ হলো, এ প্রতিষ্ঠান সরকারের সহযোগিতা পায়নি এবং কমিশন মানবাধিকার সম্পর্কে সরকারের মধ্যে কোনো নবচেতনা সঞ্চারেও ব্যর্থ হয়েছে। যখন মানবাধিকার কমিশন স্থাপিত হয়নি, তখন কমিশন প্রতিষ্ঠার পর আইনশৃঙ্খলা রাক্ষাকারীবাহিনীর পক্ষে বেআইনি কার্যকলাপ চালানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। আট বছরের ব্যর্থতার পর কমিশন সম্পর্কে এই ধরনের ভয় দূর হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কমিশনের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার (যদি সম্ভব হয়) জন্য তাঁদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য অধিকার আন্দোলন ভারতের রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। দিল্লিতে আম আদমি দলের নেতা কেজরিওয়াল তথ্য অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমেই রাজনীতিতে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন এখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি।

সারণি ১৪.৪ এ বাংলাদেশ, ভারত ও চীনে তথ্যের জন্য মাথাপিছু অনুরোধে তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখা যাবে। সারণি হতে দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরের গড়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশে তথ্যের জন্য মাথাপিছু অনুরোধ খুবই কম। এই হার ভারতে বাংলাদেশের তুলনায় ৯ গুণের বেশি এবং চীনে প্রায় ১১ গুণ বেশি। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ব্যর্থতার একটি বড় দৃষ্টান্ত হলো, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে বাংলাদেশে তথ্যের জন্য অনুরোধ প্রায় ৮৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ভারত, বাংলাদেশ ও চীনের মতো দেশে যেখানে তথ্যের অধিকার সীমিত সেসব দেশে তথ্যের জন্য মাথাপিছু অনুরোধের হার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। অবশ্য যেসব দেশে তথ্যের অধিকার আগে থেকেই স্বীকৃত (যথা যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া) সেসব দেশে এই সূচক ততো গুরুত্ব বহন করে না।

যেসব দেশে বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনব্যবস্থা কার্যকর, সেসব দেশেই তথ্য অধিকার আইন ভালোভাবে কাজ করে। বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থা দুর্বল এবং প্রশাসনব্যবস্থা অকার্যকর। তাই বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন কোনো বড় ধরনের সুফল দিতে পারেনি।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে শুধু পশ্চিমের উত্তম উদাহরণগুলোর অনুকরণ করলেই চলবে না, কর্মসূচিসমূহকে দেশের বাস্তবতার

## সারণি-১৪.৪
## বাংলাদেশ, ভারত ও চীনে তথ্যের জন্য মাথাপিছু অনুরোধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

| বিষয় | বাংলাদেশ<br>২০১০-১৫ (গড়ে) | ভারত<br>২০১৫-১৬ | চীন<br>২০১১ |
|---|---|---|---|
| তথ্য পাওয়ার জন্য অনুরোধের সংখ্যা | ১৬,৪৮৪ | ১২,০০,০০০ | ১৫,০০,০০০ |
| মোট জনসংখ্যা | ১৬,৩০,০০০ | ১,৩৪,৪২,০০০ | ১,৩৭,৮৭,০০০ |
| জনসংখ্যার অনুপাতে তথ্য পাওয়ার জন্য অনুরোধ | ০.০১ | ০.০৯ | ০.১১ |
| ২০১০ সালে মোট তথ্যের জন্য অনুরোধ | ২৫,৪০৯ | — | — |
| ২০১৫ সালে তথ্যের জন্য মোট অনুরোধ | ৬,১৮১ | — | — |
| ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে তথ্যের জন্য অনুরোধ হ্রাস | -৭৬% | — | — |

সূত্র : Shamshul Bari and Ruhi Naz, 'Eight Years Old: How is the Right to Information Act Faring?' *Daily Star*, July 15, 2017

নিরিখে প্রণয়ন করতে হবে। একমাত্র এনজিওগুলোর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ছাড়া সিভিল সমাজের সংগঠনগুলো জনপ্রিয় কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। কাজেই রাজনৈতিক দলগুলোকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। অনেক সমাজবিজ্ঞানী বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আদৌ সিভিল সমাজের অস্তিত্ব আছে কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কারমেন মালেনা ও ভলকার্ট ফন হেনরিখের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁরা লিখেছেন :

> In every country there exists actors, organizations and activities that meet the defined criteria of civil society. In some cases, however, the concept of civil society had little resonance. Actors see themselves belonging to a particular organization, sector or movement, but have no sense of belonging to civil society per se.[৯]

উন্নয়নশীল দেশসমূহে সিভিল সমাজ সংগঠনের মতো সংগঠন ঠিকই আছে, কিন্তু এ ধরনের সংগঠনগুলোর সিভিল সমাজ ধারণার প্রতি আনুগত্য নেই। এসব দেশ সিভিল সমাজ একটি ধারণা মাত্র; যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বলা যায়, এসব দেশে সিভিল সমাজ হচ্ছে বাস্তবতার সন্ধানে একটি ধারণামাত্র (a concept in search of reality)।

অন্যদিকে কোনো কোনো সমাজতত্ত্ববিদ মনে করেন, উন্নয়নশীল দেশসমূহে সিভিল সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ ধারণা আমদানি করেছেন পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকেরা। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে অগণতান্ত্রিক উন্নয়নশীল দেশসমূহে সিভিল সমাজের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব। তাই আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিভিল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেদার অর্থ বিনিয়োগ করছে। দাতাদের উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে হরেক রকম সিভিল সমাজ সংগঠন গড়ে উঠছে। এসব সংগঠন দেশের মাটিতে গজায়নি; বাইরে থেকে এনে এদের উন্নয়নশীল দেশের মাটিতে পোঁতা হয়েছে। স্টাইলস এ ধরনের সিভিল সমাজকে বলেছেন 'ফরমায়েশি সিভিল সমাজ' বা 'civil society by design'[১০]। এ ধরনের সিভিল সমাজের কার্যক্রম তৃণমূলের মানুষেরা নিয়ন্ত্রণ করে না। এদের কর্মসূচি প্রণয়ন করে দাতারা, এসব কর্মসূচি প্রণয়নের অর্থও দেয় দাতারা। শিকড়বিহীন এসব প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্রের উজ্জীবনে কোনো লক্ষণীয় ভূমিকা রাখতে পারে না।

সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো শুধু শিকড়বিহীনই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান সুশীল নয়, দুঃশীল (uncivil/bad)। সাইমন চেম্বার ও জেফরি কপস্টেইন যথার্থই দাবি করেছেন যে দুঃশীল বা দুষ্ট সিভিল সমাজ সংগঠন শুধু উন্নয়নশীল দেশেই আছে তা নয়, এ সমস্যা উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহেও বিরাজ করছে।[১১] এটি একটি বাস্তব সমস্যা। সিভিল সমাজ সংগঠন শুধু সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে না। এদের সমাজকে পেছনের দিকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে। তাই দুষ্ট সিভিল সমাজ সংগঠন সম্পর্কে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশে সিভিল সমাজের পক্ষে একা সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব নয়। এরা রাজনৈতিক আন্দোলনে সহযোদ্ধা হতে পারে। এরা রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করতে পারে। কিন্তু একা সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর পক্ষে সমাজের রূপান্তর সম্ভব নয়। তবু সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাও সিভিল সমাজ সংগঠনগুলোর বড় একটি দায়িত্ব। সব স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবু যত দিন রাষ্ট্রের চাপে সাধারণ মানুষের অধিকার ও সৃজনশীলতা হুমকির সম্মুখীন হবে, তত দিন সিভিল

সমাজের ধারণা সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বারবার আকৃষ্ট করবে। মাইকেল এডওয়ার্ডস যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'It remains compelling because it speaks to the best in us— the collective, creative and values-driven core of the active citizen- calling on the best in us to respond in kind to create societies that are just, true and free'।[১২] লাভ-লোকসানের মোহে নয়, অন্তরের টানে মানুষ সিভিল সমাজ সংগঠন গড়ে তুলবে। এ ধরনের মানুষের কথা স্মরণ করে কবিগুরু লিখেছেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে/ তবে একলা চলো রে॥' তবে সাফল্য আসবে তখনই, যখন সিভিল সমাজ ও রাজনৈতিক শক্তিগুলো একত্রে কাজ করবে। অন্যথায় সিভিল সমাজ সুশীল নয়, দুঃশীল শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

## পাদটীকা

১. Michal Edward 2011. 'Civil Society' hpp/wo.info.org/arsociation/civil society. htmail.

২. Neera Chandoke 2007. 'Civil Society' *Development in Practice* Vol. 17, No 4-5, 607-9

৩. Bent Flyvberg. 1998. 'Havermas and Foucault: Thinkers for Civil Society'. *The British Journal of Sociology*. Vol 45. No 2, 210-233

৪. David Lewis, 2012. *Bangladesh Politics, Economy and Civil Society*. New Delhi: Cambridge University Press, 125-126.

৫. David Lewis. 2012, প্রাগুক্ত

৬. Geoffrey D. Wood. 1997. 'State Without Citizens: The Problem of the Franchise State' in *Too Close for Comfort, NGOs, States and Donors*, ed. D. Hulme and M. Edwards. London: Macmillan, 79-92.

৭. Anthony Giddens. 1999. *Runaway World: How Globalization is Reshaping our World*. London: Profile Books, 77

৮. David Lewis. 2012, প্রাগুক্ত

৯. Malena Carmen and Valkart Finn Heineich. 2007. 'Civil Society a proposed Methodology for International Cooperative Research'. *Development in Perspective* Vol. 17. No. 3, 338-352

১০. Kendall W. Stiles. 2002. *Civil Society by Design*. Westport, Ct: Praeger.

১১. Sivnome Chambers and Geffrey Kopscin, 'Bad Civil Society' *Political Theory*. Vol. 28. No 6, 817-18

১২. Michal Edwards 2011. প্রাগুক্ত

## ষষ্ঠ খণ্ড

# উত্তরণের সন্ধান : কোথায় চলেছি?

Cat: Where are you going?
Alice: Which Way Should I go?
Cat: That depends on where you are going?
Alice: I do not know.
Cat: Then It does not matter which way you go.

—Louis Caroll

Politicians are like bad horsemen who are so preoccupied with staying in the saddle they can't bother about where they are going.

—Joseph A. Schumpeter

# ১৫

# উত্তরণের সন্ধান : কোথায় চলেছি?

## ১৫.১ প্রস্তাবনা

জনৈক রসিক ব্যক্তি সংস্কারকে ব্যভিচারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, 'যারা ব্যভিচার করে, তারা কখনো এ সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করে না। যারা পারে না, তারাই এ নিয়ে ফড়ফড় করে। যারা সংস্কার করে, তারাও এ নিয়ে বড়াই করে না; যারা সংস্কার করতে পারে না, তারাই এ সম্পর্কে হইচই করে।' নৈতিক দিক থেকে সংস্কার ও ব্যভিচারের মধ্যে কোনো মিল নেই। ব্যভিচার গর্হিত আর সংস্কার হলো বাঞ্ছিত। তবু ব্যভিচার ও সংস্কার দুটোই হলো সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত অপ্রিয়। এ ধরনের অপ্রিয় কাজ লুকিয়ে সারতে পারলে ভালো হয়, হইচই করে করতে গেলেই বিপত্তি দেখা দেয়।

সংস্কার শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'পতিত অবস্থা থেকে মুক্তি'। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন হয় না, সেখানেই অধঃপতন দেখা দেয়। ব্রিটিশ দার্শনিক এডমুন্ড বার্ক যথার্থই বলেছেন, 'A state without the means of some change is without its means of conservation'। যেকোনো রাষ্ট্রকে বেঁচে থাকতে হলে তাকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। তাই রাষ্ট্রকাঠামোতে সময় সময় পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

অত্যাবশ্যক হলেও সংস্কার সহজে অর্জিত হয় না। প্রতিটি রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী জড়িয়ে থাকে। যেকোনো পরিবর্তন হলে কোনো না কোনো স্বার্থগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, তারা পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।[১] বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যাঁরা সংস্কারের ফলে লাভবান হন, তাঁরা সংস্কার বাস্তবায়নের ফলে যে তাঁদের লাভ হবে, তা নিজেরাও জানেন

না। তাই সংস্কারের পক্ষে শক্তি থাকে অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল। সংস্কার নিয়ে যত ফড়ফড় করা হয়, তার এক অতি ক্ষুদ্র অংশের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ১৪টি অধ্যায়ে ছোট-বড় মিলে শতাধিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, এ ধরনের বেশির ভাগ সংস্কারের অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা খুবই কম। এই গ্রন্থে যেসব সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে।

প্রথমত, যেসব সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করলেও আমাদের সমাজ পুরোপুরি শুদ্ধ একটি আদর্শ সমাজ হবে না। পৃথিবীর কোনো দেশেই শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি শুদ্ধ নয়। সব সংস্কার বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। উপরন্তু সব সংস্কার বাস্তবায়ন করলেও শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি শুদ্ধ হবে না; কেননা, সংস্কারের ফলাফল সব সময় বাঞ্ছিত হয় না। অনেক সময় সংস্কারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সংস্কার রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু কোনো দিনই রাষ্ট্রকে 'সব পেয়েছির দেশে' রূপান্তর করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, প্রশ্ন হলো, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সব সময় সংস্কার অত্যাবশ্যক নয়। বাংলাদেশে বিগত তিন দশকে রাজনীতি ও অর্থনীতি উল্টো পথে চলছে। সুশাসনের অধোগতি সত্ত্বেও মাথাপিছু আয় প্রায় তিন গুণ বেড়েছে এবং মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ তরতর করে এগিয়ে গেছে। যদি এত দিন সংস্কার ছাড়াই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তবে আদৌ সংস্কারের ঝক্কি-ঝামেলার প্রয়োজন রয়েছে কি?

তৃতীয়ত, যদি মেনে নিই, সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এত সব সংস্কার কি একসঙ্গে বাস্তবায়ন সম্ভব? কীভাবে এসব সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে? এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা কী, সে সম্পর্কে বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন রয়েছে।

সবশেষে প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশের বাস্তবতার নিরিখে সংস্কার সম্পর্কে কী ধরনের উদ্যোগ যুক্তিযুক্ত ও ফলপ্রসূ হবে? শুধু সংস্কারের সুপারিশ করাই যথেষ্ট নয়, এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের কর্মসূচিও বিবেচনা করতে হবে।

এই অধ্যায়ে তাই ওপরে উল্লেখিত প্রশ্নাবলির উত্তর খোঁজা হবে। এই অধ্যায়টি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। উপক্রমণিকার পর দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সংস্কারের সম্ভাবনা ও রণকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কার যেখানে প্রয়োজনীয়, সেখানেও সংস্কার করা সব সময় সম্ভব হয় না। উপরন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংস্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই

সংস্কার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কাজেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কারের অভিজ্ঞতা থেকে মূল বিষয়সমূহ তৃতীয় খণ্ডে উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কারের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## ১৫.২ সংস্কার কেন?

সমাজবিজ্ঞানের সংস্কার-সংক্রান্ত সাহিত্যে মূলত দুই ধরনের সংস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয় : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। সংস্কার অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হতে পারে (যেমন সাংস্কৃতিক সংস্কার, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদি)। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে প্রধানত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারকেই মুখ্য সংস্কার হিসেবে গণ্য করা হয় এবং অন্যান্য সংস্কারকে গৌণ সংস্কার মনে করা হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কারের ফল পেতে অনেক সময় লাগে এবং কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ত্রুটিবিহীন নয়। সংস্কারের ফলে অনেক ভালো ফল পাওয়া গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর অনভিপ্রেত প্রভাবও দেখা যেতে পারে। কাজেই সমাজবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক সংস্কারের কথা বললেও মূলত অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়েই বেশি আগ্রহী। অর্থনৈতিক সংস্কারের সুফল অনেক তাড়াতাড়ি পাওয়া সম্ভব এবং অর্থনৈতিক ফলাফলের পরিমাণগত বিশ্লেষণও অপেক্ষাকৃত সহজ। কাজেই সংস্কারের পক্ষে যাঁরা বক্তব্য দিচ্ছেন, তাঁদের বেশির ভাগই অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন।

বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিসহ দাতা সংস্থাসমূহও সুশাসনের জন্য সংস্কারের পক্ষেই সোচ্চার। এ বক্তব্যের পক্ষে প্রধান যুক্তি হলো, সুশাসন ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শাসনব্যবস্থা সংস্কার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে, সেগুলো দূর করতে হবে। আর প্রতিবন্ধকতা দূর হলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে এবং মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে। তাই তাদের বক্তব্য হলো, সবার আগে প্রয়োজন সুশাসনের জন্য সংস্কার। আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য মনে হলেও আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা সুশাসনের অপরিহার্যতাকে সমর্থন করে না। অতি সম্প্রতি চীন ও ভারতে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে কিন্তু সুশাসনের মাপকাঠিতে এ দুটি রাষ্ট্রের অবস্থান এখনো অনেক নিচে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সুশাসনের অপরিহার্যতার ধারণাকে সমর্থন করে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে রাজনীতি ও সুশাসন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন,

তাঁরা প্রায় সবাই একমত যে বাংলাদেশে রাজনীতি ও সুশাসন ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সুশাসনতত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, সুশাসন ছাড়া অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশে সুশাসন ছাড়াই অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের সুশাসন-সংক্রান্ত মূল্যায়নে ছয়টি নির্দেশক সূচক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ছয়টি সূচকের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের স্থান পৃথিবীর নিম্নতম ২০ শতাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯৬ থেকে ২০০৯ সময়কালে দেখা যাচ্ছে যে সুশাসনের ছয়টি সূচকের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটি সূচকের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ নিচে নেমে গেছে এবং অন্য সূচকটিতেও আমাদের অবস্থান প্রায় অপরিবর্তিত। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত চার দশকে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার ১৯৭০ সালে ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ, বর্তমানে তা ২২ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের গড় আয়ুর প্রত্যাশা ছিল ৪২ বছর। এখন এই হার ৭০ বছরে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতার হার, শিশুমৃত্যুর হার, মহিলাদের ক্ষমতায়নের হার এই সূচকগুলোতেও বাংলাদেশের নাটকীয় অগ্রগতি হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, যদি সুশাসন ছাড়াই অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়, তাহলে বাংলাদেশে আদৌ সংস্কারের কোনো প্রয়োজন আছে কি? সংস্কার করতে গেলে অনেক অপ্রিয় ব্যবস্থা নিতে হয়। দেশে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয় এবং অস্থিতিশীলতা অর্থনীতির অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সুশাসনের অধোগতি কীভাবে একই সঙ্গে কাজ করছে, সেটা বুঝতে হবে।

পণ্ডিতেরা বাংলাদেশে সুশাসনের অধোগতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির যে আপাতবিরোধী অবস্থান তাকে চারভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, এক ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন যে বাংলাদেশে সুশাসনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি একটি অস্থায়ী পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি টেকসই হতে পারে না। ফার্নান্ডেজ ও ক্রে নামে দুজন অর্থনীতিবিদ বলছেন, বাংলাদেশের সুশাসনের যে পরিস্থিতি, সে পরিস্থিতির সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি খাপ খায় না।[২] সুতরাং সুশাসন অর্জনের জন্য ব্যবস্থা না নিলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল ২০০৬ সালে। ২০০৬ থেকে ২০১৬ এই এক দশকে সুশাসনের আরও অবনতি ঘটেছে অথচ লক্ষণীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা শুধু বাংলাদেশেই ঘটেনি। চীনে ও ভারতে সুশাসনের অবক্ষয় সত্ত্বেও অভাবিতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে। সুতরাং ফার্নান্দেজ ও ক্রের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশে সুশাসনের অভাব থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অগ্রগতির আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিবিদ দেব রাজন।[৩] তিনি বলেছেন, সুশাসনের অভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এবং সিভিল সমাজের অসাধারণ সৃজনশীলতার ফলে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মহিলাদের ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করেছে। উৎপাদনের জন্য ঋণ সরবরাহ করেছে। গরিবদের তৈরি পণ্যের বাজারজাত করার ব্যবস্থা করেছে এবং নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে এদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এর ফলে গরিবদের সৃজনশীলতার বিকাশ সম্ভব হয়েছে। দেব রাজনের মতে, সুশাসন মূলত রাষ্ট্রের সমস্যা : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে রয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবদান। তবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেব রাজন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাফল্যকে অতিরঞ্জিত করেছেন। বেসরকারি সংস্থাসমূহের এবং বেসরকারি খাতের অর্থনৈতিক অর্জন সম্ভব হতো না যদি না সরকার ভৌত অবকাঠামো (যথা সড়ক, বিদ্যুৎ) এবং সামাজিক অবকাঠামো (যথা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে) উদ্যোগ না নিত। বেসরকারি সংগঠনের ভূমিকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে, কিন্তু এটি মূল শক্তি ছিল না। সুতরাং, দেব রাজনের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা এসেছে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষায় বলা হয় যে বাংলাদেশ যদিও সুশাসনের ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নিতে পারেনি, তবু কয়েকটি জরুরি ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার করেছে।[৪] এই সংস্কারগুলোর ফলেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এই সংস্কারগুলো হলো নিম্নরূপ :

১. সরকার অভ্যন্তরীণ বেসরকারি খাতের বিকাশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।
২. বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে সব সরকারই বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিদেশে অভিবাসনের জন্য সহায়তা প্রদান করে।
৩. রাষ্ট্র জনগণের দোরগোড়ায় সব রকম সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা স্বীকার করে নেয় এবং এসব সেবার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা স্বীকার করে তাদের সঙ্গে অংশীদারত্বমূলক ভিত্তিতে কাজ করে।
৪. পৃথিবীর অন্যান্য নিম্ন আয়ের দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সরকারি ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি দরিদ্রবান্ধব। অর্থাৎ বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করা হয়।
৫. দুর্যোগ প্রতিরোধে রাষ্ট্র তার সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তাদের এ বক্তব্য অবশ্য বিশ্বব্যাংকের সুশাসনের ধারণাকে সমর্থন করে না। বিশ্বব্যাংক বিশ্বাস করে যে সুশাসনের জন্য সব ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার করতে হবে। এই মতবাদের বিরোধিতা করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

কেনেডি স্কুলের অধ্যাপিকা মেরিলি এস গ্রিন্ডল (Merilee S Grindle)। তাঁর বক্তব্য হলো, নিম্ন আয়ের দেশসমূহের সুশাসনের জন্য সংস্কার করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।[৫] তাই তাদের সুশাসন অর্জনের জন্য চেষ্টা না করে 'চলনসই সুশাসন' (Good enough Governance) প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। চলনসই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জরুরি সংস্কারের মাধ্যমে। এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ-যাবৎকালের অর্জনের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে সমস্যা হলো যে ভবিষ্যতে এই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ক্রমশ নতুন নতুন জরুরি সংস্কার করতে হবে। কয়েক দশক এ ধরনের সংস্কারের মাধ্যমে এগিয়ে গেলেও এক পর্যায়ে বড় ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন হবে। সুতরাং, এটা কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নয়, শেষ পর্যন্ত সুশাসনের জন্য সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে সুশাসনের অধোগতি এবং অর্থনীতির উন্নয়নে চতুর্থ একটি ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এ ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ অবিনাশ দীক্ষিত ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রিটচেট (Pritchett)।[৬] তাঁদের বক্তব্য হলো, যখন কোনো দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিম্ন পর্যায়ে থাকে, তখন সুশাসন ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। তার কারণ, নিম্ন আয়ের দেশে প্রবৃদ্ধির অনেক সম্ভাবনা রয়েছে এবং এসব সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু যখন একটি দেশ নিম্ন আয় থেকে মধ্য আয়ের পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন সুশাসনের প্রয়োজন অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে সুশাসন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্পর্ক তখন আর সরলরৈখিক নয়। অর্থাৎ নিম্ন আয়ের দেশসমূহে এক ধরনের সম্পর্ক এবং মধ্য আয়ের দেশগুলোতে আরেক ধরনের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক রেখাচিত্র ১৫.১-এ দেখা যাবে।

**লেখচিত্র-১৫.১**
**সুশাসন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক**



যাঁরা সুশাসনের জন্য সংস্কারের প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন, তাঁদের বক্তব্য দুটি। প্রথমত, তাঁরা বলেন, যেহেতু সুশাসনের অগ্রগতি ছাড়াই ভারত, বাংলাদেশ, চীন প্রভৃতি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে, সেহেতু সুশাসনের অগ্রগতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি আবশ্যিক শর্ত হিসেবে গণ্য করার যুক্তি নেই। সুশাসন ছাড়াও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আরেক ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, এটি মনে করা ঠিক নয় যে সুশাসন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বরং বর্তমানে যেসব দেশ উন্নত, সেসব দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্য তুলে ধরেছেন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হা জুন চাং তাঁর *Kicking away the Ladder* নামক বই-এ।[৭] তিনি লিখেছেন :

> Most of the institutions that are currently recommended to the developing countries as parts of the 'good governance' package were in fact the results, rather than the causes, of economic development of the NDCs. In this sense, it is not clear how many of them are indeed 'necessary' for today's developing countries—are they so necessary that, according to the view of the IDPE, they have to be imposed on these countries through strong bilateral and multilateral external pressures?

সুশাসনে অগ্রগতি ছাড়াও অর্থনৈতিক অগ্রগতি হতে পারে। তবে সংস্কার ছাড়া এ ধরনের অগ্রগতি টিকিয়ে রাখা যায় না। এ প্রসঙ্গে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ, বিশেষ করে আর্জেন্টিনার অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের ফলে আর্জেন্টিনা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এরপর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এর অর্থনীতি নিচের দিকে নামতে থাকে এবং ১৯৭০-এর দশকের পর আর্জেন্টিনায় অর্থনৈতিক অধোগতি দেখা দেয়। আর্জেন্টিনা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন Daron Acemoglu ও James A. Robinson। তাঁদের বক্তব্য হলো, আর্জেন্টিনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর হয়নি, এর ফলে আর্জেন্টিনার পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। এই দুজন গ্রন্থকার বলছেন যে আর্জেন্টিনার প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল Extractive বা উৎপাটনমূলক। উৎপাটনমূলক প্রতিষ্ঠান সমাজের উৎপাদনশীলতা ক্ষুণ্ন করে। সমাজের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান (inclusive institutions)। আচেমগলু ও রবিনসন এ প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন :

> Extractive political institutions concentrate power in the hands of a narrow elite and place few constraints on the exercise of this power. Economic institutions are then often structured by this elite to extract resources from the rest of the society. Extractive economic institutions thus naturally accompany extractive political institutions. In fact, they must inherently depend on political institutions for their survival. Inclusive political institutions, vesting power broadly, would tend to uproot economic institutions that appropriate the resources of the many, erect entry barriers, and suppress the functioning of markets so that only a few benefit.[৮]

আর্জেন্টিনার মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহের মতো বাংলাদেশে রয়েছে উৎপাটনমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য। এসব প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর না করা পর্যন্ত টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশে সুশাসন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্পর্ক নিয়ে যে চারটি ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করা হয়েছে, তার দুটি ব্যাখ্যা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে নিম্ন আয়ের পর্যায়ে সুশাসনে অগ্রগতি ছাড়াও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এ অর্জন যে ভবিষ্যতেও ঘটবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হলে সুশাসনের চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে দেশে সুশাসন না থাকলে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। দ্বিতীয়ত, সুশাসনের জন্য একসঙ্গে সব পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই এবং শুধু জরুরি সংস্কার করতে পারলেই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, এ ধরনের একটি অনুমান চালু করা হয়েছে। তবে এ ধরনের অনুমানের অসুবিধা হলো, এ অনুমানের ভিত্তিতে অতীতের অর্জন বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কিন্তু ভবিষ্যতে অর্থনীতিতে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে এ ধরনের সংস্কার অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু কয়েক দশকের সংস্কারের পর দেখা যাবে, শুধু ছোটখাটো সংস্কারের ফলে কাজ হচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রেই বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সুশাসনের জন্য সংস্কারের প্রয়োজন না থাকলেও দীর্ঘ মেয়াদে অবশ্যই সুশাসনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে সুশাসন রাতারাতি প্রতিষ্ঠা করা যায় না, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক দশক ধরে অব্যাহতভাবে কাজ করতে হবে। আজকে যে সংস্কার করা হবে, তার ফল পেতে হয়তো ১০ বছর থেকে ২০ বছর সময় লাগবে। তত দিনে বাংলাদেশের জন্য সংস্কার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে।

বাংলাদেশে সংস্কারের অনিবার্যতা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বক্তব্যসমূহ প্রণিধানযোগ্য :

- শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সংস্কার প্রয়োজনীয় নয়। সংস্কারের প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য। মানবাধিকার মানুষের

জন্য সবচেয়ে বড় অধিকার। অন্য কোনো অধিকার মানবাধিকারের বিকল্প হতে পারে না। যদি এমন পরিস্থিতি দেখা যায়, যেখানে রাজনৈতিক অধিকারের জন্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়, সেখানে রাজনৈতিক মানবাধিকারকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে সুশাসনের প্রকট অভাব রয়েছে। সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে অবশ্যই সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে।

- অমর্ত্য সেনের ভাষায় উন্নয়ন হচ্ছে 'মানুষ যে বাস্তব স্বাধীনতা ভোগ করে, তার সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া।' ('a process of expanding the real freedoms that people enjoy') অবশ্যই মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি মানুষের স্বাধীনতা সম্প্রসারণ করে। তবু শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই মানুষের স্বাধীনতা নয়। অমর্ত্য সেন যথার্থই লিখেছেন :

  > But freedoms depend also on other determinants, such as social and economic arrangements (for example, facilities for education and health care as well as political and civil rights (for example the liberty to participate in public discussion and scrutiny).[৯]

মানবাধিকারের অনুষঙ্গসমূহের বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশে অবশ্যই ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

- মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি শুধু মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যই বাড়ায় না, অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে সমাজে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এ ধরনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফলের চেয়ে কুফলই হয় বেশি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সোনার ফসল সাধারণ মানুষের ঘরে তোলার জন্য সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।
- অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে প্রতিনিয়ত সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। যদিও বর্তমানে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছাড়াই অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি সম্ভব না-ও হতে পারে। অধ্যাপক প্রিটচেটের অনুমান, নিম্ন আয়ের দেশে সংস্কার ছাড়াও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব; কিন্তু মধ্যম আয়ের দেশে সংস্কার ছাড়া এ অগ্রগতি চালু থাকবে না। তবে সংস্কার করতে সময় লাগে। রাতারাতি সংস্কার করা যায় না। নিম্ন আয়ের দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের জন্য ১৫-২০ বছর সময় লাগে। এই ক্রান্তিকালে যেসব দেশ সংস্কার বাস্তবায়ন করতে পারবে, সেখানেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। সুতরাং, নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের মাঝে যে ১৫-২০ বছরের ক্রান্তিকাল রয়েছে, এটিই সংস্কার বাস্তবায়নের সবচেয়ে ভালো সময়।

## ১৫.৩ সংস্কারের কৌশল

সংস্কারের কৌশল সম্পর্কে দুই ধরনের মতবাদ দেখা যায়: এক ধরনের অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন যে সংস্কারের প্রকৃত সুফল পেতে হলে সব ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ধরনের মতবাদ প্রচণ্ড আঘাত পন্থা (Shock Tharapy অথবা Big bang approach) নামে পরিচিত। দ্বিতীয় ঘরানার অর্থনীতিবিদেরা পর্যায়ক্রমে সংস্কারের পক্ষে। এ ধরনের মতবাদকে ধীর পন্থা (Gradualism) রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

'প্রচণ্ড আঘাত পন্থার' সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন ডেভিড লিপটন (David Lipton), জেফরি স্যাকস (Jeffery Sachs), অ্যান্ডারস অ্যাশল্যান্ড (Anders Aslund), অ্যান্ড্রু বার্গ (Andrew Berg) প্রমুখ।[১০] তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিচ্ছিন্ন সংস্কার কখনো ফলপ্রসূ হয় না। সব ক্ষেত্রে সংস্কার একই সঙ্গে শুরু করতে হবে এবং স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য হলো 'You can not cross chasm in two jumps', অর্থাৎ লাফ দিয়ে খাদ পেরোতে হলে এক লাফেই পেরোতে হবে, দুই লাফে খাদ পেরোনোর কোনো উপায় নেই। তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হয়:

১. **সামঞ্জস্যকরণের ব্যয় হ্রাস :** যদি সব সংস্কার একই সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে করা যায়, তাহলে সামঞ্জস্যকরণের ব্যয় কমে যায়। যদি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার চলে, তাহলে অর্থনৈতিক পরিবেশে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সামঞ্জস্যকরণের জন্য সামাজিক ব্যয় বাড়তে থাকে।

২. **বিশ্বাসযোগ্যতা :** যদি সব ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, তাহলে সংস্কার বিশ্বাসযোগ্য হয়। যদি কোনো কোনো খাতে সংস্কার করা হয়, আর অন্য খাতে সংস্কার না করা হয়, তাহলে সে সংস্কার কর্মসূচি বিশ্বাসযোগ্য হয় না। এ ধরনের সংস্কার বেসরকারি খাতে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে না।

৩. **রাজনৈতিক প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয়করণ :** বেশির ভাগ সংস্কারের ফলে সমাজে কারও লাভ হয়, কারো ক্ষতি হয়। এমন সংস্কার খুঁজে পাওয়া শক্ত, যাতে সবারই লাভ হয়। যদি সংস্কার দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, তাহলে সংস্কারের ফলে যাঁদের লোকসান হয়, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় পান না। এমনকি সংস্কারের সব লোকসান সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধিও করতে পারেন না। কিন্তু সংস্কার বাস্তবায়নে যদি সময় লাগে, তাহলে যাঁদের ক্ষতি হয়, তাঁরা একত্র হন। সংস্কারের প্রক্রিয়া যত বিলম্বিত হবে, সংস্কারের শত্রুরা ততই মরিয়া হয়ে সংস্কার প্রতিহত করার চেষ্টা করবে।

৪. **বিভিন্ন খাতের সংস্কারের পরিপূরকতা :** অর্থনীতিবিদ জোয়ন রবিনসনের মতো তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে অর্থনীতির প্রথম সবক হলো অর্থনীতিতে সবকিছুই অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে। তাই তাঁরা মনে করেন, এক খাতের সংস্কার অন্য খাতের সংস্কারের পরিপূরক। অর্থনীতির এক খাতের সাফল্য অন্য খাতকে উজ্জীবিত করে এবং এক খাতের ব্যর্থতা অন্য খাতে সংক্রমিত হয়। কাজেই সংস্কার করতে হলে সব খাতের সংস্কারই একসঙ্গে করতে হবে।

ধীর পন্থার সমর্থকগণ মনে করেন যে সংস্কার ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এ মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে রিচার্ড পোর্টেস (Richard Portes), রোনাল্ড ম্যাকিনন (Ronald Mckinnon), ম্যাথিয়াস ডিউয়াট্রিপন্ট (Mathias Dewatripont) এবং রোনাল্ড জেরার্ড (Ronald Gerard)।[১১] তাঁদের বক্তব্য নিম্নরূপ :

১. **রাজনৈতিক বাস্তবতা :** বেশির ভাগ দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা হলো একই সঙ্গে অনেক খাতে সংস্কার করার ক্ষমতা বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশের সরকারের নেই। প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে অনেক কিছু ভেঙে দেওয়া সম্ভব, কিন্তু রাতারাতি তা পুনর্নির্মাণ করা যায় না। পুনর্নির্মাণ করতে সময় লাগে, তাই ধীর পন্থা হচ্ছে বেশির ভাগ দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা।
২. **গণসমর্থন সৃষ্টি :** যদি ধীর পন্থা অবলম্বন করে সংস্কারসমূহ বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে সংস্কারসমূহ দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এতে সংস্কারের পক্ষে সমর্থন সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড আঘাত দিলে অনেক সংস্কারই অবাস্তবায়িত থাকে। এই পরিস্থিতি অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। কাজেই প্রচণ্ড আঘাত সংস্কারের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে পারে না।
৩. **আনুক্রমিক** (Sequential) **সংস্কারের অপরিহার্যতা :** কোনো সংস্কারই একবারে বাস্তবায়িত হয় না। অনেক সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয় এবং সংস্কার সফল করার জন্য বাস্তবায়নের পরও পরিবীক্ষণ করতে হয়। কাজেই সংস্কারের আনুক্রমিক বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। প্রচণ্ড আঘাত পন্থায় যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা এই আনুক্রমিক বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশে প্রচণ্ড আঘাত পন্থায় গণসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে (Public Utilities) বেসরকারীকরণ করা হয়। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এতে বেসরকারি খাতে একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে ওঠে এবং এসব ব্যবসা অন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ও ভোক্তাদের শোষণ করে।

৪. **সংস্কারের ব্যয় হ্রাস :** প্রচণ্ড আঘাত পন্থায় সংস্কারের ব্যয় অনেক ক্ষেত্রেই বিপুল হয়ে দাঁড়ায়। এই পন্থায় অনেক সময়ই অপরিবর্তনীয় ভুল করা হয়, যার মাশুল বিপুল। উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ সময়কালে রাশিয়াতে প্রচণ্ড আঘাত পন্থা ভিত্তিক যেসব সংস্কার করা হয়, তার ফলে দেশটিতে এই সময়ে স্থূল জাতীয় উৎপাত ৫৪ শতাংশ হ্রাস পায় এবং শিল্প উৎপাদন প্রায় ৯০ শতাংশ কমে যায়।

প্রকৃতপক্ষে তাত্ত্বিকেরা প্রচণ্ড আঘাত পন্থা ও ধীর পন্থার যে বিরাট ফারাকের কথা বলছেন, তা মোটেও বাস্তব নয়। প্রচণ্ড আঘাত পন্থাতেও রাতারাতি সব সংস্কার করা যায় না, সংস্কার করতে সময় লাগে। অন্যদিকে ধীর পন্থা মানে সংস্কার থেকে পিছিয়ে আসা নয়, ধীর পন্থার তাৎপর্য হলো, সংস্কার আস্তে আস্তে করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে উভয় ক্ষেত্রেই সময় লাগে এবং বাস্তবে এই দুই পন্থার মধ্যে তফাত তত বেশি নয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক স্টিগলিজ যথার্থই লিখেছেন :

> In some cases what separated the two views was more a difference in perspective than reality. I was present in a seminar in Hungary when one participant said, 'We must have rapid reform. It must be accomplished in five years.' Another said, 'We should have gradual reforms. It will take us five years.' Much of the debate was about the manner of reform than the speed.'[১২]

মূল বিতর্কের বিষয় এই নয় যে সব সংস্কার আঘাত পন্থায় অথবা ধীর গতিতে করা হবে। মূল বিষয় হলো তিনটি। প্রথমত, কী সংস্কার করা হবে; দ্বিতীয়ত, কে সংস্কার করবেন এবং তৃতীয়ত, কীভাবে সংস্কার করবেন। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে সংস্কার সম্পর্কে সব দেশে একই ধরনের নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। দেশভেদে সংস্কার কী, কেন, কারা এবং কীভাবে করবেন, এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সমাধান দেখা যাবে। সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম যে সিদ্ধান্তটি নিতে হবে সেটি হলো, কোথায় ছোট ছোট সংস্কার করা হবে আর কোথায় বড় ধরনের সংস্কার করতে হবে।

যেখানে ছোট ছোট সংস্কার সম্ভব সেখানে ছোট ছোট সংস্কারের মাধ্যমেই বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব। যেসব দেশে দক্ষ প্রশাসন রয়েছে সে দেশে ছোট ছোট সংস্কার বাস্তবায়ন সহজ। যেসব দেশের প্রশাসন দুর্বল, সেসব দেশে ছোট ছোট পরিবর্তন করে সংস্কার বাস্তবায়ন করা যায় না। এর জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেশগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায় : ১. যেসব দেশে বিচ্ছিন্ন সংস্কারকাজ করবে; ২. যেসব দেশে বিচ্ছিন্ন সংস্কারকাজ করবে না।

যেসব দেশে বিচ্ছিন্ন সংস্কারকাজ করবে না, সেসব দেশের সমস্যাকে Humty Dumpty disorder আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ছোটদের ছড়া Humty Dumpty নিম্নরূপ :

Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had great fall
All the king's horses and all the king's men
Could not put Humpty Dumpty together again.

ছড়াটির সহজ অর্থ হলো, একটি ডিম ভেঙে গেলে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, একে আর জোড়া লাগানো সম্ভব হয় না। পৃথিবীর অনেক দেশের প্রশাসনেরও একই অবস্থা। ক্ষুদ্র পরিবর্তন করে এসব প্রতিষ্ঠানকে ঠিক করার উপায় নেই। এসব প্রতিষ্ঠান নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের সমস্যার দুটি উৎস রয়েছে। একটি হলো বাস্তবতা বিবেচনা না করে বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্ধ অনুকরণ। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা। বিশেষ করে অনেক রাষ্ট্রেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল প্রশাসনকে গ্রাস করে। যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালিত হয় না, প্রশাসন পরিচালিত হয় রাজনৈতিক নেতাদের মর্জি অনুযায়ী। এ ধরনের ব্যবস্থাতে সংস্কার চালু করা অত্যন্ত কঠিন।

যেখানে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন, সেখানে নিম্নলিখিত পাঁচ ধরনের ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে :

ক. দুষ্ট কর্মকর্তাদের অপসারণ করে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ করে প্রশাসনিক সংস্কার করা যেতে পারে। তবে এই ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে করতে গেলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে হবে। আমলাতন্ত্রে এ ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই স্বল্পসংখ্যক নির্বাচিত ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

খ. সরকারের ভূমিকা হ্রাস এবং সরকারি সেবার বেসরকারীকরণ। এ ধরনের ব্যবস্থা নিলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব।

গ. নির্ধারিত ক্ষেত্রে নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নতুন করে প্রশিক্ষণ দান। নেতৃত্বে পরিবর্তন আনলে নতুন নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় সংস্কারের প্রয়োজন হতে পারে।

ঘ. অদক্ষ অথবা দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের ক্ষমতা হ্রাস করা। এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত দক্ষ নেতৃত্বকে দায়িত্ব দিতে হবে।

ঙ. বহু খাতবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ চিহ্নিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতে সংস্কার শুরু করা। এ ব্যবস্থায় একবারে গোটা প্রতিষ্ঠানটিকে পরিবর্তন করা হয় না। দেশের বাস্তবতা বিবেচনা করে সংস্কারের কৌশল নির্ধারণ করতে হয়।

## ১৫.৪ কোথায় চলেছি?

মোটা দাগে দুই ধরনের সংস্কার করা হয়ে থাকে। একধরনের সংস্কার হয় পরিস্থিতির চাপে। এ ধরনের সংস্কারকে আমরা সংকটের সমাধান হিসেবে গণ্য করতে পারি। আরেক ধরনের সংস্কার হয় পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ থেকে। যাঁরা রাষ্ট্রনায়ক, তাঁরা সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন, জনমত যাচাই করেন, পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনবোধে সংস্কার করেন। এ ধরনের সংস্কার যেসব রাষ্ট্রে হয়, সেসব রাষ্ট্রে সংস্কার নিয়ে কোনো হইচই করতে হয় না। সংস্কার নিয়ে হইচই তখনই হয়, যদি রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড নিয়মিত সংস্কারের কোনো ব্যবস্থা না থাকে। বাংলাদেশে যেসব রাজনৈতিক সংস্কার হয়েছে, সেগুলো মূলত সংকট মোকাবিলা করার জন্য। গত চার দশকে বাংলাদেশে অনেক রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারকে একদলীয় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে রূপান্তর করা হয়েছে; নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে দুজন রাষ্ট্রপতিকে। সামরিক অভ্যুত্থান গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করেছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য বারবার সংগ্রাম করতে হয়েছে। তবু বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধান কখনো বাতিল করা হয়নি। সংকট সমাধানের জন্য গত তিন দশকে আপাতদৃষ্টিতে দুটি রাজনৈতিক সংস্কার করা হয়। প্রথমত, ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের বদলে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু এই সংস্কার প্রকৃত অর্থে কোনো পরিবর্তন আনেনি। রাষ্ট্রপতির যেসব ক্ষমতা ছিল, তা প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয় এবং প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকারে যে দলভিত্তিক নেতৃত্ব (Collegial) থাকে, তা কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয় সংস্কার করা হয় ১৯৯৬ সালে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। এর আগে পৃথিবীর কোনো দেশে শাসনতন্ত্রে এ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করা হয়নি। এই অভিনব পদ্ধতিতে দেশে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বৈধ নয় বলে ঘোষণা করেন এবং এরপর এই বিধান তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে গভীর রাজনৈতিক সংকট সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থে কোনো রাজনৈতিক সংস্কার করা হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করে নির্বাচনের সংকট ঠেকানো হয়েছিল মাত্র। কিন্তু রাজনীতির মূল সমস্যাগুলোর সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই গ্রন্থে আট ধরনের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

- রাষ্ট্রের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সংস্কার
- গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণের জন্য সংস্কার
- ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সংস্কার
- বিচারব্যবস্থার সংস্কার
- প্রশাসনের সংস্কার
- নির্বাচন-ব্যবস্থার সংস্কার
- সিভিল সমাজের সংস্কার
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংস্কার

বাংলাদেশের চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ রয়েছে: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র। বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়াতে যে তিনটি জাতীয় রাষ্ট্র রয়েছে, এর মধ্যে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ সবচেয়ে স্থিতিশীল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি অস্থিতিশীল। জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন উপাদানের টানাপোড়েন দেখা গেলেও বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য পরিবর্তনশীল। যে বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল, সে পরিস্থিতিতে এখন অনেক বড় পরিবর্তন ঘটেছে। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তৃতীয় আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য সবার আগে প্রয়োজন সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সুতরাং, বাংলাদেশের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা। পঞ্চম অধ্যায় ও একাদশ অধ্যায় থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিন ধরনের সংস্কার অত্যাবশ্যক।

- আনুপাতিক নির্বাচন-পদ্ধতির প্রবর্তন
- গণভোট-ব্যবস্থার প্রবর্তন
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

কোনো নির্বাচন-ব্যবস্থাই পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রতিটি নির্বাচনী পদ্ধতিরই সুফল এবং কুফল রয়েছে। আনুপাতিক হারে নির্বাচনের সুফল হলো, এই পদ্ধতি নির্বাচনী এলাকায় সবচেয়ে বেশি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন-পদ্ধতির চেয়ে অধিক গণতান্ত্রিক। নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে একজন প্রার্থী ৫০ শতাংশের অনেক কম ভোট পেয়েও নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু আনুপাতিক হারে দেশ পরিচালনার জন্য ৫০ শতাংশের চেয়ে বেশি ভোটের প্রয়োজন রয়েছে। আনুপাতিক হারে নির্বাচনের আরেকটি সুবিধা হলো যে দলের পক্ষে

বিশেষজ্ঞদের মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব। তাঁরা দলের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। তৃতীয়ত, আনুপাতিক হারে নির্বাচন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে ছোট দলগুলোর পক্ষে রাজনীতিতে অবদান রাখা সম্ভব হয়।

কিন্তু আনুপাতিক হারের দুটি মারাত্মক দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, আনুপাতিক হারে নির্বাচনে কোনো প্রার্থীকে বিশেষ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয় না। যেখানে প্রার্থীকে বিশেষ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়, সেখানে তাঁকে নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। নির্বাচনী এলাকার ভোটাররা এ ধরনের প্রার্থীকে জানেন, চেনেন এবং তাঁদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেন। সুতরাং, আনুপাতিক হারে নির্বাচন-পদ্ধতি প্রবর্তন ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে অনেক ক্ষেত্রেই কোনো দল সুস্পষ্ট সংখ্যাধিক্য অর্জন করতে পারে না। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কোয়ালিশন সরকার বিভিন্ন দলের মধ্যে আপস করে সরকার পরিচালনা করে এবং তাদের পক্ষে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। এ দুটি দুর্বলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে নিম্নলিখিত কারণে আনুপাতিক পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে :

ক. বাংলাদেশে নির্বাচনে অনেক জাল-জালিয়াতি হয়। নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক নির্বাচনে কোনোক্রমে এক ভোট বেশি পেলেই নির্বাচিত হওয়া সম্ভব কিন্তু আনুপাতিক হারের নির্বাচনে জাল ভোটের মাধ্যমে একটি আসন লাভ করতে হলে কমপক্ষে তিন লাখ ভোট জাল করতে হবে। যদি নির্বাচনে ভালো পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় (বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক), তাহলে আনুপাতিক হারে নির্বাচনে জাল ভোটের প্রভাব অনেক কম হবে।

খ. কোয়ালিশন সরকার অর্থ সব সময়ই দুর্বল সরকার নয়। ভারতে কোয়ালিশন সরকারের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কোয়ালিশন সরকারের মাধ্যমেও ভালোভাবে সরকার পরিচালনা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে কোয়ালিশন সরকার গঠনের একটি সুবিধাও রয়েছে। কোয়ালিশন সরকার অনেক সময় পরস্পরবিরোধী দল নিয়ে গঠন করতে হয়। তাই কোয়ালিশন সরকারে অন্য দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এর ফলে সংঘর্ষের রাজনীতির পরিবর্তে সমঝোতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে বর্তমানে সংঘর্ষের রাজনীতি বিরাজ করছে। এ রাজনীতিতে দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে। আনুপাতিক নির্বাচন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে সংঘর্ষের রাজনীতি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গ. আনুপাতিক হারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থাকে না বলে এ ধরনের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। এই ব্যবস্থার সমাধান হিসেবে দুই ধরনের মিশ্র ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, সংসদে শতকরা ৫০ ভাগ আসন আনুপাতিক হারে এবং শতকরা ৫০ ভাগ আসন নির্বাচনী এলাকার ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থায় আনুপাতিক হারের কিছুটা সুফল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, একই নির্বাচনে দুটি কক্ষ নির্বাচিত হতে পারে। একটি সংসদ হবে নিম্নকক্ষ। নিম্নকক্ষের সদস্যরা নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন আর উচ্চকক্ষের সদস্যরা আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন। যদি নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষের সমান অধিকার থাকে, তাহলে উচ্চকক্ষে সরকার পরিচালনার জন্য কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই মিশ্র পদ্ধতি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ দেশে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে, সেটি পরোক্ষ। জনগণ আইনসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন এবং আইনসভার সদস্যরা সরকার পরিচালনা করেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর একবার নির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনের সময় জনগণ তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। কিন্তু একবার প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ পরিচালনা করেন। এই সময়ে ভোটারদের কোনো ক্ষমতা থাকে না। এ ধরনের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই পৃথিবীর অনেক দেশেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গণভোটের আয়োজন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণভোট জনগণকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে গণভোটের কোনো ব্যবস্থা নেই। এর ফলে দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য বাংলাদেশে হরতালের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ নিয়ে গণভোটের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে হরতালের এই ধারার পরিবর্তন করা সম্ভব। তবে গণভোটেরও অসুবিধা আছে। যদি সবকিছুর ওপর যখন-তখন গণভোট করার সুযোগ দেওয়া হয়, তখন সরকারের পক্ষে কোনো কাজ করা অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশে তাই গণভোট প্রবর্তন করতে হবে, কিন্তু এ সম্পর্কে বিধিনিষেধ প্রণয়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই এই বিষয়টি সম্পর্কেও রাজনৈতিক বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশে আরেকটি বড় সমস্যা হলো যে এখানে একটিমাত্র স্তরে নির্বাচিত সরকার রয়েছে। একই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ করে, প্রাদেশিক সরকারের কাজ করে এবং প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় সরকারও পরিচালনা

করে। এর ফলে বাংলাদেশে সরকারের ক্ষমতা অনেক বেশি। এ ধরনের সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না। কাজেই বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে প্রাদেশিক অথবা জেলাভিত্তিক নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় সরকারকেও শক্তিশালী করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, অনেক উন্নয়নশীল দেশে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করলে সাধারণ মানুষের তত লাভ হয় না। প্রকৃতপক্ষে লাভবান হয় স্থানীয় অভিজাতরা। কাজেই বাংলাদেশে শুধু ক্ষমতা হস্তান্তর করলেই হবে না, এখানে Double Devolution বা দ্বৈত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। শুধু স্থানীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেই চলবে না, স্থানীয় সরকারকেও তৃণমূলের জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে বিলাতের কমন লর আদলে বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিলাতে শুধু গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে আইনজ্ঞদের বিশেষ অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, বেশির ভাগ মামলার ক্ষেত্রে আইনজ্ঞদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশে মামলা-পাল্টা মামলার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে; মিথ্যা সাক্ষ্যের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। উপরন্তু রাষ্ট্র বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে। তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়, বিচার বিভাগকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে আইনজ্ঞদের অশুভ প্রভাব হ্রাস পায়। ইউরোপের সিভিল ল ট্রাডিশনের ভিত্তিতে বিজ্ঞ বিচারকদের ক্ষমতা বাড়াতে এবং দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত বিচারব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যবস্থা গড়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রশাসনব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রেশাম বিধির ব্যামোতে আক্রান্ত। গ্রেশামের বিধি অনুসারে যেখানে খারাপ মুদ্রা এবং ভালো মুদ্রা রয়েছে, সেখানে খারাপ মুদ্রা ভালো মুদ্রাকে তাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের প্রশাসনও বর্তমানে চলছে দুষ্টের পালন এবং শিষ্টের দমন। এই প্রশাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। এ কাজও রাতারাতি করা সম্ভব নয়, এ জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার।

উপরিউক্ত সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল আদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নয়, বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো সম্মোহনী নেতার বংশের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এসব দলে রয়েছে মুরব্বি-মক্কেল সম্পর্ক। মক্কেলরা মুরব্বিদের রাজনৈতিক সমর্থন জোগায় আর মুরব্বিরা মক্কেলদের

বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে। তৃণমূল পর্যায়ের আদর্শবাদী কর্মীরা রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় না। তাই এখানে পরিবর্তন আনতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সবল করছে না। এখানে সামাজিক পুঁজি দুর্বল এবং সমাজেও প্রচণ্ড দলাদলি রয়েছে। সিভিল সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সংঘর্ষের রাজনীতিতে যে আক্রমণাত্মক ভাষা চালু করা হয়েছে তার পরিবর্তন করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে বাংলাদেশে দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আদৌ কোনো সংস্কারের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এর কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংস্কারের কোনো চাহিদা নেই। সব বড় দলের লক্ষ্য হলো দলের প্রয়াত সম্মোহনী নেতার বংশের প্রাধান্য বজায় রাখা। তৃণমূলে যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাঁদের বেশির ভাগের কোনো আদর্শ নেই; তাঁরা মূলত হালুয়া-রুটির বখরা নিয়ে ব্যস্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংস্কারের সম্ভাবনা ক্ষীণ। অন্যদিকে (দুর্ভাগ্যক্রমে) একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও এ ধরনের সংস্কার করা সম্ভব হবে না। ওপরে যেসব সংস্কার আলোচনা করা হয়েছে, তার কোনোটিই একনায়কত্বের হাত সবল করবে না; বরং সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হলে দুই স্তরে কাজ করতে হবে। প্রথমত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে একটি অধিকতর গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশে সংস্কারের পক্ষে গণসমর্থন গড়ে তুলতে হবে।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সবার আগে প্রয়োজন সব রাজনৈতিক দলের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী ব্যবস্থা। বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় দুই ধরনের সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রথমত, একটি স্বাধীন ও কার্যকর নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে আইনগত বা শাসনতান্ত্রিক সংস্কার তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমস্যা হলো রাজনৈতিক দলগুলোর নগ্ন ও সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য শুধু নির্বাচন কমিশনের সংস্কারই যথেষ্ট নয়, নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কেও সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান প্রয়োজন।

তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কে চার ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব :

- যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, তার অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠান।
- সংবিধান সংশোধন করে দুই মেয়াদের জন্য অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা।
- সংবিধান সংশোধন করে তিন মাস মেয়াদের জন্য নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা।
- সংবিধান সংশোধন না করে নির্বাচনের আগে সর্বদলীয় সরকার-ব্যবস্থার রীতি প্রবর্তন।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, তার তত্ত্বাবধানেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ব্যতিক্রম করা হয়েছিল বাংলাদেশে। এরপর পাকিস্তানেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। তবে এ ধরনের অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নির্বাচন সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের তত্ত্বাবধানেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার পক্ষে প্রধান যুক্তি হলো যে গণতান্ত্রিক দেশে কোনো অনির্বাচিত সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যায় না। তবু বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়েছিল প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথম কারণ হলো যে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলগুলো 'অনুরাগ ও বিরাগের বশবর্তী না হয়ে' দেশ পরিচালনার শাসনতান্ত্রিক শপথ রক্ষা করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এরা প্রশাসনযন্ত্রকে বাধ্য করে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করতে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে একটি অতিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এখানে শুধু একটি সরকারই রয়েছে; কোনো প্রাদেশিক সরকার বা শক্তিশালী স্থানীয় সরকার নেই। এই কেন্দ্রীভূত সরকারের সব ক্ষমতার উৎস হলেন প্রধানমন্ত্রী। কাজেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর যত ক্ষমতা রয়েছে, সে ধরনের ক্ষমতা পৃথিবীর খুব কম দেশেই সরকারপ্রধানদের রয়েছে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল এবং সরকারের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এর ফলে এখানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই বাংলাদেশের মতো দেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অধীনে নির্বাচন হলে অনেক সময়ই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হতে পারে আগামী দুই নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা বহাল করা। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছেন। তবে স্বীকার করেছেন যে বাংলাদেশের বিশেষ প্রয়োজনে আগামী দুই নির্বাচনের জন্য জাতীয় সংসদ ইচ্ছে করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা প্রচলন করতে পারে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিস্তারিত রায়ে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাতে এই ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা অত্যন্ত শক্ত হবে। উপরন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই ব্যবস্থা

চালু করতে হলে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক সমাধান খুঁজতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কাজ করা সম্ভব বলে মনে হয় না।

তৃতীয় সমাধান হতে পারে সংবিধান সংশোধন করে সংসদ কর্তৃক তিন মাসের জন্য নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ফর্মুলা দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই ব্যবস্থার সুবিধা হলো, এই সংশোধনী নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলো এই সমাধানে রাজি হবে কি না, তাতে সন্দেহ রয়েছে।

চতুর্থ ব্যবস্থা হতে পারে নির্বাচনের সময় সর্বদলীয় সরকার গঠন করা। এ জন্য সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক দলগুলো রাজি হলেই সর্বদলীয় সরকার গঠন করা সম্ভব। তবে সর্বদলীয় সরকার গঠিত হলেও বর্তমান বিধি অনুসারে এই সরকার হবে মূলত প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার। এর ফলে এ ধরনের সরকার অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কতটুকু সফল হবে, সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। তবে সংবিধান সংশোধন না করেও এই ব্যবস্থায় দুটি পরিবর্তন আনা যেতে পাবে। প্রথমত, বর্তমান কার্যবিধিমালায় সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর অসীম ক্ষমতা রয়েছে। কার্যবিধিমালা সংশোধন করার জন্য সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রধানমন্ত্রী সুপারিশ করলে এবং রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করলে কার্যবিধিমালা সংশোধন করা সম্ভব। সর্বদলীয় সরকার নির্বাচনকালীন সে সরকারকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কার্যবিধিমালায় শুধু নির্বাচনকালীন সরকারের ক্ষেত্রে তিনটি পরিবর্তন আনা যেতে পারে। ১. মন্ত্রিসভার সব সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হতে হবে। যদি একজন সদস্যও কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন, তাহলে নির্বাচনকালীন সরকারের পক্ষে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এর ফলে নির্বাচনকালীন সরকারে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর সমান অধিকার নিশ্চিত হবে। দ্বিতীয়ত, কার্যবিধিমালায় সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিধান করা যেতে পারে যে নির্বাচনকালীন সরকারে সব নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন লাগবে। তৃতীয়ত, বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকেরা মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। একই ব্যক্তির পক্ষে দল পরিচালনা করা এবং সরকার পরিচালনা করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না; এসব ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। যদি রাজনৈতিক দলগুলো

একমত হয়, তাহলে নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় সরকারে রাজনৈতিক দলগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকেরা থাকতে পারবেন না, এ ধরনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী সরকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে সমঝোতা হলে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন শেষে আবার সংঘাতের রাজনীতিতে ফিরে যায়। যারা নির্বাচনে হারে, তারা নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলতে থাকে। কিন্তু কোনো সরকারই সংস্কারের পথে পা বাড়ায় না। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য অবশ্যই নির্বাচনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানই রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের বড় কোনো রাজনৈতিক দলই বড় ধরনের রাজনৈতিক সংস্কারে বিশ্বাস করে না। তাদের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে ওপরে উল্লেখিত রাজনৈতিক সংস্কারসমূহের কোনো উল্লেখ নেই।

সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়াও বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য দুটি উপাদান প্রয়োজন। প্রথমত, সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। বাংলাদেশে অনেক রাজনৈতিক কর্মী রয়েছে। এদের বেশির ভাগই স্বার্থ হাসিল করার জন্য রাজনীতিতে অংশ নেয়। আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মীর সংখ্যা সীমিত। আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মীরা বেশির ভাগই গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করে না, যারা বিশ্বাস করে তাদের অনেকেই চরমপন্থী। বাংলাদেশে অর্থবহ রাজনৈতিক সংস্কার করতে হলে তাই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী বাড়াতে হবে। অতীতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ওপর বারবার হামলা এসেছে, কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ এসব হামলা প্রতিহত করেছে। যদি গণতন্ত্রের সুফলসমূহ জনগণের কাছে তুলে ধরা যায়, তাহলে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী অবশ্যই বাড়ানো সম্ভব।

গণতন্ত্রের সুফল জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য দরকার হলো সংস্কার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের মধ্য দিয়েই জনগণের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে উঠবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস বুকানন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, গণতন্ত্র হচ্ছে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে পরিচালিত সরকার (Government by discussion)। এ ধরনের আলাপ-আলোচনার জন্য প্রয়োজন গণ তর্ক-বিতর্ক। গণ তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়েই সংস্কারের পক্ষে সমর্থন সৃষ্টি সম্ভব। গণ তর্ক-বিতর্ক সম্পর্কে অমর্ত্য সেন লিখেছেন :

> Public reasoning includes the opportunitiny for citizens to participate in political discussion and to influence public choice. Balloting can be

seen as only one of the ways— albeit a very important way— to make public discussion effective, when the opportunitiny to vote is combined with the opportunitiny to speak and reject without fear. The reach—and effectivemess—of voting depend critically on the opportunity for open public discussion.

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংস্কারের পক্ষে গণসমর্থন সৃষ্টির উপায় হলো উন্মুক্ত আলোচনা। এই উন্মুক্ত আলোচনা পরিচালিত হবে গণ তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে। সৌভাগ্যবশত দক্ষিণ এশিয়ায় গণ তর্ক-বিতর্কের ধারা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। এখানে ধর্ম থেকে শুরু করে নারীদের ভূমিকা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সমাধান তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে খোঁজা হয়েছে। গণতন্ত্রও এখানে পশ্চিমের জগৎ থেকে আসেনি। অষ্টম শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালকে জনগণ নির্বাচন করে। গণ তর্ক-বিতর্কের এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপস্থিতি বাংলাদেশের জন্য আশার কারণ। অবশ্যই বাংলাদেশের মানুষ তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে।

বাংলাদেশের নষ্ট রাজনীতির দুষ্টচক্রের সবচেয়ে জীবন্ত বর্ণনা করেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ, তিনি লিখেছেন :

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা,
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

এই অদ্ভুত আঁধার থেকে মুক্তি না পেয়ে অনেকে ভাবছেন, রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কোনো সমাধান নেই। আসলে রাজনৈতিক ব্যর্থতার ওষুধ বিরাজনীতিকীকরণ নয়। এর প্রকৃত ওষুধ হলো জনগণকে আরও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করতে হবে।

তবে শুধু সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী দিয়েও হবে না, বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই শাসনতন্ত্রের সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। ঘুণে ধরা আইনকানুন পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ও আইনের সংশোধনই যথেষ্ট নয়। এসব পরিবর্তন কার্যকর করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যথার্থই বলেছেন :

The constitution only gives the people the right to pursue happiness. You have to catch it yourself.

## পাদটীকা

১. Mancur Olson. 1982. *The Rise and Decline of Nations*. New Haven and London. Yale University Press.

২. Anna Margarida Fernandez and Aart C. Kraay. 2007. 'Property Right Instititutions Contracting Instititutions and Group in South Asia in Macro and Micro Evidence.' *In South Asia Growth and Right Regional Integration*. Sadeq Ahmed and Ejaz Ghani (eds.) Delhi. Macmillan India.

৩. Santa Devarajan. 2008. 'Two Components, Governance Indicators: Where are we when should we be going?' *World Bank Research Observer*. 23(1), 31-34.

৪. World Bank. 2007. *Bangladesh Strategy for Sustainable Growth*. Dhaka.

৫. Merilee S. Grindle. 2004. 'Good Enough Governance, Poverty Reduction and Reform in Developing Countries'. *Governance: An International Journal of Policy Administration and Institutions*. 17(4). 524-540.

৬. Lant Pritchett, Michael Woolcolk and Matt Andrews. 2012. *Looking like a State: Techniques of Persistent Failure in State Capabilities for Implementation*. Helsinki. UNU-WIDER.

৭. Ha Joon Chang. 2002. *Kicking Away the Ladder*. London. Academic Press.

৮. Daron Acemoglu and James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail*. New York. Crown Business.

৯. Amartya Sen. 2005. *The Argumentative Indian*. New York. Farrar, Straus and Giroux.

১০. Jeffrey Sachs. 1994. *Understanding Shock Therapy*. Occasional Paper. London: Social Market Foundation.

১১. Portes, Richard. 1991. 'The Path of Reform in Central and Eastern Europe: An Introdution'. *European Economy*. Vol. 100(2), 3-151.

১২. Joseph E. Stiglitz. 2002. *Globalization and Development*. New York and London W.W. Norton and Company.

# নির্ঘণ্ট

## ফ



## ব

ম



*অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি* গ্রন্থে আকবর আলি খান এ-দেশের রাজনীতির বাঁকে বাঁকে যে বৈপরীত্য ও আপাতবিরোধী সত্য লুকিয়ে রয়েছে, তা উন্মোচন করেছেন; সন্ধান করেছেন বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ। তাঁর মতে, এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় বিতর্ক। এ বইয়ে লেখক সহজ ভাষায় এবং অনেকটা রম্যরচনার ভঙ্গিতে বিতর্কের মূল বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন। বইটি পাঠককে ভাবাবে, আলোড়িত করবে, সেই সঙ্গে আলোরও সন্ধান দেবে।



Prothoma



201702000042

TK. 700.00